Approved and Authorized by the Govt. of Bengal
(vide Calcutta Gazette. 13th November 1924).

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকা ।

(গদ্য ও পদ্য)

শ্রীরামদয়াল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
কুমুদ লাইব্রেরী
৪৯নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩১ সাল।

মূল্য ১৷৵০ মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

অল্পকালের মধ্যে বাঙ্গালাভাষার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা সাহিত্যসেবিমাত্রেরই আনন্দের বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন মনস্বী ব্যক্তির চিন্তাপ্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে অগ্রসর হইয়া, এই ভাষাকে এখন মহতী সমৃদ্ধিতে সুসজ্জিত করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের সাহিত্যসংসারে সুচিন্তা-প্রসূত বহুবিধ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকলের আলোচনায় বালকগণের মনোবৃত্তি মার্জিত ও উৎকৃষ্ট পথে পরিচালিত হইবে, আশা করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, লিখনভঙ্গী ও ভাব-সৌন্দর্য্য বিভিন্ন প্রকার। এখন আমাদের সাহিত্যসংসারে যে সকল মনোহর সৌধ রচিত হইয়াছে, শিক্ষার্থিগণ অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সকলের সম্যক্ আলোচনা করিতে পারে না। এই নিমিত্ত এই পুস্তকে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাদি হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করা হইল। আশা করি, ইহা দ্বারা বালকগণের সাহিত্যশিক্ষার সুবিধা হইবে। সুবুদ্ধি শিক্ষার্থিগণ অবসরমতে ঐ সকল গ্রন্থ সমগ্র পাঠ করিলে, অধিকতর উপকৃত হইতে পারিবে। এই ভারতভূমি বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানগৌরবে তাদৃশ উন্নত না হইলেও এখানে অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা বিদ্যার সৃষ্টি ও উৎকর্ষ হইয়াছে। ঐরূপ বিষয়ের আলোচনা এদেশের শিক্ষার্থিগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা ভিন্ন ভাষা শিক্ষার সহিত সমাজ, নীতি ও আত্মমর্য্যাদার বিকাশ হওয়াও আবশ্যক। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, ঐ প্রকারের কয়েকটি পাঠও সঙ্কলিত হইয়াছে। ফলতঃ দীর্ঘকাল শিক্ষাবিভাগের সংস্রবে থাকিয়া সাহিত্যশিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে

সামান্য প্রতীতি হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, এই পুস্তকে গদ্য ও পদ্য-বিষয়ক বহুবিধ পাঠ সন্নিবেশিত হইল। সেপক্ষে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি; বলিতে পারি না।

যে সকল মহাত্মাদিগের পুস্তকাদি হইতে এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। জীবিত গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ প্রবন্ধ গ্রহণের অনুমতি দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। সময়ের অল্পতা ও অন্যান্য কারণে যাহাদের অনুমতি গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাঁহাদের নিকট সবিনয়ে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীরামদয়াল শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

গদ্যাংশ।

পদ্যাংশ।

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকা।

কুশ ও লবের পরিচয়।

'মহর্ষি বাল্মীকি রাম-চরিত অবলম্বন করিয়া অতি অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার দুই কোকিল-কণ্ঠ তরুণ-বয়স্ক শিষ্য অতি মধুর-স্বরে সেই কাব্য গান করে। আগামী দিবস প্রভাতে তাহারা রাজ-সভায় সঙ্গীত করিবে'—এই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত হইয়াছিল। রজনী অবসন্না হইবামাত্র কি ঋষিগণ, কি নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, সকলেই সাতিশয় ব্যগ্র-চিত্তে সঙ্গীত-শ্রবণ-লালসায় রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সে দিবসের সভায় সমারোহের সীমা ছিল না। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও লঙ্কা-সমর-সহায় সুগ্রীব-বিভীষণাদি সুহৃদ্বর্গ তাঁহার বামে ও দক্ষিণে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি রাজপরিবার অরুন্ধতী-প্রভৃতি ঋষি-পত্নীগণ সমভিব্যাহারে পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইলেন।

এইরূপে রাজসভায় সমবেত হইয়া সমস্ত লোক সুকুমার গায়ক-যুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও কথোপকথন এবং নিতান্ত উৎসুক-চিত্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি কুশ ও লব সমভিব্যাহারে সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে

সভা-মণ্ডপে সহসা মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল। যাহারা পূর্ব্বদিন কুশ ও লবকে অবলোকন করিয়াছিল, তাহারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সমীপস্থ ব্যক্তিদিগকে সেই দুই সহোদরকে দেখাইতে লাগিল। বাল্মীকি সভা-প্রবেশ করিবামাত্র সভাস্থ সমস্ত লোক এককালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহর্ষি ও তাঁহার দুই শিষ্যের নিমিত্ত পৃথক্ স্থান নির্ণীত ছিল; এই হেতু তাঁহারা সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। সকলেই সঙ্গীত-শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়া, উৎসুক-চিত্তে কখন্ সঙ্গীতারম্ভ হয়, ইহাই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, বাল্মীকি সভার সর্ব্বাংশে নয়ন সঞ্চারণ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, 'মহারাজ! সকলেই শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন! অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীতের আরম্ভ হউক।' অনন্তর তদীয় নিদেশ-ক্রমে কুশ ও লব বীণা-যন্ত্র-সহযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। বাল্মীকি পূর্ব্বেই কুশ ও লবকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, রামায়ণের যে সকল অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগের বিষয় বর্ণিত আছে, তোমরা অদ্য সেই সকল অংশই যত্নপূর্ব্বক গান করিবে। তদনুসারে তাহারা কিয়ৎক্ষণ গান করিবামাত্র রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে প্রবল-বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাম সেই দুই সহোদরকে যতই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাহারা সীতার তনয় বলিয়া তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ইঁহারাও তাহাদের কলেবরে রামের ও সীতার অবয়ব-সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া, মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত সভাস্থ সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! এই দুই ঋষি-কুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতি-স্বরূপ; যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য না থাকিত,

তাহা হইলে, রামে ও এই দুই ঋষিকুমারে কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয়, যেন রাম দুইটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, কুমার-বয়সে ঋষি-কুমার-বেশ অবলম্বন করিয়াছেন! এই বয়সে রামের যেরূপ আকৃতি ও রূপলাবণ্যের মাধুরী ছিল, ইহাদিগেরও অবিকল সেইরূপ দেখিতেছি।' যাহা হউক, সভায় সমস্ত লোক মোহিত ও নিস্পন্দ-ভাবে অবস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ ও অনিমেষ নয়নে তাহাদের রূপ-নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, 'বৎস! ইহাদিগকে অবিলম্বে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার দাও।' তাহারা শ্রবণমাত্র বিনয়-পূর্ণ-বচনে কহিল, 'মহারাজ! আমরা বনবাসী ;—বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি ; যদৃচ্ছালব্ধ ফল-মূল-মাত্র আহার ও বল্কল-মাত্র পরিধান করি। আমাদের স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন নাই। আমরা বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে আপনার চরিত অভ্যাস করিয়াছিলাম। অদ্য আপনার সমক্ষে তাহা কীর্ত্তন করায় আমাদের সেই যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইল। আপনি শ্রবণ করিয়া যে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।' ঐ বালকদ্বয়ের এইরূপ নিস্পৃহতা দেখিয়া সকলেই এক-কালে চমৎকৃত হইলেন।

কুশ ও লবকে কিয়ৎক্ষণ অবিচলিত-নয়নে নিরীক্ষণ করায় কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, ইহারা সীতারই তনয়। তখন তিনি একান্ত অস্থিরচিত্তা হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে 'হা বৎসে জানকি!' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। তদ্দর্শনে সকলে বিকলান্তঃকরণ হইয়া অশেষ-যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীত-শ্রবণে সকলেরই হৃদয়ে সীতা-শোক এত প্রবল-ভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহারা অত্যন্ত

অস্থির হইয়া অবিরল-ধারে বাষ্প-বারি-বিমোচন ও মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা একান্ত অধীরা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় কহিতে লাগিলেন, 'ঐ দুই কুমারকে তোমরা কেহ আমার নিকটে আনিয়া দাও; উহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া একবার মুখচুম্বন করিব। উহারা জানকীর পুত্র, উহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; হয় তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি উহাদের নিকটে যাই। একবার উহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলে, আমার জানকী-শোক অনেকাংশে নিবারিত হয়। ঐ দেখ, উহাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। উহারা সভা-প্রবেশ করিবামাত্র যেন কেহ আমার কাণে কাণে কহিয়া দিল, ঐ তোমার রামের দুই বংশধর আসিতেছে; সেই অবধি উহাদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমি বার বৎসরে সীতাকে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু উহাদিগকে দেখিবামাত্র আমার সীতা-শোক নূতন হইয়া উঠিয়াছে। হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তুমি অদ্যাপি জীবিতা আছ? কি, এই পাপিষ্ঠ নরলোক পরিত্যাগ করিয়াছ, কিছুই জানি না।' ইহা বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিত্যাগ করিয়া কৌশল্যা পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন। সকলে সযত্ন হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন তিনি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'এখনও তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দিলে না;—কেহ একবার লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া আমার নাম করিয়া বলুক, তাহা হইলে, এখনই লক্ষ্মণ উহাদিগকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দিবে।'

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া, অরুন্ধতীর

আদেশানুসারে সমীপবর্ত্তিনী প্রতিহারী লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া কৌশল্যার অভিপ্রায় সবিশেষ নিবেদন করিল। লক্ষ্মণ কৌশল-ক্রমে সে দিবস সেই পর্য্যন্ত সঙ্গীত-ক্রিয়া রহিত করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন এবং কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা সেই দুই সহোদরকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে বারংবার তাহাদের মুখচুম্বন করিলেন এবং 'হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিলে,'—ইহা বলিয়া নিতান্ত কাতর-ভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সুমিত্রা, ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি সকলেই অশ্রুপাত, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুশ ও লব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, কৌশল্যা কিঞ্চিৎ শোক-সংবরণ করিয়া, সন্দেহ-ভঞ্জন-মানসে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের ও তোমাদের জনক-জননীর নাম কি?' তাহারা অতি বিনীত-ভাবে স্ব স্ব নাম উল্লেখ করিয়া কহিল, 'আমাদের পিতা কে তাহা আমরা জানি না; এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে কখনই দেখি নাই; আমাদের জননী আছেন, তিনি তপস্বিনী; কিন্তু এক দিনও আমরা তাঁহার নাম শুনি নাই; কেহই আমাদিগকে ইহা বলিয়া দেয় নাই, আমরাও তাঁহাকে বা অন্য কাহাকেও কখনই জিজ্ঞাসা করি নাই। আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য,—তাঁহারই তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি এবং তাঁহারই নিকটে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি।' আকুল-চিত্তে এই সকল কথা শ্রবণ করায় অনেকাংশে কৌশল্যার সংশয়াপনোদন হইল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের জননীর আকৃতি কেমন?' কুশ ও লব তদীয় আকৃতির যথাযথ বর্ণন করিল। তাহারা যে সীতার তনয়, তদ্বিষয়ে তৎকালে সকলেই দৃঢ়-নিশ্চয় হইল

এবং কৌশল্যা প্রভৃতি যাবতীয় রাজ-পরিবারের শোক-সিন্ধু অনিবার্য্য-বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎকাল পরে কৌশল্যা কুশ ও লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের জননী কেমন আছেন?' তাহারা কহিল, 'তাঁহাকে সর্ব্বদাই জীবন্মৃত-প্রায় দেখিতে পাই; বিশেষতঃ তিনি দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না।'

কুশ ও লবের এই সকল কথা শুনিয়া, সকলেই যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ-রূপে সন্দেহ-ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি একবার মহর্ষি বাল্মীকিকে এইস্থানে আনয়ন কর।' কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি বাল্মীকি লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, সকলেই সমুচিত-ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া পরম-সমাদরে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর কৌশল্যা কৃতাঞ্জলি-পুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! আপনার এই দুইটী শিষ্য কে, কৃপা করিয়া সবিশেষ বলুন।' যে দিবস লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসেন, সেই দিবস অবধি বাল্মীকি সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যন্ত কীর্ত্তন করিলেন এবং রাম বিরহে সীতার কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহারও যথাযথ বর্ণন করিলেন। এই সমস্ত কথা শ্রবণ করাতে সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইতে লাগিল। কৌশল্যা শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, 'হা বৎসে জানকি! বিধাতা তোমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন?' ইহা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সীতা অদ্যাপি জীবিত আছেন, এবং কুশ ও লব তাঁহারই তনয়, তদ্বিষয়ে আর তাঁহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এত দিন পরে আত্ম-পরিচয় লাভ করাতে কুশ ও লবের অন্তঃকরণে

নানা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে কহিলেন, 'বৎস কুশ! বৎস লব! পিতামহী ও পিতৃব্য-পত্নী-গণের চরণ-বন্দনা কর।' তাহারা তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার এবং ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। অনন্তর মহর্ষি কহিলেন, 'তোমরা রামায়ণে লক্ষ্মণ-নামক যে মহাপুরুষের গুণ-কীর্ত্তন পাঠ করিয়াছ, তিনি এই,—ইনি তোমাদের তৃতীয় পিতৃব্য।' ইহা বলিয়া বাল্মীকি লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। 'লক্ষ্মণ'-নাম-শ্রবণ-মাত্র তাহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে পদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া, দৃঢ়তর-ভক্তি-সহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিল।

(৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

কশ্যপের আশ্রমে।

রাজা দুষ্মন্ত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবরাজ-সারথে! এই পর্ব্বতের কোন্ অংশে ভগবান্ কশ্যপের আশ্রম?' মাতলি কহিলেন, 'মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অনতিদূরবর্ত্তী নহে; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি।' কিয়ৎ দূর গমন করিয়া, এক ঋষি-কুমারকে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন?' ঋষিকুমার কহিলেন, 'তিনি এক্ষণে নিজপত্নী অদিতিকে ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পতিব্রতাধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন।' তখন রাজা কহিলেন, 'তবে আমি এখন তাঁহার নিকটে যাইব না।' মাতলি কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি এই অশোক বৃক্ষমূলে অবস্থিত

হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন ; আমি মহর্ষির নিকট আপনকার আগমন সংবাদ নিবেদন করি।' এই বলিয়া মাতলি প্রস্থান করিলেন।

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন নিজ হস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে হস্ত! আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছ?' মনে মনে এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, "বৎস! এত দুর্ব্বৃত্ত হও কেন?"—এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এ অবিনয়ের স্থান নহে। এই অরণ্যে যাবতীয় জীবজন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর সৌহৃদ্যে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না। এমন স্থানে কে দুর্ব্বৃত্ততা করিতেছে? যাহা হউক, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইল।

রাজা এইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে এবং দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মানা আছেন—দেখিয়া, চমৎকৃত হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মানব-শিশু সিংহ-শিশুর উপর বল প্রকাশ করিতেছে, সিংহ-শিশু অবিকৃত-চিত্তে সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে! অনন্তর কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া, সেই শিশুকে অবলোকন করিয়া, স্নেহরস-পরিপূর্ণ-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আপন পুত্রকে দেখিলে মন যেমন স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা আমি পুত্রহীন; এজন্য এই

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া, আমার মনে এরূপ প্রগাঢ় স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।

এদিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন, 'বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি; তুমি কেন অকারণে উহাকে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও; ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমাকে জব্দ করিবেক।' বালক শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া সিংহ-শাবকের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয়-প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া, প্রলোভনার্থে কহিলেন, 'বৎস! তুমি সিংহ-শিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটি ভাল খেলানা দিব।'

রাজা এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সহসা তাঁহাদের সম্মুখে না আসিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সস্নেহনয়নে সেই শিশুকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, 'কি খেলানা দিবে—দাও,'—বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল। রাজা বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমৎকৃত হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তি-লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদিগের সঙ্গে কোন খেলানা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক রুষ্ট হইয়া কহিল, 'তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উহাকে ছাড়িব না।' তখন এক তাপসী অপরা তাপসীকে কহিলেন, 'সখি! ও কথায় ভুলিবার ছেলে নয়। কুটীরে মাটীর ময়ূর আছে, শীঘ্র লইয়া আইস।' তাপসী মৃন্ময়ময়ূর আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

ময়ূর আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়া বালক কহিল, 'এখনও ময়ূর দিলে না; তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না'—এই বলিয়া সিংহ-শিশুকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহার হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'এমন সময়ে এখানে কোন ঋষি-কুমার নাই, যে ছাড়াইয়া দেয়।' এই বলিয়া, পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র, রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,'মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সিংহ-শিশুকে এই বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন।' রাজা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া, সেই বালককে ঋষি-পুত্র-বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ওহে ঋষি-কুমার! তুমি কেন তপোবন-বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ?" তখন তাপসী কহিলেন, 'মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষি-কুমার নহে।' রাজা কহিলেন, 'বালকের আকার প্রকার দেখিয়াই বোধ হইতেছে,—ঋষি-কুমার নয়, কিন্তু এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগম-সম্ভাবনা নাই, এই জন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।'

এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "পরের পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে; যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখ অনুভব করে, তাহা বলা যায় না।"

বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অতিশয় শান্তস্বভাব হইল, ইহা দেখিয়া এবং উভয়ের আকার-গত সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা সেই বালককে ক্ষত্রিয়-

সন্তান নিশ্চয় করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বালক যদি ঋষি-কুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।' তাপসী কহিলেন, 'মহাশয়! এ পুরুবংশীয়।' রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে, তাঁহারা প্রথমতঃ অশেষ সাংসারিক সুখভোগে কালযাপন করিয়া পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্য বাস আশ্রয় করেন।'

অনন্তর তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, 'এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে। অতএব এই বালক কি সংযোগে এখানে আসিল?' তাপসী কহিলেন, 'ইহার জননী অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছে।' রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশীয় ও অপ্সরা-সম্বন্ধ এই দুই কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে, সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া তাপসীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনি জানেন, এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ রাজার পুত্র?' তখন তাপসী কহিলেন, 'মহাশয়, কে সেই ধর্ম্ম-পত্নী-পরিত্যাগী পাপাত্মার নাম-কীর্ত্তন করিবেক?' রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'একথা আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই এককালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক। অথবা পরস্ত্রী-সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অবিধেয়। আর, আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশা-লতার মূলচ্ছেদন করিয়াছি, তখন সে আশা-লতাকে বৃথা পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়া, অবশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।'

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে অপরা তাপসী কুটীর হইতে মৃন্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন এবং কহিলেন, 'বৎস! কেমন শকুন্ত-লাবণ্য দেখ।' এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করিয়া, বালক কহিল, 'কৈ, আমার মা—কোথায়?' তখন তাপসী কহিলেন, 'বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমাকে পক্ষীর লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি।' এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন, 'মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনায় আর কাহাকেও দেখে নাই, নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত অত্যন্ত মাতৃ-বৎসল। শকুন্ত-লাবণ্য শব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া, উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার মাতার নাম শকুন্তলা।'

সমুদয় শ্রবণ করিয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীর নাম শকুন্তলা। কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে! এই সকল কথা শুনিয়া, আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন? অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া নাম-সাদৃশ্য শ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আলোচনা করিতেছি। এরূপ নাম-সাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেকক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এই নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা বিরহ-কৃশা মলিন-বেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে জলধারা বহিতে লাগিল, বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া স্বপ্ন-দর্শনবৎ বোধ করিয়া স্থির-

নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; লোচন-যুগল বাষ্প-বারিতে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র মা মা করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'মা! ও কে? ওকে দেখিয়া তুই কাঁদিস্ কেন?' তখন শকুন্তলা গদ্গদ-বচনে কহিলেন, 'বাছা! ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।'

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা মনের আবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা করিয়া বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই আমার সকল ঘটনা স্মরণ হইয়াছিল। তদবধি আমি কি অসুখে কালযাপন করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইব, আমার সে আশা ছিল না। আজি আমার কি সৌভাগ্যের দিন—বলিতে পারি না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যান-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।'

এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা আস্তেব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র! উঠ, উঠ। তোমার দোষ কি? আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে।' এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্প-পূর্ণ-নয়নে কহিতে লাগিলেন, 'প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যান-কালে তোমার লোচনদ্বয় হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম; পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা

মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি'; এই বলিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার অশ্রু-মোচন করিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোক-সাগর আরও উথলিয়া উঠিল; দ্বিগুণ প্রবাহে নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল।

অনন্তর দুঃখাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনর্ব্বার স্মরণ করিবে, সে আশা ছিল না। অতএব কিরূপে আমি পুনরায় তোমার স্মৃতিপথে পতিত হইলাম, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।' তখন রাজা কহিলেন, 'প্রিয়ে! তৎকালে তুমি আমাকে যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে পড়িলে, আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে উদয় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়, এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলিস্থিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, পুনর্ব্বার শকুন্তলার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন, 'আর্য্য-পুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই। ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। ও তোমার অঙ্গুলিতেই থাকুক, আর আমার উহা ধারণ করিতে সাহস হয় না।'

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মাতলি আসিয়া প্রফুল্ল-বদনে কহিলেন, 'মহারাজ! এত দিনের পর আপনি যে ধর্ম্মপত্নীর সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। ভগবান্ কশ্যপও শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন।' তখন রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! চল, আজি উভয়ে এক সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণ-দর্শন করিব।' শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরুজনের নিকটে যাইতে পারিব না।' তখন রাজা কহিলেন, 'প্রিয়ে! শুভসময়ে এক

সমভিব্যাহারে গুরুজনের নিকটে যাওয়া দূষ্য নহে। চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।'

এই বলিয়া, রাজা শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভিব্যাহারে কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ভগবান্ কশ্যপ অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন। তখন সস্ত্রীক সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ "বৎস! চিরজীবী হইয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর শকুন্তলাকে কহিলেন, 'বৎসে! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ! তোমাকে অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করিব? তুমি শচীসদৃশী হও।' উভয়কে এই আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে কহিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়-বচনে নিবেদন করিলেন, 'ভগবন্! শকুন্তলা আপনার সগোত্র মহর্ষি কণ্বের পালিত-তনয়া। আমি মহর্ষির তপোবনে মৃগয়া-প্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়া, গান্ধর্ব্ব-বিধানে ইহার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে ইনি যৎকালে রাজধানীতে উপস্থিত হন, তখন আমার এরূপ স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল যে, ইহাকে চিনিতে পারি নাই। চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহর্ষি কণ্বের নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবেক এবং যাহাতে মহর্ষি কণ্ব আমার উপর ক্রোধ না করেন, তাহারও উপায় করিতে হইবেক।'

কশ্যপ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বৎস! সে জন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা উভয়েই অবগত

নহে। এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে সেই স্মৃতি-ভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি। শুনিলে, শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যান-নিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।' এই বলিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, 'বৎসে! রাজা তপোবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতি-চিন্তায় মগ্না হইয়া কুটীরে উপবিষ্টা ছিলে। সেই সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি এককালে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইযাছিলে; সুতরাং তাঁহার সংকার বা সংবর্দ্ধনা করা হয় নাই। তিনি তাহাতে কুপিত হইয়া তোমাকে এই শাপ দিয়া চলিয়া যান যে—'তুমি যাহার চিন্তায় মগ্না হইয়া অতিথির অবমাননা করিলে, সে তোমাকে স্মরণ করিবে না।'

"তুমি এই অভিশাপ শুনিতে পাও নাই। তোমার সখীরা শুনিতে পাইয়া, তাঁহার চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। তখন তিনি কহিলেন, 'এ অভিশাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে যদি কোন অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহা হইলে, স্মরণ করিবেক।" অনন্তর রাজাকে কহিলেন, 'বৎস! দুর্ব্বাসার শাপ-প্রভাবেই তোমার স্মৃতি-ভ্রংশ হইয়াছিল, তাহাতেই তুমি উঁহাকে চিনিতে পার নাই। শকুন্তলার সখীর অনুনয়-বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, দুর্ব্বাসা অভিজ্ঞান-দর্শনকে শাপ-বিমোচনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেই নিমিত্ত অঙ্গুরীয়-দর্শন-মাত্র শকুন্তলার বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।'

দুর্ব্বাসার শাপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া, রাজা কহিলেন, 'ভগবন্! এক্ষণে আমি সবলের নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম।' শকুন্তলাও শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই নিমিত্তই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। নতুবা, আর্য্যপুত্র এমন সরল-হৃদয় হইয়া, কেন আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিবেন?

দুর্ব্বাসার শাপই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এই নিমিত্ত তপোবন হইতে প্রস্থানকালে, সখীরাও যত্ন-পূর্ব্বক আর্য্য-পুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আজি ভাগ্যে এই কথা শুনিলাম; নতুবা যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে, আর্য্য-পুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন— বলিয়া ক্ষোভ থাকিত।'

পরে কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেন এবং ভুবনের কর্ত্তা হইয়া উত্তরকালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।' তখন রাজা কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি না সম্ভব হইতে পারে?' অদিতি কহিলেন, 'অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক।' তদনুসারে কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ-দানার্থে প্রেরণ করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন, 'বৎস! বহু দিবস হইল, রাজধানী হইতে আসিয়াছ, অতএব কালবিলম্ব না করিয়া দেবরথে আরোহণ-পূর্ব্বক পত্নী-পুত্র-সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর।' তখন রাজা, 'মহাশয়ের যে আজ্ঞা' এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন এবং নিজ রাজধানী-প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পরমসুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

(৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

বিহঙ্গম-দেহ।

জগদীশ্বর পক্ষিগণের শরীর-নির্ম্মাণ-বিষয়ে যেরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। তাহাদের যে অঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই তাঁহার নিরুপম নৈপুণ্য প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে সতত বায়ু-সাগরে সন্তরণ করিতে হয়, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাদিগের শরীর একখানি উৎকৃষ্ট তরণি-স্বরূপ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষ দণ্ড-স্বরূপ, পুচ্ছ কর্ণ-স্বরূপ এবং বক্ষঃস্থল নৌকার পুরোভাগ-রূপ। শরীর ভারি হইলে, তাহারা আকাশপথে উড্ডীয়মান হইতে অসমর্থ হইবে, এই বিবেচনায়, তিনি তাহাদেব অঙ্গ-সমুদায় অত্যন্ত লঘু পদার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অক্লেশে বায়ু ভেদ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগ অস্থূল ও চঞ্চুপুট সুতীক্ষ্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পক্ষিগণের চঞ্চু অতি আশ্চর্য্য বস্তু। যে পক্ষী যেরূপ দ্রব্য আহার করে, জগদীশ্বর তাহার চঞ্চু তদুপযোগী করিয়া দিয়াছেন। শ্যেন, শকুনি প্রভৃতি যে সকল পক্ষী অন্য প্রাণীর শরীর বিদীর্ণ করিয়া আহার করে, ও শুক-শারিকাদি যে সমস্ত পক্ষী শস্য ভঞ্জন ও ফলাদি খণ্ডন করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদের চঞ্চু অত্যন্ত কঠিন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হংস-রাজহংসাদি যে সমস্ত পক্ষী পঙ্কের মধ্যে আহার অন্বেষণ করে, তাহাদের চঞ্চু কোমল ও চেপ্টা এবং এ প্রকার কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত যে, তাহার মধ্য দিয়া জল নির্গত হয়, কিন্তু সার বস্তু পতিত হয় না। মাংসাশী পক্ষীদিগের চঞ্চুর পার্শ্ব-দেশ তীক্ষ্ণ এবং অগ্রভাগ বড়িশবৎ বক্রাকার। তাহারা তদ্দ্বারা নিহত পশুপক্ষ্যাদির শরীর

বিদারণ ও মাংসাদি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করে। আবার বক প্রভৃতি যে সমস্ত পক্ষী জলজন্তু ধরিয়া আহার করে, তাহাদের চঞ্চু কঠিন, তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘাকার। কিন্তু তাহাদিগকে যেমন নিহত জীবের শরীর হইতে মাংস উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে হয় না, তেমন তাহাদের চঞ্চুও উল্লিখিত মাংস-ভোজী বিহঙ্গমদিগের চঞ্চুর ন্যায় বক্রাকার নহে। কপোত চটকাদি গ্রাম্য পক্ষীদিগের চঞ্চু ছোট, সুচল ও ঈষদ্বক্র; তদ্দ্বারা তাহারা শস্যাদি ভোজ্য বস্তু অক্লেশে তুলিয়া লইতে পারে। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিশ্চয় হয়, পক্ষীদিগের মধ্যে যে জাতি যেরূপ সামগ্রী ভক্ষণ করে, পরমেশ্বর তাহার তদুপযোগী চঞ্চু নির্ম্মাণ করিয়া, নিরুপম নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন স্থলে এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা দেখা যায় না; যে স্থলে যেমন আবশ্যক, জগদীশ্বর সেই স্থানে সেইরূপ করিয়াছেন।

তিনি যাবতীয় প্রাণীরই গ্রাসাচ্ছাদন নির্ম্মাণ-বিষয়ে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু পক্ষীদিগের শরীরের আচ্ছাদন যেমন পরিপাটী, এমন বুঝি, আর কোন জন্তুরই নয়। ইহা যেমন লঘু, তেমনি মসৃণ, আবার তদনুরূপ শীত-নিবারক ও উষ্ণতা-সাধক। উহার বর্ণ ও শোভাই বা কেমন! পর্য্যটকেরা অকস্মাৎ এক এক বন-বিহারী বিহঙ্গমের অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া, মোহিত হইয়া যান।

এক একটি পালক এক এক অত্যাশ্চর্য্য অসামান্য শিল্পকার্য্য। উহার পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ পুচ্ছদেশ যেরূপ লঘু, তদনুরূপ দৃঢ়। লঘুতা ও দৃঢ়তা এই উভয় গুণের এরূপ একত্র সমাবেশ আর কোন বস্তুতে দৃষ্ট হয় না। ঐ পূর্ব্বভাগের ন্যায় অপর ভাগও অতি আশ্চর্য্য। তাহা যে পদার্থে প্রস্তুত, ভূ-মণ্ডলের অন্য কোন প্রাণীতে ও কোন বস্তুতে তাহা বিদ্যমান

নাই। উহা লঘু, দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, কোমল ও নমনীয়; অতএব ইচ্ছানুসারে সকল দিকে নত ও চালিত করা যায়; এবং স্থিতি-স্থাপক, অর্থাৎ উহাকে কোন দিকে নত অথবা চালিত করিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে অবস্থিতি করে। পালকগুলি লঘু না হইলে, পক্ষিগণ উড়িতে সমর্থ হইবে না, এই বিবেচনায় পরমেশ্বর উহাদিগকে লঘু করিয়াছেন। উহারা দৃঢ় না হইলে, বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ভগ্ন হইয়া যাইবে, এই কারণে উহাদিগকে দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করিয়াছেন। উহাদিগকে পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত সকল দিকে চালনা করা আবশ্যক; এই বিবেচনায়, উহাদিগকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ও স্থিতি-স্থাপক করিয়াছেন। বিশ্বপতি বিহঙ্গমজাতির শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা একত্র সংসাধনার্থ কতই যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের যে বস্তুর বিষয় উক্তরূপ বিবেচনা করা যায়, তাহাতেই তাঁহার অদ্ভুত কৌশল ও প্রগাঢ় যত্নের লক্ষণ প্রতীয়মান হয়। অপরিচ্ছিন্ন অসীম বিশ্বের কণামাত্রও তাঁহার অযত্নের বিষয় নয়।

(৺অক্ষয় কুমার দত্ত)

স্বপ্ন-দর্শন—ন্যায়-বিষয়ক।

আমি বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় বহুতর স্থান পর্য্যটন করিয়া, শীত-ঋতুর উপক্রমেই বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এ প্রদেশে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিক্ মেঘাবৃতবৎ ঘনতর কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন থাকে; অতি শীতল পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইয়া, কলেবর কম্পমান করে ও

বৃক্ষপত্রের শিশির-বিন্দু-সমুদায় ঝর্ঝর শব্দে পতিত হইয়া, তলস্থ ভূমিকে অল্প অল্প আর্দ্র করিতে থাকে। সূর্য্য-বিম্ব সর্ব্বদাই ম্লানমূর্ত্তি; গগন-মণ্ডলে বহু দূর উত্থিত হইলেও নীহার-প্রভাবে চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় অতি মৃদুভাবে প্রকাশ পায় এবং মধ্যাহ্নকালেও তদীয় কিরণ-জাল পরম সুখ-সেব্য বলিয়া অনুভূত হয়। সায়ংকালে ও রজনীতে গৃহের বহির্ভূত হওয়া, অত্যন্ত দুষ্কর; তৎকালে দ্বাররোধ করিয়া অগ্নিসেবন করাই পরম প্রীতিকর বোধ হয়। গত দিবস যামিনী-যোগে যোগমায়ার মন্দিরের সমীপবর্ত্তী গৃহে কতকগুলি উদাসীনের সহিত একত্র উপবেশন-পূর্ব্বক অগ্নি সেবন ও পরস্পর কথোপকথনে মহাসুখে কালযাপন করিতেছিলাম। আমার বামপার্শ্বে এক বিমর্ষ-যুক্ত মৃদু-ভাষী তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন; কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া অবগত হইলাম, তিনি বাঙ্গালাদেশীয় এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতার পরলোক-যাত্রার পরে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রেরা প্রতারণা করিয়া, তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে। তিনি অতি নির্ব্বিরোধ মনুষ্য; বিবাদ-বিসংবাদে কোন ক্রমে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না; তথাপি আত্মীয় স্বজনের পরামর্শক্রমে রাজ-দ্বারেও ইহার প্রতীকার-চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিপক্ষের সহায়-সম্পত্তি-বল অধিক ছিল, একারণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে মনোদুঃখে সংসারে বিরক্ত হইয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই আমার সম্মুখবর্ত্তী আর এক সুশীল শান্ত-স্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ উদাসীন, "হা নারায়ণ!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভাই! তোমার দারুণ দুঃখের কথা শুনিয়া আমি মহা-খেদান্বিত হইলাম, এক্ষণে আমার দুর্দ্দশার বিষয় কিছু শ্রবণ কর। আমি কোন রাজ-সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলাম এবং নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, যশোভাজন হইয়াছিলাম; ইতিমধ্যে আমার উপরিতন

অধ্যক্ষের মৃত্যু ঘটনা হইলে, অন্য এক ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রথমাবধি তাঁহার আচরণ দেখিয়া বোধ হইল, অন্যায়রূপে স্বার্থ-সাধনের সঙ্কল্প করিয়াই তিনি এ কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার অনুগামী করিবার নিমিত্ত বিস্তর কৌশল করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই মানসপূর্ণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে আমাকে পদ-চ্যুত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমাগত তিন বৎসর শঠতা, মিথ্যাকথন ও নানা প্রকার প্রতারণার অনুষ্ঠান দ্বারা চরিতার্থ হইয়া, আপনার কোন প্রিয়-পাত্রকে আমার পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা অনেকেই তাঁহার দুষ্ট ব্যবহার ও আমার নির্দ্দোষ চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই মনোযোগ করিলেন না। এ সকল বিষয়ের যেরূপ চরম ফলাফল দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, ইহার প্রতীকার করা এক প্রকার অসাধ্য। অতএব নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া সংসারাশ্রমে ধিক্কার দিয়া, এই পথের পথিক হইয়াছি।”

এই সমুদায় শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, আমি বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন হইলাম এবং দয়া, ক্ষোভ ও ক্রোধ পর্য্যায়ক্রমে আমার অন্তঃকরণকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল। সাংসারিক লোকের এই সকল অন্যায়াচরণ ভাবিতে ভাবিতে, সে রজনীতে আমার সুন্দররূপ নিদ্রা হইল না; কারণ চিন্তাকুল-চিত্তে সুচারু সুষুপ্তি-সমাগম সম্ভব নয়। পরে রাত্রিশেষে কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেই আমি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারসকলই দর্শন করিলাম! সে সমুদায় আমার এরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়া রহিয়াছে যে, স্বপ্ন কি বাস্তবিক, সহসা অনুভব করা যায় না। আমি জন-সমাজের যে প্রকার বিপর্য্যয় দেখিয়াছি, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য ও স্বদেশ সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্টি করিয়াছি, তাহাই যথার্থবৎ বর্ণন করি। কিন্তু স্বপ্নের সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকিলেও না থাকিতে পারে।

আমার বোধ হইল যে, কোন তিমিরাবৃত রজনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে, অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলের পশ্চিমাংশ দাব-দাহ-তুল্য অসামান্য জ্যোতিঃপূর্ণ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সেই আশ্চর্য্য তেজোরাশি দ্রুতবেগে অধোদিকে আগমন করিতে লাগিল। অনুভব হইল, যেন সূর্য্যমণ্ডল কোন অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় কারণবশতঃ স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া, পতিত হইতেছে। কিঞ্চিৎ সমীপস্থ হইলে, তাহার অভ্যন্তরে এক পুরুষচ্ছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভাসমান হইল। তাহার কিছুকাল পরে, স্পষ্ট দেখিলাম—শুভ্রকান্তি, শুভ্রমাল্যাদি বিশিষ্ট, শুভ্রালঙ্কার-ভূষিত কোন তেজঃপুঞ্জ পুরুষ এক মণিময় দণ্ডহস্তে * পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন। সেই দণ্ডের শিরোভাগে 'ন্যায়' এই অক্ষরদ্বয় অঙ্কিত ছিল এবং দিবসে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, সেই তেজোমণ্ডল-মধ্যে ন্যায়-দণ্ডের প্রভা সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলতঃ সেই পুরুষের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া, আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইল, ইনি ধর্ম্ম-পুরুষ; ন্যায়দণ্ড হস্তে করিয়া ভূলোক শাসনার্থ আগমন করিতেছেন। অনেকেই তাঁহার প্রখর প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া, ভীত-চিত্ত হইল, আর যিনি সহিষ্ণুতা-প্রভাবে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন, তাঁহার নিকটে তিনি পরম রমণীয়রূপে প্রকাশিত হইলেন। এক কালেই তিনি ভয়ঙ্কর ভ্রূ-ভঙ্গি দ্বারা কাহাকেও ভয়ে কম্পমান করিলেন, কাহাকেও বা প্রসন্ন বদনে সুমধুর-হাস্য-প্রকাশ দ্বারা পরমানন্দ-নীরে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি ভূ-মণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্যের দৃষ্টিপথের অন্তর্গত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিকে কতকগুলি মেঘাবলি বিস্তার দ্বারা অপার মহামহিমান্বিত জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি আবৃত করিয়া, তৎপরিবেশ-স্বরূপ আলোক-ঘটা নানাবর্ণ-ভূষিত ও সর্ব্বলোকের সুখ-দৃশ্য করিয়া,

* পুরাণে ধর্ম্মের এইরূপ মূর্ত্তি বর্ণিত আছে

বিকীর্ণ করিলেন। ইতিমধ্যে যাবতীয় লোক বিস্ময়াপন্ন ও শঙ্কাকুল হইয়া, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাগত হইল। বোধ হইল, যেন সমুদায় মনুষ্য একত্র উপস্থিত হইয়াছে। অকস্মাৎ "সত্যের জয়!" "সত্যের জয়!" বলিয়া ঘন ঘন আকাশ-বাণী হইতে লাগিল। পরে সেই মহামহিমান্বিত পুরুষ মেঘাভ্যন্তর হইতে কহিতে লাগিলেন,—"মানবগণ! রাজ্যের অবিচার নিবারণার্থে আমার আগমন হইয়াছে; তোমরা আপন আপন প্রাপ্য-বিষয় প্রাপ্ত্যর্থে প্রস্তুত হও।" এই আকস্মিক দৈবধ্বনি শ্রবণ করিয়া জনসমাজ ভয়, আশা, হর্ষ ও খেদে যে প্রকার বিচলিত হইল, তাহা বর্ণন করা যায় না।

তদনন্তর ধর্ম্ম অনুমতি করিলেন,—"প্রথমতঃ বিষয়াধিকারের বিষয় সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ধনে যাহার স্বত্ব আছে, তিনি তাহা এই দণ্ডেই প্রাপ্ত হইবেন। অতএব যাহার যত লেখ্যপত্র আছে, সমস্ত উপস্থিত কর।" ইহা শুনিয়া, যাবতীয় লোক স্ব স্ব স্বত্বাধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিবিধ-প্রকার লেখ্যপত্র আহরণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য তাহাদের উপর ন্যায়দণ্ডের জ্যোতিঃ পতিত হইবামাত্র, তাহাদের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। সেই দণ্ডের এ প্রকার আশ্চর্য্য গুণ যে, তদীয় কিরণ-স্পর্শমাত্র যাবতীয় কৃত্রিম পত্র দগ্ধ হইয়া গেল। দহ্যমান পত্রের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, সমুদায় লাক্ষাদ্রব ও অনর্গল ধূমোদ্গমদ্বারা সে স্থান অতি ভয়ানক ও পরম বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। কোন কোন পত্রের দুই চারি পঙ্‌ক্তি ও কোন কোন পত্রের কেবল কতিপয় প্রক্ষিপ্ত অক্ষর নষ্ট হইয়া, তাহার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কিন্তু শত শত মুদ্রার ষ্ট্যাম্পপত্র সকল দাবানল-দগ্ধ মহারণ্যের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া, পর্ব্বতাকার হইল। সেই লক্ষ লক্ষ মণিময় দণ্ডের জ্যোতিঃ কত কত পরম গুহ্যস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, অলক্ষিত, অপহৃত ও সংগোপিত লেখ্য-পত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। প্রধান প্রধান বিচারাগারের সহস্র সহস্র অনুজ্ঞা-পত্র দগ্ধ হইল, ইন্‌সালবেণ্ট কোর্টের প্রায় সমস্ত নিষ্কৃতি পত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল ও যে সকল সম্ভ্রমশালী ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নির্ম্মুক্ত পুরুষের ন্যায় বিহার ও ব্যবহার করিতেছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বন্দী হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে উৎকোচ, অপহরণ, প্রতারণা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা যাবতীয় ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় পর্ব্বত-প্রমাণ রাশীকৃত হইয়া, মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিল। তখন ধর্ম্মপুরুষ ঘোষণা করিয়া দিলেন,—"এই ধনরাশি হইতে যাহার যত ন্যায্য ধন আছে, গ্রহণ কর।"

উহাতে লোক-সমাজের কি বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল! সহস্র সহস্র ব্যক্তি অপূর্ব্ব বেশভূষণ ধারণপূর্ব্বক পরম-রমণীয় রথারোহণ করিয়া, মহাবেগে গমন করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ অবতরণ পুরঃসর গাত্র হইতে সমস্ত বস্ত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া, এক সামান্য বসন পরিধান-পূর্ব্বক পদব্রজে চলিলেন। কোন স্থানে দেখিলাম, লক্ষপতি বা কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি পরম শোভাকর অট্টালিকায় বহুমূল্য অত্যুত্তম আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে পরমসুখে কাল-হরণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একজন সামান্য গৃহস্থ অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আসনচ্যুত করিয়া দিল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া, অতি পুরাতন বৃক্ষ-মূল-বিদ্ধ ভগ্ন গৃহে গিয়া বাস করিলেন। কুত্রচ দৃষ্টি করিলাম, যে সকল ধনাসক্ত মহামান্য মনুষ্য সমধিক ধনাগম করিয়া, অতি উদার-ভাবে ব্যয়-ব্যসন করিয়া আসিতেছিলেন ও অতিশয় আড়ম্বর-সহকারে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া, বিপুল কীর্ত্তি-লাভ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদের সামান্যরূপ উদরান্ন আহরণ করাও কঠিন হইল এবং কতকগুলি নিরন্ন-

নির্ব্বিষয় ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন ধনাধিকার-বিষয়ে যে সকল অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইল, তাহার বিবরণ করিয়া শেষ করা যায় না। জাগরিত হইয়া যাহা দেখিতেছি, তখন তাহার বিস্তর অন্যথাভাব দৃষ্টি করিয়াছিলাম।

(৺অক্ষয়কুমার দত্ত)

দেবমন্দির।

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন এক জন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্যপথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া

ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময় একবার বিদ্যুৎপ্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে,প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে কোন আশ্রয়স্থান আছে জানিয়া, অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ; হস্ত মার্জ্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দ্দিক্ হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমত সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কথঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবল-বেগে ধারাপাত হইতেছিল, স্নুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেবালয়-মধ্যবাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বল-দর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক ততদূর করিলেন না; তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি মন্দির মধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্তদ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে

মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবিষ্ট ব্যক্তি তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না"। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবাপুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেব-মূর্ত্তিকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকারমধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দিরমধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না, কিন্তু অলঙ্কার-ঝঙ্কারশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, বৃষ্টিধারা ও ঝটিকাপ্রবেশরোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

"আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সাবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "স্বরে বুঝিতেছি, এ প্রশ্ন কোনও সুন্দরী করিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?"

মন্দিরমধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড় ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যে হই, আমাদিগের আত্মপরিচয় দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলা জাতির কোন প্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।"

রমণী উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, এতক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা রহিয়াছেন। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার

জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে, আমাদিগের বাহক ও দাস-দাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব "

রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অর্দ্ধরাত্রে ঝটিকা-বৃষ্টি নিবারিত হইলে যুবক কহিলেন, "আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাই।"

এই কথা শুনিয়া, যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহাশয়, গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক একজন ভৃত্য অতি নিকটেই বসতি করে; জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তরমধ্যে বাস করিয়া থাকে, এজন্য সে গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।"

যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয় রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মন্দি-ররক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়া প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে, দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্য্য-বেক্ষণে পথিকের কোন দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না; বিশেষতঃ তৎস্বীকৃত স্বর্ণমুদ্রার লোভ সংবরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাত পাঁচ ভাবিয়া মন্দিররক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে দুইজন মাত্র কামিনী। যিনি নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন।

পরন্তু তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত পরিচ্ছদ, তদুপরি রত্নাভরণ-পারিপাট্য দেখিয়া, পান্থ নিঃসন্দেহ জানিতে পারিলেন যে, এই নবীনা হীন-বংশসম্ভূতা নহে। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন; অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না। বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশদ্‌বর্ষ বোধ হইল। সহজেই যুবা পুরুষের উপলব্ধি হইল যে, বয়োজ্যেষ্ঠারই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয়মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে, উভয়েই পশ্চিমদেশীয় অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী। যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মিসমূহ প্রপতিত হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে. শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে, অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে। প্রাবৃট্‌সম্ভূত নবদূর্ব্বাদল তুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ-কান্তি, বসন্ত প্রসূত নবপত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত-জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল; কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসংবদ্ধ অসি; দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্ষা ছিল; মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখণ্ড হীরক; কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল; কণ্ঠে রত্নহার।

পরস্পর সন্দর্শনে উভয়পক্ষেই পরস্পরের পরিচয় জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।

(৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাশের উপদেশ।

রাজা, চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। রাজকুমার যুবরাজ হইবেন, এই বিষয়ের ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজবাটী মহোৎসবময় এবং নগর আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অভিষেকের সামগ্রী-সম্ভার সংগ্রহের নিমিত্ত উপযুক্ত লোক সকল দিগ্‌দিগন্তে প্রেরিত হইল।

একদা কার্য্য-ক্রমে চন্দ্রাপীড় অমাত্য-ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন, তথায় শুকনাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুর-বচনে কহিলেন, "কুমার! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদয় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য, সমুদায় জানিয়াছ। তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত ও ধন-সম্পত্তির অধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; সুতরাং যৌবন, ধন-সম্পত্তি, প্রভুত্ব তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবন-রূপ বনে প্রবেশ করিলে, বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যৌবন-প্রভাবে মনে এক প্রকার তমঃ উপস্থিত হয়, উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিত হয়। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ-সম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধন-মদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধন-মদে উন্মত্ত হইলে, হিতাহিত বা সদসদ্-বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহংকৃত পুরুষেরা মানুষকে

মানুষ বলিয়া জ্ঞান করে নাই। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও প্রধান বলিয়া ভাবে এবং অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথা শুনিলে, তৎক্ষণাৎ খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্ব-রূপ হলাহলের ঔষধ নাই। প্রভু-জনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া, পরের দুঃখ সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থ-পর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য এ সকল কেবল অনর্থ-পারাবার। অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-রূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে, উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে, আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

“সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার কি দাহিকা শক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ কি স্ফটিক-মণির ন্যায় মৃৎ-পিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্র-সম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্য-শালীকে উপদেশ দেয়, এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরি-গুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভু বাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে, অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন, পারিষদেরা তাহাই যুক্তি-যুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও

পারিষদদিগের নিকট সু-সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয় এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন, তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্ম-মতের বিপরীত-বাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

"প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ,—ইনি অতি দুঃখে লব্ধ ও অতি যত্নে রক্ষিত হইলেও, কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না, রূপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা করেন না; রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, সদ্বংশ-জাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য পুরুষাধমের আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বভাব-চঞ্চলা লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করেন, সে স্বার্থ-নিষ্পাদন-পর ও লুব্ধ-প্রকৃতি হইয়া দ্যূত ক্রীড়াকে বিনোদ, যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে, ধনীদিগের নিকটে জীবিকা লাভ করা কঠিন। যাহারা অন্য-কার্য্য-পরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-শূন্য হয় এবং সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসা-ভাজন হয়। প্রভু স্তুতি বাদীকে যথার্থ-বাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শ ক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্ট-বক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, নিকটেও বসিতে দেন না। তুমি দুরবগাহ রাজ্য তন্ত্রের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সাবধান!

যেন সাধুদিগের উপহাসাস্পদ ও চাটুকারের প্রতারণাস্পদ হইও না। চাটুকারের প্রিয়-বচনে তোমার যেন ভ্রান্তি উপস্থিত না হয়। যথার্থ-বাদীকে নিন্দক বলিয়া যেন অবজ্ঞা করিও না। রাজারা আপন চক্ষু দ্বারা কিছুই দেখিতে পান না, নিরন্তর চাটুকার ও স্বার্থপর লোকদ্বারা পরিবৃত থাকেন। তাহারা প্রভুকে প্রতারণা করিয়া আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় ও সর্ব্বদা উহারই চেষ্টা পায়। বাহ্য-ভক্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক আপনাদিগের দুষ্ট অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে, সময় পাইলেই চাটু-বচনে প্রভুকে প্রতারিত করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে। তুমি স্বভাবতঃ ধীর; তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ দিতেছি, সাবধান! যেন ধন ও যৌবন-মদে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভূ-ভার বহন কর, অরাতিমণ্ডলের মস্তক অবনত কর এবং সমুদায় দেশ জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে স্বীয় আধিপত্য-স্থাপন পূর্ব্বক প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর।”

এইরূপ উপদেশ দিয়া অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড় শুকনাশের গভীর অর্থ-যুক্ত উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে রাজবাটীতে গমন করিলেন।

(৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন)

ধন ও ব্যয়।

ধন, আমাদের কেবল জীবিকানির্ব্বাহ, মান-সম্ভ্রম রক্ষা ও সৎকর্ম্মে ব্যয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়; ধনে আর কিছু প্রয়োজন নাই; অতএব সৎকর্ম্মে বিত্ত-শাঠ্য করা অতি গর্হিত। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত অবসরে সর্ব্বস্ব ব্যয় করাও দূষণীয় নহে, কিন্তু সচরাচর সাংসারিক ব্যয় করিবার সময় আপনার ওজন বুঝিয়া চলা উচিত। এমন উদার ও মুক্ত-হস্ত হইলে, পরিণামে রিক্ত-হস্ত হইতে হইবে! উপজীবি-গণ যাহাতে কোনরূপে ঠকাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান থাকা সকলেরই উচিত।

যদি কেবল স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইলেই পরিতুষ্ট হও, তবে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করিবে; আর যদি সম্পন্ন হইতে ইচ্ছা কর, তবে আয়ের তৃতীয়াংশমাত্র ব্যয় করিবে। তুমি যত বড় ধনী হও না কেন, তথাপি আপনার বিষয় আপনি পর্য্যবেক্ষণ করা কখন ক্ষুদ্রতার কর্ম্ম বলিয়া মনে করিও না। পাছে ভগ্ন-দশা দেখিয়া বিষণ্ণ হইতে হয়, এই কারণে অনেকে বিষয়-পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপেক্ষা করেন, কিন্তু তাহা হইলে উত্তরোত্তর আরও ভগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিকার স্থান না দেখিলে কিরূপে প্রতীকারের আরম্ভ হইতে পারে? যাঁহারা স্বয়ং বিষয়-রক্ষা না করেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মচারী মনোনীত করিবার সময় অনেক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য এবং মধ্যে মধ্যে কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন করা উচিত; নতুবা পুরাতন কর্ম্মচারিগণ কিছুদিনের পর প্রভুর

রাশি বৰ্দ্ধিত হয় এবং ক্রমে ভয়ঙ্কর হইয়া, তাঁহার সর্ব্বনাশপূর্ব্বক স্বীয় স্বার্থসাধন করিতে ত্রুটি করে না।

কোন বিষয়ে ব্যয়-বাহুল্য করিতে হইলে, অপর বিষয়ে হস্ত-সঙ্কোচ করিতে হইবে। যদি আহারের পারিপাট্য-বিষয়ে অধিক ব্যয় কর, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে। যদি ভদ্রাসন-বিষয়ে অনেক আড়ম্বর কর, তবে যান-বিষয়ে মিতব্যয়ী হইতে হইবে। নতুবা একেবারে, চারিদিকে মুক্ত-হস্ত হইলে অচিরাৎ উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা।

যদি ঋণ থাকে, ক্রমে পরিশোধ কর, একেবারে অনেক ঋণ শোধার্থ সহসা বিষয় বিক্রয় করিলে, উচিত মূল্য হইবে না, অবশ্য ক্ষতি-স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমে পরিশোধ করার আর এক গুণ এই যে, তাহাতে মিতব্যয়িতা অভ্যস্ত হইয়া আইসে। কিন্তু একেবারে পরিশোধ করিলে আবার অপ্রতুলতা ঘটিতে পারে, সুতরাং আবার ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহাকে ঋণ-মুক্ত হইতে হইবে, তাঁহার অল্প ব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া নিন্দনীয় নহে। ব্যয় নিতান্ত অল্প হইলেও তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। অল্প আয়ের নিমিত্ত ন্যূনতা স্বীকার ক্ষুদ্রের কর্ম্ম বটে, কিন্তু অল্প ব্যয়ে বিমুখ হওয়া কখনই ক্ষুদ্রতা নহে।

নিত্য কর্ম্মে ব্যয় বাহুল্য করিতে হইলে, সবিশেষ বিবেচনা করিবে কিন্তু নৈমিত্তিক কর্ম্মে মুক্ত-হস্ত হইলে হানি নাই, বরং কার্পণ্য প্রকাশ করিলে, অসম্ভ্রম ও নিন্দা হয়।

অতুল ঐশ্বর্য্য নিতান্ত আবশ্যক নহে, বিতরণ ভিন্ন উহার আর কিছু প্রয়োজন নাই, প্রত্যুত উহার রক্ষণার্থ খেদ প্রাপ্ত হইতে হয় এবং অনেক গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ থাকে না। তবে "আপদর্থে ধন রক্ষা করিবে" বলিয়া শাস্ত্রে যে বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে, তজ্জন্য মানুষের

কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক। যেহেতু সংসারে থাকিলে, মানুষের পদে পদে বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

অভিমান প্রকাশ বা আড়ম্বরের নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করিও না। যাহা ন্যায়তঃ অর্জ্জন করিবে, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিবে এবং দান ও বিতরণ করিতে কাতর হইবে না। সংসারী লোকের ধনে একেবারে [illegible] করাও উচিত নহে, আপনার ও অন্যের উপকারার্থে সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করা কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে। সত্বর সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইও না, তাহা হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না; ধর্ম্ম বাঁচাইয়া হঠাৎ বড় মানুষ হইতে প্রায় দেখা যায় না।

মিতব্যয়িতা সম্পন্ন হইবার প্রধান উপায়; কিন্তু উহাও নিতান্ত নির্দ্দোষ নহে, উহাতে দান-ধর্ম্ম রোধ এবং দীন ও অনাথ ব্যক্তিদিগের আশা ভঙ্গ করিতে হয়।

কৃষি-কর্ম্মে অনেকে সম্পন্ন হইয়া থাকেন। বসুমতী প্রসন্না হইয়া যাহার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি-পাত করেন, সে অতি ভাগ্যবান্, সন্দেহ নাই। এরূপে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে অধর্ম্ম বা অন্যায়ের লেশ নাই, বাস্তবিক অধিক মূলধন লইয়া কৃষি কর্ম্ম করিলে অতিশয় লাভ হয়।

বাণিজ্যে বিত্তোপার্জ্জন করাও দূষণীয় নহে। সকলের সহিত সদ্ব্যবহার ও পরিশ্রম করিতে পারিলেই বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ হয়। সমুদ্র-সমুত্থানেও অনেকে বিলক্ষণ লাভ করে। যদি সমুত্থায়ীরা সকলে সাধু হন ও পরস্পর বঞ্চনা না করেন, তবে উক্ত ব্যবসায় মন্দ নহে। কুসীদ-ব্যবহারে কোন বিঘ্ন নাই, ইহাতে অর্থ প্রয়োগ করিলে কোন সংশয়ে আরোহণ করিতে হয় না, কিন্তু উহাতে আয় অতি অল্প।

কোন বিষয়ে অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিলে, অতি শীঘ্র ভাগ্যবান্ হইবার সম্ভাবনা। এক ব্যক্তি কানেরী দ্বীপ-পুঞ্জে সর্ব্বপ্রথম

সাধারণের হিতার্থ কোন অনুষ্ঠানে বিনিযুক্ত হইবে, দায়াদের বয়স যদি অল্প হয় এবং বিবেক-শক্তি সম্যক্ উন্মেষিত না হইয়া থাকে, তবে [illegible] ধূর্ত্ত তাহার সহিত জুটিয়া লুটিয়া খাইবে।

(৺রামকমল ভট্টাচার্য্য।)

পৌরুষের পরিণাম

[illegible] [illegible] দলে নাম
[illegible] [illegible] প্রকাশে
[illegible] জীর্ণ অভিলাষ মত,
[illegible] দুর্গ প্রাকারে।

([illegible])

'রুদ্র-মণ্ডল' গিরিদুর্গ জয়ের পরদিন অপরাহ্নে সেই দুর্গোপরি একরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল। রৌপ্য-বিনির্ম্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্তবর্ণের চন্দ্রাতপ, নীচে রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগদীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন। চারিধারে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্নের বায়ুহিল্লোলে খেলা করিতেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লীশ্বরের, জয়সিংহের ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্যবদনে শিবজীকে বলিলেন, "আপনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অবধি তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়াছেন। এ

উপকার দিল্লীশ্বর কখনই বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয় হইয়াছে।”

শিবজী। মহারাজের প্রসাদে দুর্গজয় হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপক্ষেরা কল্য রজনীতে সকলেই জাগরিত ও সসজ্জ ছিল। তাহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে, এ জীবনে তাহার পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে দুই তিন শত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না; সেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না।

শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন; পরে বন্দিগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎ খাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত; কল্যকার যুদ্ধের পর কেবল দুই এক শত বন্দিরূপে আছে; অন্য সমস্ত হত বা পলায়িত। বন্দীদিগের হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে বদ্ধ,—তাহারা সভা-সম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন, “সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আফগান-সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয়, দিল্লীশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও; আমার আদেশে কেহ তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।”

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না। সকল যুদ্ধে সকল দুর্গবিজয়ের পর তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন; তাহার বন্ধুগণ কখন কখন তাঁহাকে এজন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎ খাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হস্তদ্বয় পশ্চাৎ দিকে বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খড্গের আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে। বীর সদর্পে সভা সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া, স্বয়ং আসন-ত্যাগ করিয়া খড্গ দ্বারা রজ্জু কাটিয়া ফেলিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বীরবর! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্ত বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দিরূপে ছিলেন, আমার দোষ মার্জ্জনা করুন। আপনি এক্ষণে স্বাধীন। জয়-পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।"

রহমৎ খাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও স্থির-গর্ব্বিত-নয়নের একটি পত্রও কম্পিত হয় নাই; কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভদ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধ-সময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখন রহমৎ খাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য বৃদ্ধের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎ খাঁ মুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "ক্ষত্রিয়রাজ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি বাদশাহের উপর বাদশাহ, জমীন ও আশমানের সুল্‌তান, তিনি এই জন্যই আপনাকে নূতন রাজ্যবিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।"

জয়সিংহ। পাঠান সেনাপতি, আপনারও উচ্চপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদবৃদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে লিখিতে পারি যে,

আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন।

রহমৎ খাঁ। মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম। কিন্তু আজীবন যাহার কার্য্য করিয়াছি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না। যত দিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।

শিবজী। তাহাই হউক। আপনি অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবে।

রমহৎ খাঁ। ক্ষত্রিয়প্রবর! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না; আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভু-ভক্ত নহে। কল্য দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধান-দাতা আপনারই একজন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্যলঙ্ঘন করিব না।

এই বলিয়া রহমৎ খাঁ ধীরে ধীরে প্রহরিগণের সহিত প্রাসাদাভি-মুখে চলিয়া গেলেন। রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণ বুঝিলেন, এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বৃথা; তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল, অদ্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া, পরে সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন্ জানিয়াছিলে?"

সৈন্যগণ উত্তর দিল, "এক প্রহর রজনীতে।"

জয়সিংহ। তাহার পূর্ব্বে কেহই এ কথা জানিতে না?

সৈন্যগণ। রজনীতে কোন একটা দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে, জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা জানিতাম না।

জয়সিংহ। ভাল, কোন্ সময়ে তোমরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে?

সৈন্যগণ। অনুমান দেড় প্রহর রজনী সময়ে।

জয়সিংহ। উত্তম, এক প্রহর হইতে দেড় প্রহরমধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে? কেহ অনুপস্থিত ছিল না? যদি হইয়া থাকে, প্রকাশ কর। একজনের দোষের জন্য সহস্র জনের গ্লানি অনুচিত। তোমরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে রাজা শিবজীর অধীনে যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পা[illegible]ব না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বি[illegible] থাকে, তাহাকেও আনিয়া দাও। যদি সে কল্য রজনীর মধ্যে মা[illegible] থাকে, তাহার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের নাম কলুষিত হইতেছে?

সৈন্যগণ তখন কল্যকার কথা স্মরণ করিতে লাগিল, পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল, শিবজীর ক্রোধ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। স্তব্ধ হইয়া শিবজী বলিলেন, "মহারাজ! অদ্য যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।"

চন্দ্ররাও নামে একজন সেনাপতি অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজন্! কল্য এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীন একজন হাবিলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। যখন দুর্গতলে পৌঁছিলাম, তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।"

শিবজী। সে কে, এখনও জীবিত আছে?

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ! শিবজীর ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে, সভাতলে একটী সূচিকা পড়িলে বোধ হয়, তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন, "রঘুনাথজী হাবিলদার।"

সকলে নির্ব্বাক্, বিস্ময়-স্তব্ধ!

চন্দ্ররাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানব-প্রকৃতিতে ঈর্ষ্যার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্তস্থাপন করিয়া চন্দ্ররাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন, "রে কপটাচারিন্! বৃথা এ কপট অভিযোগ করিতেছিস্! তোর নিন্দা রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু মিথ্যা নিন্দকের শাস্তি সৈন্যেরা দেখুক্।"

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্শা উত্তোলন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! প্রভু চন্দ্ররাওয়ের প্রাণসংহার করিবেন না, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।"

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলে নির্ব্বাক, বিস্ময়-স্তব্ধ।

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি, রঘুনাথ, তুমি এই কার্য্য করিয়াছ? তুমি যে প্রাচীর লঙ্ঘনের সময় একাকী দুর্দ্দমনীয় তেজে অগ্রসর হইয়াছিলে, তুমি যে দুই শত মাত্র সেনা লইয়া পাঁচশত আফগানকে দুর্গের নীচে

পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছিলে,—তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্ব্বে আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে?"

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "প্রভু, আমি সে দোষে নির্দ্দোষী।"

দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিষ্কম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে এবং চারিদিকে অসংখ্য লোক রঘুনাথের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছে, রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত, তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে। কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট মধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তবে কি জন্য আমার আজ্ঞ লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?"

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে বলিলেন, "কপটাচারিন্! এই জন্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ছিলে? কিন্তু কুক্ষণে শিবজীর নিকট ছলনা-চেষ্টা করিয়াছিলে!"

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিত-স্বরে বলিলেন, "রাজন্! ছলনা ও কপটাচরণ আমার বংশের রীতি নহে; বোধ হয়, প্রভু চন্দ্ররাও তাহা জানিতে পারেন।"

রঘুনাথের স্থিরভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতিস্বরূপ হইল। তিনি

কর্কশভাবে বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! পরিত্রাণ-চেষ্টা বৃথা, ক্ষুধার্ত্ত সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।"

রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জ্জনা করুন।"

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন, "বিদ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে তীক্ষ্ণ বর্শা দেখিলেন, তখনও সেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।"

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে, এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্তধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল। তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত হইয়া কর্কশস্বরে কহিলেন, "হস্ত ত্যাগ করুন, রাজপুতদিগের কি নিয়ম, জানি না; জানিতে চাহি না; মহারাষ্ট্রীয়দিগের সনাতন নিয়ম বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।"

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ক্ষত্রিয়রাজ! অদ্য যাহা করিবেন, কল্য তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলে, চিরকাল সেজন্য অনুতাপ করিবেন। যুদ্ধব্যবসায়ে আমার কেশ শুক্ল হইয়া গিয়াছে, আমার মত গ্রহণ করুন, এ যোদ্ধা বিদ্রোহী নহে। কিন্তু সে বিচার এক্ষণে আবশ্যক নাই, আপনি আমার সুহৃদ্, সুহৃদের নিকট আমি এই রাজপুত-যোদ্ধার প্রাণভিক্ষা করিতেছি, আমাকে ভিক্ষা দান করুন।"

শিবজী জয়সিংহের ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন; কহিলেন, "তাত! আমার পরুষবাক্য মার্জ্জনা করুন, আপনার কথা কখনও অবহেলা করিব না, কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে, তাহা কখনও মনে ভাবে নাই। হাবিলদার! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবনরক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখ দর্শন করিতে চাহে না!"

(৺রমেশচন্দ্র দত্ত)

নিশীথে আগন্তুক।

'কে তুমি-
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ?'

মাইকেল (মধুসূদন দত্ত)

কয়েকদিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য। শিবজী সম্রাটের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে।

ক্রমে জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত-কলরব ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল, দুই একটি বাটীর গবাক্ষভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল। দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটি তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমচ্ছটা আর নাই। শিবজী পূর্ব্বদিকে চাহিলেন, দেখিলেন, শান্ত বিস্তীর্ণ দিগন্ত-প্রবাহিণী যমুনানদী সায়ংকালে নিস্তব্ধভাবে অনন্ত সাগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছে।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জুম্মা মস্‌জিদ্ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উত্থিত হইল। [illegible] গম্ভীরশব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। শিবজী মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূরউচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মস্‌জিদের শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত গম্বুজগুলি সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

রজনী গভীর, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না; কেন না, অন্য পূর্ব্বকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বাল্য-কালের সুহৃদ্বর্গ, বাল্যকালের আশা, ভরসা, উদ্যম; সাহসী ও উন্নত-চরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ্ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী! সেই বীরমাতা শিশু শিবজীকে মহারাষ্ট্র-জয়ের কথা বলিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা বালক শিবজীকে বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন।

তাহার পর জীবনের উন্নত আশা, উন্নত কার্য্য-পরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ্, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব্ব

জয়লাভ, দোর্দ্দিণ্ড প্রতাপ, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ। শিবজী বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, প্রতি বৎসরই অপূর্ব্ব বিজয়ে বা অসমসাহসের কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল!

সে কার্য্যপরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়াবিনী? না. এখনও ভবিষ্যৎ আকাশে গৌরব-নক্ষত্র দীপ্তিমান্ রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তীর মস্তকের উপর রাজচ্ছত্র উন্নত হইবে।

শিবজী এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারময় আকাশপটে যেন একটি দীর্ঘ নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি।

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই প্রতিকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণনয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাজুট, শরীরে বিভূতি; হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা, কোন প্রকার অস্ত্র নাই। তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট্-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকারময় ঘরের ভিতর শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক!"

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল। বিপদের সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে

হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটি দীপ জ্বালিলেন, পরে ঔৎসুক্য সহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এত দূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন? অদ্য নিশীথে গবাক্ষদ্বার দিয়া আমার নিকট আসিবারই বা অর্থ কি?

সীতাপতি। মহারাজ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল। আপনি যে সচিবপ্রবরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেন না, আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার ব্রত সাধনার্থে আমাকে দেশ-পর্য্যটন করিতে হয়, সেই প্রয়োজনেই মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান-দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি; প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি, তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি?

শিবজী। তথাপি কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ, প্রকাশ করিয়া বলুন।

সীতাপতি। নিবেদন করিতেছি, কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন?

শিবজী। শারীরিক কুশলে আছি, শত্রুমধ্যে মনের কুশলতা কোথায়?

সীতাপতি। প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধি আছে, আপনার শত্রু কোথায়?

শিবজী। সর্পের সহিত ভেকের সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী? সীতাপতি! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না:

যদি রায়গড়ে আপনার পরামর্শ শুনিতাম, তাহা হইলে কঙ্কণদেশের পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে অদ্যাপি স্বাধীন থাকিতে পারিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া দিল্লীনগরীতে বন্দী হইতাম না।

সীতাপতি। প্রভু, আত্ম-তিরস্কার করিবেন না, মনুষ্যমাত্রেই ভ্রান্তির অধীন, এ জগৎ ভ্রম-পরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষমাত্র নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, সদাচরণ প্রদর্শন করিয়া, এ স্থানে আসিয়াছেন। যিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহাকেই দণ্ড দিবেন। প্রভু! খলতার জয় নাই, অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহারাজ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছেন, মহারাষ্ট্র-দেশে সে কথা এখনও কেহ বিস্মৃত হয় নাই ; আরংজীব যদি কপটা-চরণ করেন, তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগলসাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।

উৎসাহে উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "সীতাপতি! সে ভরসা এখনও লোপ পায় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন, মহারাষ্ট্র-জীবন লোপ পায় নাই! কিন্তু হায়! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দিস্বরূপ থাকিব?"

সীতাপতি। যবে গগনসঞ্চারি বায়ুকে আরংজীব জালমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে দিল্লীর প্রাচীর মধ্যে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তবে বোধ করি, আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন।"

সীতাপতি। প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। সে উপায় কি?

সীতাপতি। অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্ব্বদিকে এক স্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় বীরের অসাধ্য নহে, অপরপার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে আটজন মাল্লা আছে, প্রভু নিমেষমধ্যে মথুরায় পৌঁছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।

শিবজী। আমি আপনার উদ্যোগে তুষ্ট হইলাম। আপনি যে প্রকৃত বন্ধু, তাহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম, কিন্তু প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় যদি কেহ আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে, পলায়ন দুঃসাধ্য; আরংজীবের হস্তে মৃত্যু নিশ্চিত।

সীতাপতি। প্রাচীরের যে স্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে, তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশ জন তীরন্দাজ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

শিবজী। ভাল, নৌকায় গমনকালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ-প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?

সীতাপতি। অষ্টজন ছদ্মবেশী নৌকাবাহক আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তূণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। মথুরা পৌঁছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?

সীতাপতি। আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চির পরিচিত ও বিশ্বস্ত, তাহা আপনি জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাহার পত্র পাঠ করুন।

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সীতাপতি, শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনি পাঠ করিয়া শুনান"

সীতাপতি লজ্জিত হইলেন ; তাঁহার তখন স্মরণ হইল যে, শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই।

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুবেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পত্রে বিস্তীর্ণ লেখা আছে।

শিবজী বলিলেন, "গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে, কখনই বোধ হয় না। শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনা অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ ও প্রিয় সুহৃদ্ তন্নজী মালশ্রী কোথায় থাকিবে? আমার বিশ্বস্ত সৈন্যগণই বা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?

সীতাপতি। আপনার পুত্র, প্রিয়সুহৃদ্ ও মন্ত্রিবর আপনার সহিত অদ্য রজনীতে যাইতে পারে। আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই, আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।

শিবজী। সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না; তিনি ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

সীতাপতি। যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্রসেনা আপনার নিরাপদ্-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণবিসর্জ্জন না করিবে ?

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন, পরে মহানুভব ধীরে ধীরে বলিলেন, "গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম ; কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না, এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি। অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন।"

সীতাপতি। অন্য উপায় নাই।

শিবজী। তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে শিবজী কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।

সীতাপতি। সময় নাই। অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন, নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ।

শিবজী। আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন, জানি না, কিন্তু আপনার কথা যদি যথার্থই হয়, তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই। শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্ম-পরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।

সীতাপতি। প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরংজীবকে শাস্তিদান করুন। সেই দূর-মহারাষ্ট্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথায় সাগর-তরঙ্গের ন্যায় সমর-তরঙ্গ প্রবাহিত করুন। অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবে ; অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে।

শিবজী। সীতাপতি! যিনি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, তিনি বিশ্বাস-

ঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।

সীতাপতি। প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না, কল্য আপনি বন্দী।

শিবজী। তাহাই হউক। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর এ প্রতিজ্ঞা অবিচলিত।

সীতাপতি নীরব হইয়া রহিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু। তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "গোস্বামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না। আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না। রায়গড়ে আপনার বীরপরামর্শ ও দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্‌যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। আপনি আমার সহিত অবস্থান করুন, আপনার পরামর্শে শীঘ্র সকলেরই উদ্ধারসাধন করিব।"

সীতাপতি। প্রভু! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম; জগদীশ্বর জানেন, আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই। কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রতসাধনের জন্য নানা স্থানে নানা কার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।

শিবজী। এ কি অসাধারণ ব্রত, জানি না, সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রত-ধারণ করিয়াছেন?

সীতাপতি। সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ।

শিবজী। ভাল, এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন, "আমার ললাটে একটি

অমঙ্গল লিখিত আছে, আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ করিয়া জীবনধারণ করিয়াছি, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর বিমুখ। সেই অমঙ্গল খণ্ডনার্থ ব্রত-ধারণ করিয়াছি।"

শিবজী। এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেই বা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ বিষম ব্রত-ধারণ করিতে বলিল?

সীতাপতি। কার্য্যবশতঃ আমি স্বয়ংই এটি জানিতে পারিলাম, ঈশানী-মন্দিরে একজন আমাকে এই ব্রত-ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, সমস্ত আপনার নিকট নিবেদন করিব। যাঁহার পূজার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি বিমুখ হইলে এ জীবনে আবশ্যক কি?

শিবজী। সীতাপতি! যাহা বলিলেন, যথার্থ। যাহার জন্য প্রাণপণ করি, যাহার জন্য আত্মসমর্পণ করি, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।

সীতাপতি। প্রভু! আপনি কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন?

শিবজী। জগদীশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষী বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি। সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।

সীতাপতি। সে হতভাগার নাম কি?

শিবজী বলিলেন, "রঘুনাথজী হাবিলদার!"

ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল। শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সীতাপতি বলিলেন, "দীপ অনাবশ্যক, বলুন, শ্রবণ করিতেছি।"

শিবজী। আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার। সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প, আপনার ন্যায় তাহার বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুদ্দমনীয় বীরত্ব ও সাহস সর্ব্বদা বিরাজ করিত। আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।'

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম; সে দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম, রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্ব্বদা আমার ছায়ার ন্যায় আমার নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুদ্দমনীয় তেজে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইত। এখনও বোধ হয়, তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন আমি দেখিতে পাইতেছি।

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। সেই বালক এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গজয় হইয়াছিল, অনেক যুদ্ধে সে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য? আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে

দূর করিয়া দিলাম। শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই, যাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।

শিবজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন, "তাহাতে আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম।"

শিবজী। দোষী? রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম, জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহানুভব জয়সিংহ পরে এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া জানিযাছেন যে, তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধের পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই জন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম. শুনিয়াছি, সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি।

শিবজীর কথা সমাপ্ত হইল, তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল, তিনি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন, "সীতাপতি!"

কোন উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন; দেখিলেন, সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই।

(৺রমেশচন্দ্র দত্ত)

আরোগ্য।

'এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হ'য়ে
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে।
হে বীর, কমলচক্ষে কর পরিহার,
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার।'

(কাশীরাম দাস)

উপরি-উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুনরায় আনন্দভাব দৃষ্ট হইল, সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। হিন্দুমাত্রেই এ কথা শুনিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিল; মহাশয় মুসলমানগণ এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, দোকানে, মস্জিদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল, আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নগরে ধূমধাম পড়িয়া গেল। শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড়লোকের বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট ভেট পাঠাইতে লাগিলেন; এমন কি, প্রতি মস্জিদে ও ফকিরগণের সেবার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই বদান্যতা ও সদাচরণে, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত, আট কি দশ জন লোক বহিয়া লইয়া যাইত। কয়েকদিন এইরূপে মিটান্ন বিতরিত হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার বাটীতে যাইবে?" বাহকেরা উত্তর করিল, "রাজা জয়সিংহ-সদনে।"

প্রহরিগণ। তোমাদের প্রভু আর কত দিন মিষ্টান্ন পাঠাইবেন?

বাহকেরা। অদ্যই শেষ।

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ যাইয়া বাহকেরা একটি অতি সঙ্গোপন স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুই আধার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া যাইতেছে। বাহকেরা একটি ইঙ্গিত করিল, একটি আধার হইতে শিবজী অপরটি হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন। উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরাভিমুখে যাইতেছেন। সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে দুই এক জন লোক যখন নিকট দিয়া যায়, শম্ভুজীর হৃদয় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পিত হইয়া উঠে। শিবজীর চিরজীবন এইরূপ বিপৎপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে এ বিপদ্ কিছু নূতন নহে, তথাপি তাঁহার হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

উভয়ে কম্পিতহৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন। একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে যায়?"

শিবজী উত্তর করিলেন, "গোস্বামী।" হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

প্রহরী। কোথায় যাইতেছ?

শিবজী। মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

উভয়ে প্রাচীর পার হইলেন!

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক ধনাঢ্য ও উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শম্ভুজী ত্বরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

দূরে একটি বৃক্ষতলে একটি অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে, দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেই দিকে যাইলেন; দেখিলেন, তন্নজী-বর্ণিত অশ্বই বটে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই অশ্বরক্ষক! তোমার নাম কি?

রক্ষক। জানকীনাথ।

শিবজী। কোথায় যাইবে?

রক্ষক। মথুরা।

শিবজী বলিলেন, "হাঁ, এই অশ্ব বটে।"

শিবজী অশ্বে আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে পল্লী বা প্রান্তর দিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট্ মিট্ করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণকলেবরা যমুনা প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ-ঘাট কর্দ্দম বা জলপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণ-হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বৃক্ষ বা কুটীর নাই, অগত্যা পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিন জন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী-অভিমুখে আসিতেছেন, তাঁহাদিগের কোষে অসি। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা সেই দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয় উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে যায়?"

শিবজী। গোস্বামী।

অশ্বারোহী। কোথা হইতে আসিতেছ?

শিবজী। দিল্লীনগরী হইতে।

অশ্বারোহী। আমরা দিল্লীনগরীতে যাইব, কিন্তু পথ হারাইয়াছি. আমাদের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দেও, পরে তুমি মথুরায় যাইও।

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা বলপ্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে; কেন না, দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে, শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ্! ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অস্পষ্টস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ?

একজন বলিল, "স্বর আমি জানি, আমি দক্ষিণদেশে সায়েস্তা খাঁর অধীনে অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পথিক গোস্বামী নহে।"

অপরজন বলিল, "তবে কে?

প্রথম। আমি সন্দেহ করি, এ স্বয়ং শিবজী। দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।

দ্বিতীয়। তুই মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।

প্রথম। সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে, শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনা ধ্বংশ করিয়া গিয়াছিল।

• দ্বিতীয়। ভাল, মস্তকের বস্ত্র তুলিয়া দেখিলেই সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে।

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, শিবজী তাঁহাকে চিনিলেন, তিনি সায়েস্তা খাঁর অধীন একজন প্রধান সেনানী।

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত, শিবজী একাকী তিন জনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মুষ্টিআঘাতে অচেতন করিলেন; এমন সময় আর দুইজন অসিহস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, আবার বন্দী হইলেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরংজীব কর্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শত্রুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু জলে আপ্লুত হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল। শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিন জন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিন জনই গতজীবন!

শিবজী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই অশ্বরক্ষক জানকীনাথ তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। বিস্মিত হইয়া জানকীনাথকে নিকটে ডাকিয়া জীবন-রক্ষার জন্য শত ধন্যবাদ দিতে

লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে শিবজী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী!

তখন সহস্রবার গোস্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "সীতাপতি! আপনি ভিন্ন শিবজীর বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে? আপনাকে অশ্বরক্ষক মনে করিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার এ কার্য্যের জন্য আমি কি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি?"

সীতাপতি শিবজীর সম্মুখে জানু গাড়িয়া করযোড়ে বলিলেন, "রাজন্! ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবিলদার! জ্ঞান হইয়া অবধি আপনার সেবা করিয়াছি; আজীবন-কাল আপনার সেবা করিব, ইহা ভিন্ন অন্য কামনা নাই, অন্য পুরস্কার চাহি না। প্রভুর কাছে যদি না জানিয়া কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, প্রভু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দোষ ক্ষমা করুন।"

শিবজী চকিত হইয়া সেই বালক রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, সজল নয়নে রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট শিবজী শত অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মহৎ আচরণে আমাকে যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছ। তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তোমার অবমাননা করিয়াছিলাম, স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শিবজী যতদিন জীবিত থাকিবে, তোমার গুণ বিস্মৃত হইবে না, প্রণয় ও যত্নে যদি সে মহৎ ঋণ পরিশোধ করা যায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবে।"

শান্ত নিস্তব্ধ রজনীতে উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গনসুখে বিমুগ্ধ হইলেন। রঘুনাথের ব্রত অদ্য শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অদ্য দূর হইল, বালকের ন্যায় উভয়ে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

(৺রমেশচন্দ্র দত্ত)

মধুস্মৃতি।

মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া, আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্‌কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্ত-প্রায় হইয়াছে।

রামচন্দ্র মিত্র-নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যে দিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্রবাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজী-ওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র বাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই, পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল, কিন্তু, ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ্ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী আসিলাম। কাপড় চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না; একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ঐ গোলাধ্যায় পুথি খানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি?" আমি সে স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—"করতল-কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং"। বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে

ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন; এই দেখুন, তিনি বরং এই শ্লোকটিও আমাকে পুথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্র বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা তোমার বাবা বলিবেন বৈ কি; তবে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।" রামচন্দ্র বাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপে আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কাল হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল; দেখিতে অতি বুদ্ধিমান্ ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটীর পর একেবারে সে আমার নিকটে আসিয়া 'সেক্‌হ্যাণ্ড' করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার নাম কি, কোথায় বাড়ী তোমার," ইত্যাদি। আমি তাহার এইরূপ অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ এবং সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া, একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিলাম।

ইনিই মধু। এই দিন হইতেই ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই উভয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই যত্ন করিতেন। আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন; গায়ে মাথায় ধূলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই

হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মধু আমাদের বাড়ী আসিত, কিন্তু আমি কোনদিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই; মধু আমায় তজ্জন্য কোনদিন অনুরোধও করে নাই। বোধ হয়, আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসাবাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এই জন্যই সম্ভবতঃ, মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোনদিন করে নাই। ক্লাসে মধু ও আমি এক সঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সে খানি আমায় না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফলকথা উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা উভয়ে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলে ১৬ মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক ৫৲ হিসাবে বেতন ধরিয়া ১৬ মাসে ৮০৲ টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫৲ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দুকলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না; অগত্যা আমার হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নাকি হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ করিবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ; ৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।" এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে? আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।" ঐ বৎসর ৫ম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলাম, সুতরাং অল্পদিন মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায়, আমাকে মধুর

অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু এ কথা বলিয়া রাখি যে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা নহে; আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।

পঞ্চম শ্রেণীতে জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া আমি, মধু ও আমাদের আর কয়েকজন সমপাঠী আমরা একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। মধুর সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য পূর্ব্বের ন্যায় তখনও অক্ষুণ্ণ। ইংরাজী কবিতা মধু যাহা লিখিত বা নূতন পড়িত, আমাকে জেদ করিয়া শুনাইত, কিন্তু আচার ব্যবহারের বিষয়ে আমার সহিত তাহার কোন কথাবার্ত্তা হইত না। সে সকল বিষয় আমার নিকটে সযত্নেই গোপনে রাখিত। কখন কথা উঠিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এক দিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়াছি। ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।" মধু সে দিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল—সম্মুখের চুল গুলা বড়, ঘাড়ের চুল গুলা ছোট। আমি বলিলাম, "এ কি করিয়াছ! তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি এক জন জিনিয়াস্ (genious); জিনিয়াস যারা, তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচ-চূড়া, কি সাত-চূড়া, কি নচূড়া চুল কাটিয়া আস্‌তে, তা হ'লে, যা হোক্ একটা নূতন রকম কিছু হ'তো; তা না ক'রে ফিরিঙ্গীর মতন চুল কেটে এসেছ! এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটা ভাল নয়।" আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সে দিন আর আমার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল না, একটু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। মনে হইল, কথাটা বলা ভাল হয় নাই, মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম। তাহার পরদিন মধু আর

কলেজে আসিল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, মধু খৃষ্টান্ হইতে গিয়াছে; শুনিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। মধু যে দিন খৃষ্টান্ হইল, সে দিন আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তাহার পর মধু স্মিথ্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছু দিন থাকিয়া বিসপ্স্ কলেজে গমন করে। তখনও আমি মধুকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। মধুও আমার সহিত বন্ধুভাবে সম্ভাষণাদি করিয়াছে,কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সে মুখের ভাব,সে চক্ষুর জ্যোতিঃ কোথায়? মধুর পূর্ব্ব আকারের এখন অনেকটা বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

বিসপ্স্ কলেজে কিছুকাল থাকিয়া মধু মাদ্রাজ যাত্রা করে। সেখানে যাইয়া আমাকে একখানি পত্র লেখে। পত্রখানির মধ্যে আমার মার কথার উল্লেখ করিয়া মধু লিখিয়াছিল, "আমার প্রণীত ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী"-নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।" বাস্তবিকই আমার মা অতিশয় গুণবতী ও সুন্দরী ছিলেন। যে সৌন্দর্য্যে প্রকৃত মাতৃভাব ব্যক্ত হয়, সেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিই তাঁহার ছিল।

কিছুদিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। ঐ সময়ে নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় ঐ পদে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য, একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়; মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দি এবং উক্ত পদ আমারই হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা বলি, পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে। মধু ও আমি যতবার এক সঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি, প্রায় সকল বারই আমি উহার উপর হইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদিগের মধ্যে অতুল্য ছিল বলিয়াই আমি জানিতাম।

নর্ম্ম্যাল স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাঙ্গালা ভাষায়

তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে 'পৃথিবী' লিখিতে 'প্রথিবী' লিখিত; কিন্তু সেই মধু কিছুকাল পরেই, আমার নর্ম্যাল স্কুলে থাকাব সময়েই, মেঘনাদবধ কাব্য প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত সেই মেঘনাদবধ কাব্য, অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া, আমিই নর্ম্মাল স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি।

মধু আপনার বিদ্যাবুদ্ধি খুবই বেশী মনে করিত। এমন কি, সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বলিত, "তোমরা আমার জীবন চরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবি অপেক্ষা বড় কবি হইব।" আমি মধুর এই কথায় হাস্য করিতাম, কিন্তু সে যে একজন অতি প্রতিভাসম্পন্ন যুবা, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন ২০ লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুব ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখনও দেখিতে পাই নাই।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত চুঁচড়ার বাটীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্ব্বের মত চেহারা ছিল না। চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল না, পূর্ব্বের সেই অতি সুমিষ্টস্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, ঠোঁট পুরু এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোষাক সাহেবী, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তার পর কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত হওয়ায় মধু কাপড় চাহিল, বলিল, "আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব।" ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।

ইহার কিছুদিন পরে মধু "হেক্‌টর বধ কাব্য" রচনা করে এবং আমাকে কোন কথা না জানাইয়া, পুস্তকখানি আমারই নামে উৎসর্গ করে। অনেক দিন পরস্পরের সংস্রব রহিত থাকিলেও, আমার প্রতি

মধুর বরাবরই যে একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল, উল্লিখিত উৎসর্গ ব্যাপার তাহারই প্রমাণস্বরূপ বই আর কি!

(৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

সন্তানের শিক্ষা।

কথায় বলে ছেলেকে মানুষ করিতে হয়। আমার বোধ হয়, ঐ কাজটি কোন পিতা মাতার সাধ্যায়ত্ত নয়, এবং কেহ তজ্জন্য চেষ্টাও করেন না। ইংরেজ আপনার ছেলেকে ইংরেজ করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাহাই করিতে পারেন। চীনীয় আপন সন্তানকে চীনীয় করিবার নিমিত্তই যত্ন করেন, এবং তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা আপনার জাতির বিশেষ ধর্ম্ম এবং গুণের দ্বারাই স্বীয় বংশধরদিগকে বিভূষিত করিতে চাহেন—কেহই মনুষ্য-সাধারণধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তানের পালন এবং শিক্ষা সম্পাদন করেন না। তবে যে সাধারণ মনুষ্য-ধর্ম্মগুলি সকল জাতিতেই বিদ্যমান আছে, জাত্যনু-যায়িনী শিক্ষা প্রদান করিতে করিতে সেই সকল ধর্ম্ম সর্ব্বজাতীয় মনুষ্য-শিশুরই শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব সকল দেশেরই শিক্ষাপ্রণালী মনুষ্য-সাধারণ-ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, জাতীয়ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্যেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলকথা তাহাই হইতে পারে, এবং তাহাই হওয়া উচিত।

তাহাই হইতে পারে—এইজন্য যে, মনুষ্যমাত্রেরই মন পূর্ব্বপুরুষদিগের সংস্কার এবং আপনাদিগের প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার সমস্তের সমবায়ে সংগঠিত হয়; সংস্কার, স্বজাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে আইসে। এই

জন্য জাতীয় ভাব পরিহার করা মানব-মনের অসাধ্য। বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যেমন উড্ডয়ন হয় না—জল ছাড়িয়া যেমন সন্তরণ সম্ভবে না—ত্বক্‌সীমার বহির্ভাগে যেমন স্পর্শজ্ঞান হইতে পারে না—তেমনই জাতীয়ভাব-পরিশূন্য হইয়া কোন ব্যাপারের অনুষ্ঠানও মনুষ্য-কর্তৃক সাধিত হইতে পারে না।

তদ্ভিন্ন, সমাজের হিতাহিত লইয়াই সমাজান্তর্গত মনুজগণের হিতাহিত। সকল সময়ে, সকল দেশে, সকল অবস্থায়, সকল সমাজের হিতাহিত এক নয়। বর্ব্বর, অর্দ্ধসভ্য, পূর্ণসভ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের হিতাহিত অনেক অংশেই পরস্পর বিভিন্ন। বিজিত এবং বিজেতা দুর্ব্বল এবং সবল, দৃঢ় এবং শিথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের হিতাহিতও এক নয়। অভ্যুদয়োন্মুখ এবং পতন-প্রবণ জাতির হিতাহিতও এক নয়। সুতরাং সমাজের অবস্থাভেদে সমাজের প্রয়োজন বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে, এবং সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানও কাজেই ভিন্নরূপ হওয়া আবশ্যক।

সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। আমরা বাঙ্গালী—আমাদিগের সমাজ যে ভাবাপন্ন তাহাতে আমাদিগের প্রয়োজন কি?—এইটি সুপরিস্ফুটরূপে অবধারিত করিয়া আমাদিগের পরবর্ত্তী পুরুষেরা যাহাতে ঐ সকল প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করিয়া দেওয়াই আমাদিগের প্রকৃত শিক্ষাদান। মনুষ্যত্ব-সাধন মস্ত কথা। মনুষ্যত্ব যে কি, এবং উহা যে কি নয়, বা কি হইতে পারে না, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই স্পষ্টরূপে বুঝিতে এবং বলিতে পারেন নাই। অতএব কিরূপ হইলে ছেলেটি প্রকৃত মনুষ্য হইবে, তাহা না ভাবিতে গিয়া, কিরূপ হইলে

ছেলেটি সমাজের অভাবমোচনে সাহায্য করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। আমি তাদৃশ চিন্তাসম্ভূত কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

(১) স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীর শরীর দুর্ব্বল। অতএব ছেলের শরীর সবল করার নিমিত্ত যত্ন করা আমাদিগের আবশ্যক। শৈশবাবধি ব্যায়ামচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া দেওয়া পিতামাতার কার্য্য।

(২) বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয়গ্রাম যদিও স্বভাবতঃ কোন জাতীয় লোকের অপেক্ষা হীনতেজ নয়—তথাপি শিক্ষার অভাবে ইন্দ্রিয়গণ বহুস্থলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধিতে অক্ষম হইয়া থাকে। দর্শনাদি দ্বারা দূরতা, নৈকট্য, সংখ্যা, ভার প্রভৃতির অববোধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রায়ই ঠিক হয় না। অতএব বাল্যাবধি ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা পিতামাতার কার্য্য।

(৩) বাঙ্গালীর স্মৃতিশক্তি অতীব প্রখরা। যাঁহারা বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, তাঁহারাও ঐ কথা স্বীকার করেন; কিন্তু বলেন, ইহাদের ধী-শক্তি এবং উদ্ভাবনীশক্তি তেমন অধিক নয়। নিন্দকদিগের সহিত বিচারে প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, স্মৃতি একটি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি নহে; মনোবৃত্তিমাত্রেরই কারণশক্তির নাম স্মৃতি,—অর্থাৎ স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সকল মনোবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়। সুতরাং স্মৃতিকে প্রখরা বলিলে মনোবৃত্তি মাত্রেই তেজস্বিনী বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি তেজস্বিনী বলিয়াই শিক্ষার একটি দোষ জন্মে। ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট না হইলেও বাঙ্গালীর মন সেগুলি গ্রহণ করিয়া রাখে—একেবারে পরিত্যাগ করে না, তাহাতে কার্য্যকালে ক্ষতি হয়, এবং কৃতিসামর্থ্যও ন্যূন হইয়া পড়ে। এই জন্য শিখিবার সময় যাহাতে বালকের ভাব সমস্ত পরিস্ফুট হয়, তজ্জন্য কি শিক্ষক, কি পিতামাতা, সকলেরই যত্ন করা বিধেয়।

(৪) অন্যান্য মনোবৃত্তি যেমন প্রবলা, বাঙ্গালীর দূরদর্শিতা এবং কল্পনাশক্তিও তদনুরূপ। তদ্ভিন্ন, শরীরের দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন বাঙ্গালী ভীরুস্বভাব। এই দুই এবং অন্যান্য কারণে বাঙ্গালীর ছেলের অনৃত-বাদিতা দোষ জন্মিতে পারে। যাহাতে তাদৃশ দোষ না জন্মে, তজ্জন্য পিতামাতার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দূরদর্শিতা বর্দ্ধিত করিয়াই অনৃতবাদিতার শাসন করা বিধেয়। সত্যই টেকে, মিথ্যা কখনই টেকে না, এই তথ্যটি সর্ব্বদা সন্তানের মনে জাগরূক রাখা আবশ্যক।

(৫) বাঙ্গালী ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যাইতেছে। অতএব আশার বৈফল্যবশতঃ সন্তানের ভবিষ্যতে যতই ক্লেশ হউক, পিতা-মাতার কর্ত্তব্য তাহাকে উচ্চাশয়সম্পন্ন করেন। বাঙ্গালীর মনে উচ্চ আশার উদ্রেক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। 'দুবেলা দুমুঠা খেতে পেলেই হইল', এবম্বিধ বাক্য সন্তানের কর্ণগোচর হইতে দিতে নাই।

(৬) বঙ্গদেশের বায়ু সজল এবং উষ্ণ; বাঙ্গালীর শরীরও দুর্ব্বল; বাঙ্গালী সহজেই শ্রমবিমুখ। অতএব সন্তান যাহাতে শ্রমশীল হয়, তজ্জন্য পিতা-মাতাকে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সকল বাঙ্গালী শ্রমশীল তাঁহাদিগেরও পরিশ্রম দোষশূন্য নয়; একবার খুব হয়, আবার কিছুই থাকে না। এইরূপ অনিয়মে শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলেকে ওরূপ করিতে দিতে নাই। যেরূপ পরিশ্রম সহ্য হয়, সেইরূপ নিয়মিত পরিশ্রম অভ্যাস করাইতে হইবে।

(৭) এক্ষণকার বাঙ্গালী নিস্তেজ। নিস্তেজ হইয়া পড়িলেই পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষ্যা করিয়া থাকে; ঈর্ষ্যা দোষটি সত্বর যাইবার নয়; তবে উহার বাগ ফিরাইতে পারা যায়। অতএব ঐ ঈর্ষ্যা যাহাতে প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, তাহাই চেষ্টা করা আবশ্যক।

(৮) (বাঙ্গালীর স্বভাবে অনুচিকীর্ষাবৃত্তি অযথারূপে প্রবল হইয়া

উঠিয়াছে। অনুকরণ উৎকর্ষসাধনের একটি প্রধানতম পথ, সন্দেহ নাই। কিন্তু অযথা অনুকরণে একপ্রকার আত্মহত্যার সংঘটন হয়। বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে আত্মগৌরব সম্বর্দ্ধিত করিবার উপায় করা আবশ্যক। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিস্মরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই হেতু বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করাইবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়। যখন ছেলে ইংরেজী পড়িবে, তখন ইংরেজী গ্রন্থে কোন উৎকৃষ্ট ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, তাহার অনুরূপ অথবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর ভাব যে সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

(৯) বাঙ্গালীর সহানুভূতি নিজ-সমাজের মধ্যে তেমন অধিক হয় না। বাঙ্গালী আর বাঙ্গালীর প্রশংসায় যথোচিত পরিতৃপ্ত অথবা বাঙ্গালীর তিরস্কারে তাদৃশ ক্লিষ্ট হইতেছে না। এটি সাংঘাতিক দোষ। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তবে বোধ হয়, ছেলেকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় কিয়ৎপরিমাণে প্রবর্ত্তিত করা অর্থাৎ কিছু কিছু বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া এবং যাহাদিগের লিখিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাদিগকে বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতে দেওয়া ভাল।

(১০) দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্র জাতি, আমাদিগের সুখোপভোগচেষ্টা ভাল নয়। গান-বাজনা, আমোদপ্রমোদ, বিজয়ী ধনশালী প্রবলপ্রতাপ ইংরেজদিগের সাজে; আমাদিগের মধ্যে গান-তামাসা নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোন মতেই শোভা পায় না। অতএব সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান্, তাঁহারও কর্ত্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখা। সমাজের যে অবস্থা, তাহার

অনুরূপ ব্যবহারই সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে. সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক।

বশ্যতা ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না। একটি গল্প বলি। একখানি জাহাজে এক জন অনভিজ্ঞ নূতন কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দুই চারি জন লোক তাঁহার অধীনে ছিল। এক দিন কাপ্তেন জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাতে আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটি মগ্ন শিলায় আহত হইয়া বিনষ্ট হইবে।" অপর এক জন বলিল,—"তবে একথা কাপ্তেনকে বল না কেন ?" সে উত্তর করিল—"সে কি! কাপ্তেন আপনার কর্ম্ম করিতেছেন—তাঁহার কথা শুনা মাত্র আমাদের কাজ, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে গায়েপড়া হইয়া কি তাঁহাকে কিছু বলিতে আছে ?" কেহ কিছু বলিল না। জাহাজ বিনষ্ট হইল। এরূপ বশ্যতা পাগলামী বটে—কিন্তু হিন্দুদিগের উন্নতিকালেও ঐরূপ পাগলামী ছিল; রামায়ণ ও মহাভারতপাঠীদিগের তাহা অবিদিত নাই। যে দিন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ঐরূপ পাগলামী জন্মিবে, সে দিন বাঙ্গালীর শুভদিন।

বহুকাল হইতে বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি। এই জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বশ্যতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বলবানের নিকট দুর্ব্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা, তাহাকে বশ্যতা বলা যায় না। বাঙ্গালী প্রায়ই বাঙ্গালীর বশ থাকিতে চায় না; অন্য জাতীয়ের বশ হয়। বশ্যতা ভক্তিমূলক—ভক্তি শৈশবে শিক্ষণীয়, এবং পিতা-মাতাই প্রথম হইতে ভক্তির আস্পদ হইয়া ঐ ভাবটিকে অঙ্কুরিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিতে পারেন। (৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

প্রকৃতি-বিষয়ে অধ্যয়ন।

ছোট বড় সকলেই সর্ব্বদা প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতেছে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকলেই করিবে। নেত্রাদি বহিরিন্দ্রিয় কাহারও নিষ্ক্রিয় নহে; সুতরাং জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, বুঝিয়া হউক, আর না বুঝিয়া হউক, প্রকৃতি অধ্যয়ন সংসারে প্রতিনিয়ত চলিতেছে।

কালে কালে মনুষ্যের মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, গ্রন্থ অধ্যয়নের লিপ্সাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনকার লোকের গভীর চিন্তায় আস্থা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। প্রাচীন মনীষিগণের দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিতে পারিলে, কেহই এখন নূতন কথায় নূতন মতে বিশ্বাস করিতে চায় না। এই জন্য দিনে দিনে গ্রন্থের সম্মান বাড়িয়া চলিয়াছে; আর আমরা নিত্য-বিরাজমানা জীবিতা প্রকৃতিকে ভাল করিয়া দেখি না। আমরা এখন সৌভাগ্যদায়িনী প্রকৃতিদেবীকে ভুলিয়া গিয়া সুদূরবর্ত্তী সময়ের মৃত গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মৃত গ্রন্থাবলীর অনুশীলনে অনুরক্ত হইয়াছি।

আজ সংসারে যেখানে যে কোন শাস্ত্র অধীত হইতেছে, সে সমস্ত কি ঈশ্বর আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন? তাহা কি মনুষ্য কর্ত্তৃক লিখিত এবং সংগৃহীত নহে? মনোবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল, খগোল, গণিত, সঙ্গীত, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ভাষাবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহাই কি মানবের প্রকৃতি অধ্যয়নের ফল নহে? মনুষ্য সমস্ত বিদ্যা লইয়া সংসারে আইসে নাই; কত যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া উপরিলিখিত এক একটী বিষয়ের অনুশীলন করা হইয়াছে। কত প্রতিভাশালী মহাপুরুষ

আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াছেন, আজিও উহার কোন একটি শাস্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। যেমন সহস্র সহস্র স্রোতস্বতী অনবরত এক মহাসাগরে বারিরাশি ঢালিতেছে, কিন্তু মহার্ণব পূর্ণ হইতেছে না, কখনও পূর্ণ হইবে না, তেমনই শত শত যুগের মস্তিষ্ক-নিঃসৃত জ্ঞানরাশি এক এক শাস্ত্রে ঢালা হইতেছে, অথচ সে মহাসমুদ্র পূর্ণ হইতেছে না। আজ যে মত অভ্রান্ত, কাল তাহার ভ্রম বাহির হইতেছে। অন্ধকারময়ী রজনীতে দিগ্‌ভ্রান্ত মানবের দিঙ্‌নির্ণয়ার্থ অনন্ত প্রকৃতি ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় বিরাজমানা; অন্ধকারে ভীত না হইয়া, সুদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণের বিলীনপ্রায় পদচিহ্নের অনুসরণ না করিয়া যে ঐ নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখে, এবং সাহসের সহিত আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইতে জানে, সে কখনও বিপথগামী হয় না; অবশ্যই নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারে। সেই সাহসী পুরুষই প্রকৃত মানব এবং প্রকৃত অধ্যয়নশীল।

ইউরোপে যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রকৃতির পরিদর্শন ও অনুশীলনের ফল। আবিষ্কর্ত্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ লেখা পড়াও জানিতেন না; তাঁহারা পুস্তক অধ্যয়ন দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞানের সাহায্যও প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের আবিষ্কারে ইউরোপ এবং আমেরিকা অনেক বিষয়ে অসাধ্য সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে। প্রকৃতি পাঠ করিতে হইলে, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা প্রধান সহায়। কেহ তাহার সাহায্যে পাঠ সমাপ্ত করিতেছে; কেহ আবার এখনকার ছাত্রদিগের পরীক্ষার্থ নির্দ্ধারিত সাহিত্যের অর্থপুস্তকের ন্যায় পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞানভাণ্ডারস্বরূপ গ্রন্থাবলীর সাহায্যও গ্রহণ করিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্রের মূলসত্য উদ্ভাবন দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতার আজ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে! বারুদ প্রস্তুত করিবার উপায় ও বারুদের

ব্যবহার শিক্ষা দিয়া চীনদেশীয়গণ সমরশাস্ত্রে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে! দিগদর্শন, তাড়িত-বার্ত্তাবহ, তাড়িতের শক্তি, মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা, সূতার কল, কাপড়ের কল, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, দূরশ্রবণ যন্ত্র ও শব্দাধারক যন্ত্র, যাহাই ভাবিয়া দেখ, চারিদিকে কেবল প্রকৃতির পর্য্যালোচনা ও প্রাকৃতিক কার্য্যের পরীক্ষার ফল দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবে।

দুই ব্যক্তি একসঙ্গে এক পথে চলিয়া যাইতেছে। একজন নিতান্ত উন্মনা;—হয়ত কোন বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছে, অথবা কথোপকথনে ব্যাপৃত আছে। তাহার চক্ষুর সমক্ষে কোন বস্তু বা ব্যক্তি যে উপস্থিত ছিল, সে তাহা একবার লক্ষ্যও করে নাই। আবার আর এক ব্যক্তির দৃষ্টি বাহ্যজগতে। সে পথের দুই পার্শ্বে যেখানে যে বৃক্ষলতা আছে, তাহা দেখিয়াছে, কোথায় কাহার বাসগৃহ, তাহার নির্ণয় করিয়াছে;—সে মুখে আলাপ করিলেও তাহার চক্ষু চক্ষুর কার্য্য এবং কর্ণ কর্ণের কার্য্য করিয়াছে। দূরে গেলে উভয়ের প্রতি এই পর্য্যবেক্ষণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অবাক্ হইবে, কিছুই বলিতে পারিবে না; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি সমস্ত কথা যথাযথ বলিয়া দিবে। এ দুইজনের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, গ্রন্থবদ্ধদৃষ্টি বাহ্যজগতে অন্ধ ছাত্র আর প্রকৃতির ছাত্রের মধ্যেও তাদৃশ পার্থক্য রহিয়াছে। অন্ধ যেমন অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াও বৃক্ষ দেখিতে পায় না, চন্দ্রনক্ষত্রমণ্ডিত আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি নক্ষত্র বা চন্দ্রের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণে অনাসক্ত পুস্তকে বদ্ধদৃষ্টি ছাত্রাবমও তেমনই প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনেক পরিমাণে অনভিজ্ঞ থাকে।

আমারা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনুষ্যই জগতের সর্ব্বপ্রধান

সৃষ্টি. প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহাকেই পাঠ করিবে। যেমন সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তেমনই মনুষ্যের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ। মানব-মন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যয়নের বিষয়। যদি একবার মনুষ্যের মন অতি সাবধানে অধ্যয়ন করিতে পার, শুদ্ধ অধ্যয়ন নহে, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পার, তাহা হইলে, তোমার জানিবার অনেক বিষয় অতি সহজে তোমার জানা হইল ;—কারণ মানবমন জগতের অনুকৃতি-মাত্র। মানবমনের ইতিহাস মনোবিজ্ঞান ; মানসিক গুণনিচয়ের ইতিহাস নীতিশাস্ত্র। মানবমনের ভাবপ্রকাশ ভাষা-বিজ্ঞান; গণনানিচয় গণিতবিজ্ঞান ; তাহার কার্য্যকলাপ ইতিহাস। মানবমন অনন্ত রত্নের আকর। তাহার প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক কথা শত শত জীবিতগ্রন্থ। সে সজীব গ্রন্থ উপেক্ষা করিয়া অন্ধ মানব নির্জীব গ্রন্থনিচয় কীটের ন্যায় উদরসাৎ করিতেছে ; অথচ তাহার কোন্ অংশে কি আছে, তাহাও বাছিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না !

মানবদেহও সামান্য শিক্ষার বিষয় নহে। চিকিৎসা শাস্ত্রের সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ইহাতে নিহিত। যাহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রণেতা, তাঁহারা যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া মানবের মৃত দেহ, জীবিত দেহ পরীক্ষা করিয়াছেন। এক জাতির পর অন্য জাতি, এক বংশের পর অন্য বংশ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষার বিরাম হয় নাই। আজও পরীক্ষা চলিতেছে, আরও কোটি-কল্প ব্যাপিয়া চলিবে ; চিকিৎসাশাস্ত্র যে কখন অভ্রান্ত ও পূর্ণায়ত হইবে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। প্রকৃতি-গ্রন্থ এমনই অনন্ত যে, ইহা কখনও সমাপ্ত করা যাইতে পারে না।

মনুষ্যের গঠন-বৈচিত্র্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য, মানসিক বৈচিত্র্য, আবার সেই বৈষম্যেও এক অভাবনীয় সাদৃশ্য—এ সকল সামান্য অনুশীলনের বিষয় নহে। ক্ষুদ্র মানবজীবন অদ্যাপি তাহার একটিরও অনুশীলন সুসম্পন্ন করিতে পারে নাই।

প্রাণি-জগতে প্রাণী অসংখ্য। জলে তিমি, স্থলে হস্তী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত কোটি কোটি প্রাণী বর্ত্তমান আছে। ইহাদের সমস্তগুলির পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা এবং তাহাদের গুণ শিক্ষা করা বহুদূরের কথা, এক জীবনে সহস্রাংশের একাংশও হয় না। যখন কত প্রকার প্রাণী আছে, আজ পর্য্যন্ত তাহাই নির্ণীত হইতে পারে নাই, তখন ঐ সকল প্রাণীর শারীর-ধর্ম্ম কিরূপ, কাহার কি গুণ, তাহা অবধারণ করা কাহার সাধ্য?

সমুদ্র জলরাশি। জলের সাধারণ গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহার বাহিরে যে তরঙ্গ, ফেনা, বুদ্‌বুদ্‌, স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়, আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, কেবল তাহাই সমুদ্রের ধর্ম্ম। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, শত শত নদী অহোরাত্র সুমিষ্ট বারিরাশি ঢালিতেছে, কিন্তু তাহাতেও সে লবণত্ব দূর হয় না, কমে না। পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ মাত্র স্থল। স্থলভাগ আমরা সহজে দেখিতে পারি। অথচ তাহাতে কতরূপ প্রাণী আছে, এ পর্য্যন্ত তাহাই নির্ণীত হইল না। অন্য প্রাণী দূরে থাকুক, কত প্রকার মনুষ্য আছে, আমরা তাহাও ঠিক জানি না। সে দিন একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মধ্য আফ্রিকায় একজাতীয় মনুষ্য দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাদের পূর্ণায়ত পুরুষের শরীর দৈর্ঘ্যে তিন ফুট অর্থাৎ এক গজের অধিক নহে! আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমার মধ্যস্থ অধিষ্ঠান-ভূমিভাগেই যখন এত অজ্ঞতা, তখন সমুদ্র মধ্যে কোথায় কি আছে, তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? সহস্র সহস্র জীবন এই সমুদয়ের অনুশীলনার্থ অতিবাহিত হইয়াছে; আরও সহস্র সহস্র জীবন এইরূপে অতিবাহিত হইবে। সেই অনুশীলনের ফলে জগতের কত উন্নতি সাধিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি মনুষ্যগণ অনুসন্ধান না করিত, তাহা হইলে, সমুদ্রগর্ভের বহুমূল্য মুক্তা, সুন্দর প্রস্তর, প্রবাল

প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু কখনও আমাদের জ্ঞানগোচর হইত না। কে জানে, সমুদ্রগর্ভের কোন্ অংশে কোন্ মহাবস্তু লুক্কায়িত আছে! এখন সমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা নির্ণীত হইয়াছে। কোন স্থলে জলের নীচে গুপ্ত পর্ব্বত, কোনস্থলে চুম্বকের আকর, কোন স্থলে প্রবাল বা স্পঞ্জের বৃক্ষাকার ও স্তূপাকার অবস্থান দেখা যায়। কোন কোন স্থলে জলের গভীরতা আজও নির্ণীত হয় নাই। সে সমস্ত স্থানে জাহাজ লইয়া গমনাগমন বিপজ্জনক; সুতরাং বাণিজ্যব্যবসায়িগণ এবং নাবিকগণ জলপথের চিহ্ন করিয়া লইয়াছে। এইরূপে ক্রমে অনুসন্ধান ও অনুশীলনের বলে মানব অপরিজ্ঞাত সমুদ্র সম্বন্ধেও বিস্তর অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে।

উদ্ভিজ্জ জগতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। সৃষ্টির এই অংশ প্রাণিজগৎ অপেক্ষাও বিস্তৃত। উদ্ভিজ্জ প্রাণিজগতের খাদ্য, ঔষধ, ব্যবহার-সামগ্রী ও বিলাস-সামগ্রী। দীর্ঘকালের পরীক্ষা দ্বারা কতকগুলি উদ্ভিজ্জ সুখাদ্য ও শরীর-পোষকরূপে ব্যবহৃত, অন্যগুলি অখাদ্য ও শরীর-নাশকরূপে পরিত্যক্ত হইতেছে। কালে কালে নূতন নূতন শাকসব্জি, নূতন নূতন ফলমূলাদি নূতন নূতন প্রণালীতে খাদ্য বস্তুর তালিকাভুক্ত হইতেছে;—কোন্‌টি উপকারী, কোন্‌টি অপকারী, তাহাও নির্ণীত হইতেছে। সংসারে যত প্রকার রোগ আছে, তাহার ঔষধ উদ্ভিজ্জ-জগতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনুষ্য পরীক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলে, সে সমস্ত রোগের ভীষণত্ব আর থাকিবে না। পূর্ব্বে বসন্ত-রোগে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি রক্ষা পাইত, এখন অতি অল্পসংখ্যক মরে; চিকিৎসা-শাস্ত্র আরও উন্নত হইলে, ঐ সকল রোগের ভীষণত্ব আরও কমিবে। প্রকৃতির এমনই অব্যর্থ নিয়ম যে, যেখানে আপনা হইতে বিষবৃক্ষ জন্মিয়াছে, তাহার নিকটেই আবার বিষঘ্ন বৃক্ষও রহিয়াছে। যে দেশে নূতন রোগ আছে, সেই দেশেই আবার তাহার নূতন ঔষধ আছে।

ওলাউঠা, লাল-জ্বর, কালা-জ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা শতবর্ষ পূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত ছিল, অথচ এ সমস্ত এক্ষণে পৃথিবীতে লোমহর্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। আবার প্রকৃতিও এমনই সতর্ক যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি বিস্তার করিয়া, সেই সমস্ত নূতন রোগের নূতন ঔষধ বিধান করিতেছেন। স্নেহময়ী জননী যেমন সুপ্তশিশুর শরীর মশকাদির দংশন হইতে রক্ষা-করণার্থ অনবরত অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করেন, শিশু তাহা বুঝিতেও পারে না, স্নেহময়ী প্রকৃতিদেবী তেমনই ভাবে সৃষ্টিরাজ্যে নিরাশ্রয় প্রাণি-সমুদয়কে রক্ষা করিতেছেন, তাহারা তাহা জানিতেও পারিতেছে না; সুতরাং আহার্য্য-নির্ণয়ে বা ঔষধ আবিষ্কারে, ব্যবহার্য্য বস্তুর নির্ম্মাণে বা বিলাস-সাধনে, যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, উদ্ভিজ্জ-জগৎ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা,—প্রকৃতি-গ্রন্থের অতীব প্রয়োজনীয় এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা,—মানব-জীবনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর। শূন্যমার্গেও প্রকৃতি তোমার শিক্ষাদাত্রী। উন্নত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র তোমার মনকে উন্নত ও শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত অনেক কথা বলিতে পারিবে। ঐ সমস্ত অত্যুন্নত অধ্যাপকগণ তোমার শতপুরুষ পূর্ব্বে শিক্ষাদান আরম্ভ করিয়াছেন, শতপুরুষ পরেও শিক্ষাদান করিবেন, তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার ফুরাইবে না। তাঁহাদের প্রকৃতি, গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে সুকঠিন জ্যোতিষশাস্ত্র গভীর চিন্তায় মগ্ন,—সহস্র যুগ চলিয়া গেল, আজও জ্যোতিষ পূর্ণাঙ্গ হইল না। প্রকৃতির এই উন্নত অংশ সামান্য শিক্ষার বিষয় নহে। এখানেও গভীর গবেষণার প্রয়োজন।

যত প্রকার কল-কৌশল মানবজ্ঞানের বিষয়ীভূত, সে সমস্তই প্রকৃতির পরিদর্শনের ফল। হয় তুমি নিজে করিয়াছ, না হয় তোমার পূর্ব্ব-

পুরুষেরা তাহা তোমার জন্য সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছেন। শিক্ষা প্রকৃতি-লব্ধ। চক্রদণ্ডাদি যন্ত্র-বলগুলি প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত। আজ মনুষ্য চেষ্টাতে শ্রম-লাঘবের অনেক কৌশল দেখিতেছি, অনেক সুখসেব্য বিলাসবস্তু লাভ করিতেছি,—প্রকৃতি কি সে সমস্তের মূলতত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দেন নাই? যে ব্যক্তি প্রকৃতি-পরিদর্শনে অন্ধ, সে ঘোর মূর্খ।

অতএব স্বাধীনভাবে ক্রমোন্নতি সাধন করিতে হইলে, কেবল পুস্তক লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; জীবনের প্রথম হইতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে হইবে। প্রকৃতির কঠিন তত্ত্ব সমস্ত মীমাংসা করিতে হইবে; তাহা হইলেই অন্বয়ী মুখে হউক, ব্যতিরেক মুখে হউক, স্থির উপপত্তিতে উপনীত হইতে পারিবে। পুস্তক কখনও বুদ্ধি দিতে পারে না, চিন্তাশক্তি দিতে পারে না, কিন্তু উভয়ের বিকাশপক্ষে সাহায্য করে। প্রকৃতি উভয়ই প্রদান করে।" গ্রন্থশিক্ষা প্রকৃতিশিক্ষার ধাত্রীস্বরূপ। তুমি প্রকৃতিশিক্ষা হইতে আপন মনের বস্ত্রালঙ্কার সংগ্রহ করিলে; গ্রন্থশিক্ষায় কেবল আপন মার্জ্জিত রুচি, অভিজ্ঞতা ও সভ্যতার গুণে সে গুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পার। অতএব যদি বড়লোক হইতে চাও, তবে শৈশব হইতে সাবধানে সৎপথে থাকিয়া প্রকৃতিরূপ মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন কর, তোমার আশা ও উদ্দেশ্য সফল হইবে, তুমি যশস্বী, স্মরণীয় এবং সভ্যসভ্যই একজন অতি প্রধান লোক হইতে পারিবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

(৺ব্রজনাথ বিশ্বাস)

মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ।

'সভ্য' শব্দের অর্থ বুঝা কঠিন। তবে, বোধ হয়, যাহারা সামাজিক-গুণে যত উন্নত, তাঁহাদিগকে তত সভ্য বলা যাইতে পারে। আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত মানুষ দেহে ও মনে যতই উন্নতি করিয়া থাকুক, সমাজ-বদ্ধ না হইলে, তাহার কিছুই হইত না। সমাজ-ধর্ম্ম মানুষকে উত্তরোত্তর সভ্য-পদবাচ্য করিয়া তুলিয়াছে এবং বিবিধ সদ্‌গুণে মণ্ডিত করিয়াছে। সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ কেবল ব্যক্তির সমষ্টি হইয়া পড়ে; তখন তাহার সকল উন্নতিই ফুরাইয়া যায়। যাহা হউক, এই শব্দের মোটামুটি অর্থ আমরা সকলেই বুঝি বলিয়াই বিশ্বাস করি। সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, ইহা কয়েকটি আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়াছে এবং উহাদিগের সহিত ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রথম আবিষ্কার বোধ হয়, ভাষা। ভাষা ব্যবহার করিতে না পারিলে, মানব কোন উন্নতিই করিতে পারিত না, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় উহা লিখিত হয় নাই, কথিত-ভাষা-রূপেই ব্যবহৃত হইত। মস্তিষ্ক পদার্থ মানবের বিশেষত্ব। এই উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়াতেই মানব ভাষার আবিষ্কার ও উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। মস্তিষ্কের উন্নতি ভাষার আবিষ্কারের ও ভাষার উন্নতির হেতু। আবার, ভাষার উন্নতি ও আলোচনার ফলে মস্তিষ্কের উন্নতি হইয়া থাকে। উহারা পরস্পর পরস্পরের উন্নতিবিধান করিয়াছে। এতদ্দ্বারা মানব-সভ্যতা একপুরুষে যেরূপ উন্নত হয়, পর পর বংশে সেই উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবার সেইরূপ সুযোগ হয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার অগ্নি। এই পদার্থের আবিষ্কারদ্বারা মানবীয় সভ্যতা কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। এতদ্দ্বারা শীতনিবারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সামান্য কথা। কিন্তু অগ্নি রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া ও বস্ত্রনির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াই প্রধানতঃ সভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়াছে। ইহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলা সঙ্গত বোধ করি যে, অগ্নি প্রথমতঃ রন্ধনকার্য্যেই ব্যবহৃত হইত; তাহার বহু পরে বস্ত্রনির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় আবিষ্কার, পাথরের অস্ত্র-নির্ম্মাণ। বোধ হয়, অস্ত্র নির্ম্মাণে পাথরই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রাচীন যুগের কোনও কোনও পর্ব্বত-গুহামধ্যে পাথরের অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। ছুরি, ভোজালি, বল্লম ইত্যাদি বহু অস্ত্র সে যুগে প্রস্তুত হইয়াছিল। পাথর দ্বারা এই সকল সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করা সভ্য মানবের অসাধ্য, অথবা দুঃসাধ্য। অসভ্যগণের চক্ষু ও হস্ত সভ্য মানবের অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। অস্ত্র প্রস্তুত করিতে না পারিলে ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র মানব জীব-জগতে আপন প্রভুত্ব কখনও প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইত না। অস্ত্রের উদ্ভাবন, নির্ম্মাণ ও ব্যবহারে পারদর্শী হইতে হইলে, ক্রমে বুদ্ধিবৃত্তির যে উৎকর্ষ হয়, ঐ সকল সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য বীরত্বের সহিত যেরূপ একতা, ধীরতা, ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও কৌশল আবশ্যক হয়, তাহার নিকট মানবীয় সভ্যতা অনেক পরিমাণে ঋণী।

চতুর্থ আবিষ্কার, লৌহ। ইহার প্রসাদে প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত নৌকা প্রস্তুত করিয়া মানব-পরিবার দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে; হলাদি প্রস্তুত করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে; নানাবিধ কল-কারখানা গঠিত করিয়া সভ্যতা-বিস্তার করিবার সুযোগ পাইয়াছে,

অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা ও শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ইহার বলে মানব আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছে ও হইতেছে।

পঞ্চম আবিষ্কার, কৃষি ও পরিচ্ছদ। যদিও চর্ম্ম এবং লতা-পত্র এই অবস্থার অনেক পূর্ব্ব হইতেই পরিচ্ছদ-স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে, কিন্তু তাহা অলঙ্কারের জন্য, শোভার নিমিত্ত। লজ্জা-নিবারণের জন্য পরিচ্ছদ প্রথমে ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কৃষিব আবিষ্কার মানবীয় সভ্যতার একটি প্রধান হেতু। সম্ভবতঃ, ইহা হইতে আর্য্যগণ স্বীয় গৌরবান্বিত নামের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কৌশল জ্ঞাত হইবার সময় হইতেই মানব একস্থানে স্থিরভাবে বসবাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বেদিয়াদিগের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শিকার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবার আর প্রয়োজন হয় নাই। কৃষির প্রয়োজনবশতঃই একস্থানে বাস করিতে হইয়াছে। ইহা হইতেই যথার্থ সমাজের উৎপত্তি। সমাজধর্ম্ম, যাহা মানবকে মানব-নামের প্রকৃত অধিকারী করিয়াছে, তাহাও ইহারই অন্যতম ফল। কৃষিজাত শস্যে উদর পূর্ণ হওয়াতে মানবের বহু অবসর লাভ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। নিয়ত ভ্রমণ ও শিকার করিতে হইলে তাহা সম্ভব হইত না। কৃষি হইতেই মানবের অবসর-কাল প্রাপ্তি; সুতরাং জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা-লাভ। এই সময় হইতেই মানব উত্তরোত্তর জ্ঞানোন্নত হইতে লাগিল। দেহের অভাব ছাড়িয়া মনের অভাব অনুভব করিল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সময় পাইল, এবং বিশ্বের সৌন্দর্য্যে ও শৃঙ্খলায় মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরচয়িতার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাই মানবত্ব ছাড়িয়া এখন হইতে দেবত্বে উন্নীত হইবার পথ আবিষ্কার করিবার প্রয়াসী হইল। কৃষির আবিষ্কারকে সভ্যতার এক প্রধান কারণ বিবেচনা করা যায়।

ষষ্ঠ আবিষ্কার, লেখা। মানব লিখিতে শিক্ষা করিয়া সময়কে জয় করিয়াছে। এক সময়ে যে সকল উন্নতি হইতেছে, তাহা তৎকালেও দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া জ্ঞানোন্নতি সাধিত হইতেছে; এবং পরবর্ত্তী কালে ও বহু সহস্র বৎসর অন্তেও মানব-সমাজের প্রভূত উপকার হইতেছে। লেখা প্রথমেই বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয় নাই। নানাবিধ দুর্ব্বোধ চিত্র, বক্র, অতি বক্র রেখা ইত্যাদির মধ্য দিয়া অক্ষর সকল বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই যে শেষ আকৃতি তাহাও বলা যায় না। প্রথম হইতে প্রস্তর, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষত্বক্, পশুচর্ম্ম ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থের উপর লেখা হইয়া আসিয়াছে; এক্ষণে কাগজ ব্যবহৃত হইতেছে। কথিত ভাষার আবিষ্কারের পরে সভ্যতার উন্নতিসাধন করিবার এত বড় প্রবল সহায় আর কিছুই হয় নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না।

ইহার পরের আবিষ্কার, বারুদ—সভ্যতার সহায়ক, এ কথা শুনিলে অনেকে কাণে হাত দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মারাত্মক যমদূতের অস্ত্রগুলিও সভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়াছে। সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন একদিকে হত্যাকার্য্য করিয়া পশুত্বের পরিচয় দেয়, তেমনই অন্যদিকে হতাবশিষ্টদিগের আহারসংগ্রহের ও বংশবৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দিয়া. মানবের অশেষ উপকার করে। পালন ও সংহার, পৃথক্ পদার্থ নহে, একের নিমিত্তই অন্য আবশ্যক; সুতরাং সপ্তম আবিষ্কার বারুদকেও সভ্যতা-বিস্তারের সহায় স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বারুদ আবিষ্কারের পর যুদ্ধবিগ্রহে হত্যাকার্য্যের বাহুল্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইতস্ততঃ করিতেছে। যখন মৃত্যুর আশঙ্কা অল্প, তখনই যুদ্ধও সহজেই বাধিয়া উঠে; এই আশঙ্কা অধিক থাকিলে, যুদ্ধ কম বাধিত;

সুতরাং মারাত্মক অস্ত্রাদি মোটের উপর মানবসমাজকে উন্নতই করিয়াছে। উহারা বিভিন্ন জাতীয় মানবকে পরস্পরের সহিত সংসৃষ্ট করিয়াছে, ভাব-বিনিময়ের সুবিধা ও সভ্যতা-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে পূর্ব্বকালে যুদ্ধবিগ্রহ বর্ত্তমান-কালের ন্যায় এত অধিক মারাত্মক ছিল না, এ কথা সত্য। কিন্তু এ স্থলে এ কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, যেরূপ সংস্রবের, ভাব-বিনিময়ের ও সভ্যতা-বিস্তারের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাতে অনেক জাতি, বিশেষতঃ বিজিত জাতি, কখনও কখনও জগৎ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে কোনও জাতি উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা এখনও যাইতেছে সত্য, কিন্তু মানব-জাতির সভ্যতা যুগে যুগে ক্রমবিবর্ত্তিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। জাতি মরে, কিন্তু তাঁহার সভ্যতা মরে না; কোনও না কোনও ভাবে উহা সজীব থাকিয়া মানব-জাতির কল্যাণ-সাধন করে। জগতে মোটের উপর কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ নাই। বারুদ আবিষ্কার এ নিয়মের বহির্ভূত নহে।

ইহার পরেই বিদ্যুৎ আবিষ্কারের কথা বলিতে হয়। অর্থাৎ উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী-উদ্ভাবনের কথা এ স্থলে সহজেই মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি ইহাকে মানবীয়-সভ্যতার বাহ্য-বিকাশের সহিত গুরুতররূপে সংসৃষ্ট মনে করি না। এ নিমিত্ত আমি অষ্টম ও শেষ আবিষ্কারের স্থলে ব্যোমযানের উল্লেখ করিব। এই আবিষ্কারের যুগ চলিতেছে। কালে এই হেতু মানব-সভ্যতা কি আকার ধারণ করিবে, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন। মানব বাষ্পীয়-শকট ও অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া জলে স্থলে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এখন সে আকাশ বিজয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এই আবিষ্কারের ফল মানব-সভ্যতাকে

গুরুতরভাবে পরিবর্ত্তিত করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমরা যে দিক্ হইতে সভ্যতার বিকাশের আলোচনা করিতেছি, দেখিলাম, উহা কতিপয় আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিতেছে। উহাতে এক দিকে যেমন নির্দ্দিষ্ট সমাজের বন্ধন দৃঢ় করিতেছে, অপর দিকে তেমনই বাহ্য-প্রকৃতির উপর মানবের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। কিন্তু সভ্যতার এই দিক্‌টা বাহ্য-বিষয়ক, ইহা পারমার্থিক নহে। মানব মানসিক উন্নতিতে অগ্রসর হইতে না পারিলে, তাহার সভ্যতা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। মনের উন্নতিই প্রধান কথা। দেহ যে পরিমাণে মনের সহায়তা করে, বাহ্য-জগতের অনুশীলন করিতেও মন তেমনি বিশেষ ভাবে উন্নত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব-মন শ্রীভগবানের পদে আকৃষ্ট হওয়াই পরম পুরুষার্থ, উহাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সমাজ ঐ দিকে অগ্রসর হইলেই প্রকৃত সভ্যতার অধিকারী হইল, নচেৎ সকলই সভ্যতার ভানমাত্র—ইহা মানব-সমাজ যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করে, ততই মঙ্গল।

(শ্রীশশধর রায়)

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা।

শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না এবং লোক কোন কার্য্যই ভালরূপে করিতে পারে না। সত্যই "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।" শরীরই ধর্ম্মসাধনের আদি উপায়। অতএব শারীরিক শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়। এস্থলে শারীরিক শিক্ষা বলিলে কেবল

ব্যায়াম বুঝাইবে না; উপযুক্ত আহার গ্রহণ, উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান, যথাযোগ্য ব্যায়াম অভ্যাস, আবশ্যকমত বিশ্রাম লওয়া, যথাসময়ে নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি যে সকল কার্য্য দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টি-বর্দ্ধন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও উৎকর্ষ-লাভের বিঘ্ন না হইয়া বরং সহায়তা হয়, তৎসমুদায়েরই অনুষ্ঠান বুঝাইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, জ্ঞানলাভের জন্য এত শারীরিক নিয়ম পালনের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর নিতান্ত অসুস্থ না হয়, ততক্ষণ জ্ঞানলাভের কোন বাধা হয় না। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবীর পক্ষে শরীরের অবস্থা ভাল না থাকিলেও জ্ঞানার্জ্জনের অধিক বিঘ্ন না হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ঘটে না; এবং আহার ও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্রাম যথানিয়মে চলিলেই শরীর ও মনের অবস্থা জ্ঞানার্জ্জনের উপযোগী হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রহ্মচর্য্য-পালন ও আহার নিদ্রার সংযমই শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশস্ত নিয়ম।

সহজ অবস্থায় অনেক শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘন সহ্য হয় এবং অনেক সহজ কার্য্য বিনা শারীরিক শিক্ষায় এক প্রকার চলে, কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক নিয়ম-পালন ও শারীরিক শিক্ষা অনাবশ্যক বলা যায় না। নিয়মিত আহার, ব্যায়াম ও বিশ্রাম দ্বারা অনেক দুর্ব্বল দেহ সবল হয়। হস্ত চক্ষুর সুশিক্ষা দ্বারা লোকে চিত্রকরণে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে শিক্ষা না করিলে চিত্র করা দূরে থাকুক, একটি দীর্ঘ সরল-রেখাও টানিতে পারা যায় না।

মন যেমন শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ, মানসিক শিক্ষাও সেইরূপ শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষা কঠিন বিষয়। এস্থলে মানসিক শিক্ষা, বিদ্যা-শিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন

বিদ্যাশিক্ষা জগতের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বুঝায়, কিন্তু মানসিক-শিক্ষা তদতিরিক্ত আরও কিঞ্চিৎ বুঝায়; অর্থাৎ জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞান-লাভের শক্তিবর্দ্ধন এই দুইটিই বুঝায়। উপরি উক্ত বিশেষ বিশেষ বিদ্যা শিখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই মানসিক শিক্ষালাভ হয়। যথা, —দর্শন বা গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, ইতিহাস শিখিতে গেলে, অভ্যাস দ্বারা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শিক্ষার প্রতি পৃথক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কেন না বিদ্যাশিক্ষা যদিও অনেক সময়েই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে, কখন কখন আবার তাহা তদ্বিপরীত ফলও উৎপন্ন করে। নিরবচ্ছিন্ন এক বিদ্যা আলোচনা দ্বারা যদিও সেই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু মনের সাধারণ শক্তির তদ্দ্বারা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া যায় এবং এইরূপে পণ্ডিতমূর্খ বলিয়া যে এক শ্রেণীর বিচিত্র লোক আছে, তাহার সৃষ্টি হয়। বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াও যদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে এইরূপ পরিহাস-ভাজন হইতে পারে, তবে সেই অত্যাবশ্যক মানসিক শিক্ষা কি? এবং কিরূপে তাহা লাভ করা যায়? উৎসুক হইয়া সকলেই এই প্রশ্ন করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানসিক—শিক্ষা কেবল বিষয়-বিশেষের জ্ঞানলাভ নহে, সকল বিষয়েই জ্ঞান-লাভের শক্তি-বর্দ্ধন ইহার মূল লক্ষণ। সেই শক্তি-বর্দ্ধনের উপায় নানা বিষয়ের যথাসম্ভব শিক্ষা এবং সকল বিষয়ই যথাসাধ্য আয়ত্ত করিবার অভ্যাস। সকল বিষয় সকলের সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইতে পারে না, কিন্তু সকল বিষয়েরই সহজ কথা কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করার শক্তি সকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরই থাকা উচিত এবং একটু যত্ন করিলেই সে শক্তি লাভ করা যায়। বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি বড়। বিদ্যা কম থাকিলেও লোকের চলে, কিন্তু বুদ্ধি কম

থাকিলে চলা ভাব। প্রকৃত মানসিক শিক্ষা না হইলে, জ্ঞানলাভ সহজে হয় না।

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা অপেক্ষা নৈতিক শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। শরীর সবল ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলেও যাহার নীতি কলুষিত, সে নিজের এবং অপর সাধারণের অমঙ্গলের কারণ হয়। চাণক্য যথার্থই বলিয়াছেন—

"দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যযালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥"

"দুর্জ্জন বিদ্বান্ হইলেও পরিত্যজ্য। সর্পের মস্তকে মণি থাকিলে কি সে ভয়ঙ্কর নহে?" নৈতিক শিক্ষা যেমন অতি প্রয়োজনীয়, তেমনই অতি কঠিন। সুনীতি কাহাকে বলে এবং দুর্নীতি কাহাকে বলে, তাহা স্থির করা প্রায়ই সহজ। কিন্তু তাহা হইলেও যে নৈতিক শিক্ষা এত কঠিন, তাহার কারণ এই যে, নৈতিক শিক্ষালাভ, কি সুনীতি কি দুর্নীতি ইহা জানিলেই সম্পন্ন হয় না। কার্য্যতঃ যাহা সুনীতি তাহার আচরণ করা ও যাহা দুর্নীতি তাহার পরিহার করাই নৈতিক শিক্ষা-লাভের লক্ষণ এবং সেইরূপ কার্য্য করিতে পারা বহু যত্ন ও অভ্যাসের ফল। ফলতঃ নৈতিক শিক্ষা কেবল জ্ঞানবিষয়ক নহে, ইহা প্রধানতঃ কর্ম্মবিষয়ক। তবে নৈতিক শিক্ষা জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। যদিও দুর্জ্জন বিদ্যালঙ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু দুর্জ্জনের প্রকৃত জ্ঞান-লাভ প্রায়ই ঘটে না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত যে সকল যত্ন ও অভ্যাস আবশ্যক, তদুপযোগী মনের শান্তভাব দুর্নীত ব্যক্তিদিগের থাকে না। তাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ধীরবুদ্ধি হয় না। তাহারা সূক্ষ্ম কথা ধরিতে পারে, কিন্তু কোন বিষয়ে স্থূল ও প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। তাহারা কুতর্ক করিয়া

কুটিল পথে যাইতে পারে, কিন্তু সুযুক্তি দ্বারা সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। যেখানে কোন দোষ নাই, সেখানে তাহারা দোষ দেখে, যেখানে প্রকৃত দোষ আছে, তাহাদের বক্রদৃষ্টি তাহা দেখিতে পায় না। বোধ হয়, এই জন্যই আর্য্য ঋষিরা যাহাকে তাহাকে উপদেশ দিতেন না! শান্ত, ঋজু এবং দম্ভ-বৰ্জ্জিত না হইলে, কাহাকেও শিষ্য করিতেন না; অর্থাৎ শিষ্য আগে নৈতিক-শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, তাহাকে জ্ঞান-শিক্ষা দিতেন না। আর একটি কথা আছে। দুর্নীত ব্যক্তির জড়জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি হইলেও তদ্দ্বারা সংসারের অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে; সুতরাং নৈতিক-শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক কষ্ট বৃদ্ধি হয় এবং নীতি-শিক্ষা দ্বারা আমাদের অনেক কষ্টের লাঘব হইতে পারে। সত্য বটে, নীতিশিক্ষাদ্বারা দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু নিবারিত হয় না, কারণ তদ্দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী দ্রব্য বা রোগোপশমের ঔষধ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। কিন্তু নীতিশিক্ষা যে আলস্য-অপব্যয়াদি সম্ভূত দারিদ্র্য এবং অতিভোজন ও ইন্দ্রিয়পরতাদিজনিত রোগ-নিবারণের উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুনীতিসম্পন্ন ব্যক্তি যথা সাধ্য যত্ন করিয়া দারিদ্র্য ও রোগনিবারণে সতত তৎপর থাকেন। আবার দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু, দৈবদুর্ঘটনাদি যেখানে অনিবার্য্য, সেখানে তজ্জনিত দুঃখভার সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিবার ক্ষমতা নীতিশিক্ষা বিনা কিছুতেই জন্মে না এবং সেই ক্ষমতা এই সুখদুঃখময় সংসারে বড় অল্প মূল্যবান্ সম্পদ্ নহে।

এতদ্ব্যতীত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দৈব-দুর্ব্বিপাকাদি আমাদের যত দুঃখের মূল, আমাদের দুর্নীতি তদপেক্ষা অল্প দুঃখের মূল নহে। প্রথমতঃ, আমাদের নিজের দুর্নীতিতে নিজের

অশেষ দুঃখ ঘটে। অতিভোজনাদি 'অসংযত-ইন্দ্রিয়সেবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। দুরাকাঙ্ক্ষা, অতিলোভ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষাদি দুষ্প্রবৃত্তি হইতে আমরা তীব্র মনোবেদনা সহ্য করি। দ্বিতীয়তঃ, পরের দুর্নীতির জন্য অপমান, বঞ্চনা, চৌর্য্যাদি দ্বারা অর্থনাশ, শত্রুহস্তে আঘাত ও অপমৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার গুরুতর ক্লেশ ভোগ করি। রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত অমঙ্গলও মনুষ্যের দুর্নীতির ফল। অতএব ইন্দ্রিয়সংযম ও দুষ্প্রবৃত্তি দমন শিক্ষা না করিলে, কেবল বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগের ঔষধ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারিলেও মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না।

(৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা।

ইউরোপীয় সভ্যতা।—একজন চিন্তাশীল লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার মূলে গ্রীক নাই, তাহা ইউরোপে অগ্রাহ্য। রোমক-সভ্যতা গ্রীক-সভ্যতা হইতে উদ্ভূত, তারপর গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অনুকরণে সমগ্র ইউরোপের সভ্যতা গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সভ্যতার গঠনকালে ইউরোপ ইহুদি-জাতির নিকটও ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইউরোপ ইহুদি-জাতির নিকট হইতে ধর্ম্ম, গ্রীক-জাতির নিকট হইতে দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা এবং রোমক-জাতির নিকট হইতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আপন সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করেন।

খৃষ্ট ধর্ম্ম।—অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুলার লিখিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নানা সৌসাদৃশ্য (*) বিস্ময়কর; ইহাও স্বীকার্য্য যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অন্ততঃ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বৌদ্ধ-প্রভাব আরোপ করিবার পূর্ব্বে ইহুদি-জাতির অধ্যুষিত দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম উপনীত হইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিকাশ-সম্পর্কে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। আমরা তাদৃশ প্রমাণ পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মিশর হইতে মূল রস আকর্ষণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইবার বহুপূর্ব্বে মিশরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের জন্মস্থান প্যালেষ্টাইন্‌ বা সিরিয়াতেও বৌদ্ধধর্ম্মের কীর্ত্তি স্থাপিত ছিল। তদ্ব্যতীত ইউরোপীয় সভ্যতার আদিভূমি গ্রীস-দেশেও বৌদ্ধপ্রচারকগণ স্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইউরোপ ও আফ্রিকার সন্ধিস্থল আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া-নগরীতে গ্রীক-দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনুশীলন হইত। তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে মিশরে বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধনীতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রও মিশর-দেশে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এমোনিয়াস্‌-নামক একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত নিউপ্লাটানিক্‌ নামে এক নূতন দর্শনশাস্ত্রের প্রচার করেন। এমোনিয়াস্‌ মিশরদেশের রাজধানী আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব ভারতবর্ষের হিন্দু দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রথম তিন শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্মের অঙ্গে গ্রীক,

* এই সৌসাদৃশ্যের বিস্তৃত বিবরণ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত Ancient India নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভারতের বৌদ্ধ ও আর্য্যধর্ম্মের নিকট ঋণী।

গ্রীকদর্শন—অতি প্রাচীনকালে নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণ শিক্ষার্থীর বেশে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন এবং বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রতিগমন করিতেন। ডাঃ এন্‌ফিল্ড প্রদর্শন করিয়াছেন, পিথাগোরাস্, এনাক্সারকাস্, পিবো প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রথম অবস্থায় ভারতবর্ষে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সকল দর্শনশাস্ত্রকর্ত্তা পরবর্ত্তী কালে যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের অনেকাংশ পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তা-প্রসূত তত্ত্ব সকল সূর্য্য-কিরণের ন্যায় "দীপ্তিপূর্ণ জ্যোতীরেখা।" স্লিগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক স্বীকার করিয়াছেন যে, দার্শনিক প্রতিভার প্রতিপত্তিতে গ্রীক জ্যোতিষ্কগণ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট হীনপ্রভ; সুতরাং ঐ সকল গ্রীক পণ্ডিতের চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। ফলতঃ হিন্দু ও গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। খ্যাতনামা কোলব্রুক্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, 'দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে হিন্দুজাতি ঋণ দান করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন নাই।' একজন ফরাসী লেখক লিখিয়াছেন, 'প্রখ্যাত গ্রীক লেখকগণের উদ্ঘাটিত তত্ত্বাবলীর প্রত্যেক অনুক্রমে হিন্দুদর্শনের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।' এতদ্দ্বারা যথেষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ সকল লেখক প্রাচ্যশাস্ত্রের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের অনেকে কোনপ্রকার মধ্যবর্ত্তী শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া, একেবারে প্রাচ্যবিদ্যার উৎসস্থল ভারতবর্ষের শাস্ত্রদ্বারা

আপনাদের অভিমত সমূহ গঠন করিয়াছিলেন। চিরখ্যাত গ্রীক-পণ্ডিত পিথাগোরাস্ ভারতবর্ষে জ্ঞানান্বেষণের জন্য উপনীত হন এবং তদ্ধেতুই আর্য্য ঋষিগণকর্ত্তৃক উদ্ঘাটিত পুনর্জন্ম-তত্ত্ব সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞান—দর্শন বা মনোবিদ্যার পরেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের নাম উল্লেখ-যোগ্য। বিজ্ঞান, সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপাদান। রসায়ন-বিদ্যা বিজ্ঞানের প্রধান অংশ এবং সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে উহার প্রয়োজন গুরুতর। "এই রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। জানা গিয়াছে যে, আরবদিগের নিকট হইতে ইউরোপবাসিগণ রসায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক ও সুশ্রুত এ দেশের প্রধান চিকিৎসা-গ্রন্থ। আরবেরা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল মধ্যে চরক ও সুশ্রুত অনুবাদ করিয়া লন এবং প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসীদিগের নিকট আপনাদিগের ঋণ স্বীকার করেন।

"খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগ্দাদের বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল্-রসিদের সভায় দুই জন হিন্দু চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এল্-ফিন্-ষ্টোন সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, তাঁহারা গান্ধকিক অম্ল, যাবক্ষারিক অম্ল ও লাবণিক অম্ল, তাম্র, লৌহ, সীসক, রাঙ এবং দস্তার অম্লজানজ ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া-জাত যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। এই পদার্থগুলির মধ্যে গান্ধকিক অম্লকে হিন্দুরা মহাদ্রাবক নাম দিয়াছেন এবং এ নামটি কেমন যুক্তি সঙ্গত, ডাক্তার ওশান্সী-লিখিত কয়েক পঙ্ক্তির নিম্নস্থ অনুবাদ দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে,—

"এই দ্রাবকের সাহায্যে আমরা যাবক্ষারিক, লাবণিক প্রভৃতি কত অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমরা অল্প মূল্যে সোডা, হরিতালাদি উৎপাদন করিতে পারি। ইহা রঙ্গকরের প্রক্রিয়ায় আবশ্যক এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল্, কুইনাইন্ প্রভৃতি মহৌষধি পাইতেছি। বস্তুতঃ যে সময়ে ইউরোপে অল্পব্যয়ে গান্ধকিক অম্ল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজাত সম্বন্ধে ইউরোপের মহত্ত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে।" (১)

জ্যামিতি—রসায়নের ন্যায় গণিতশাস্ত্রের উৎপত্তি ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। বস্তুতঃ গণিত বিষয়েও ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিক্ষা দান করিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্মগত-প্রাণ ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা তদ্গত-চিত্তে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তদুপলক্ষেই নানা বিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যজ্ঞ-বেদী-নির্ম্মাণ-প্রণালী হইতে জ্যামিতি বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নানা প্রকার যজ্ঞ-বেদীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; জ্যামিতিক জ্ঞান-ব্যতীত এই সকল যজ্ঞ-বেদীর নির্ম্মাণ সম্ভবপর নহে। ফলতঃ নানা আকার-বিশিষ্ট যজ্ঞ-বেদীর নির্ম্মাণ-কৌশল জ্যামিতিবিদ্যার জন্ম প্রদান করে। ডাক্তার থিবয়ট লিখিয়াছেন, দুই বা ততোঽধিক বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার পরে সেই সকল বর্গক্ষেত্রের পরিমাণফলের সমান আর একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে হইত। আবার কোন কোন স্থলে দুইটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার পরে তাহাদের পরিমাণফলের পার্থক্যের সমান আর একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে হইত। কখন কখন বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে এবং আয়তক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইত। তদ্ব্যতীত বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের পরিমাণফলের সমান করিয়া ত্রিভুজক্ষেত্র

(১) ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অঙ্কিত করিতে হইত, ইত্যাদি। কখন কখন এরূপ বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইত, যাহার ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের পরিমাণ ফলের সমান থাকিত। ঈদৃশ বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র এবং বৃত্ত অঙ্কনের ফলে কতকগুলি জ্যামিতিক নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। এই সকল নিয়ম কল্পসূত্রে লিখিত রহিয়াছে। এই কল্পসূত্র খৃষ্টের জন্মের আট শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস্ ভারতবর্ষ হইতে জ্যামিতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান দেখা যায়।

পাটীগণিত—জ্যামিতিশাস্ত্র ভারতবর্ষেই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে অন্যান্য গণিতশাস্ত্রে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়, তাহা আমরা দেখাইতেছি। এক্ষণে অধিকাংশ সভ্য জনপদে "যে সংখ্যা-লিখন-প্রণালী চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি।" নয়টি অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদয় সংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। ইউরোপবাসিগণ আরববাসীদিগের নিকট পাটীগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাহাউদ্দিন (একজন আরব গ্রন্থকার) ভারতবাসীদিগকে দশগুণোত্তরা প্রণালীর অঙ্কগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন। ভারতবাসীরা যে এই সংখ্যা-লিখন-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ একখণ্ড আরবী কবিতাবলীর প্রস্তাবনা হইতে সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে; এজন্য বলা ভাল যে, সমুদয় আরবী ও পারসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাসীদিগকে স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ আছে।

বীজগণিত—কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসীদিগের সৃষ্টি। বর্ত্তমান ইউরোপবাসীরা বীজগণিত মুসলমানদিগের নিকট পাইয়াছেন। সুবিখ্যাত কোলব্রুক্ সাহেব লিখিয়াছেন, 'মোহম্মদ বেন মুসা আরবদিগের মধ্যে প্রথম বীজগণিত প্রকাশ করেন বলিয়া পরিচিত।

তিনি আন্‌মান্‌স্থরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন।' (১) ৭৪৯ হইতে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আন্‌মান্‌সুরের রাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের জন্ম; ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের মৃত্যু; এবং ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম। সুতরাং যে সময়ে আরবেরা প্রথম বীজগণিত প্রচার করিলেন, সে সময়ে এদেশে বীজগণিতের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, এবং আরব-দেশের প্রথম বীজগণিত-প্রচারকর্ত্তা ভারতবর্ষের সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

জ্যোতিষ—গণিতশাস্ত্রের অন্যতম শাখা জ্যামিতির ন্যায় জ্যোতিষ-শাস্ত্রও আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মচর্য্যা উপলক্ষে সৃষ্ট হইয়াছিল। ডাক্তার থিবয়ট্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যজ্ঞে বলিদানের জন্য ঠিক সময় নির্দ্ধারণ জন্য নিয়ম উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই আর্য্য ঋষিগণ জ্যোতিষ-বিষয়ক পর্য্যবেক্ষণের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ঐ নিয়ম উদ্ভাবন জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহারা নক্ষত্রমালার মধ্যদিয়া চন্দ্রের গতি অবলোকন করিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা সূর্য্যের পর্য্যায়গত-গতি পরিদর্শন জন্যও একাগ্রচিত্তে নিরত থাকিতেন।

ভারতীয় বর্ণমালা—"ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত, রসায়ন প্রভৃতি সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটি নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটি বর্ণমালা আছে—চীনদেশীয়, ফিনিসীয় এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় বর্ণমালা চীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা ইহুদী, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, তিব্বত,

(১) ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, তালু, মূৰ্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, এইরূপ উচ্চারণ-স্থান-ভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটি যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, অন্য দুইটি তদ্রূপ নহে।" (১)

ভারতবর্ষ হইতে সমগ্র পৃথিবী কতদূর উপকৃত হইয়াছে, তাহা আমরা যথাশক্তি প্রদর্শন করিলাম। স্মরণাতীত কাল হইতে বৈদেশিকগণ নানাসূত্রে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয়েরাও বিদেশে গমন করিতেন। ইহার ফলে ভারতীয় বিদ্যা দেশান্তরে নীত হইয়াছিল। যে সকল কারণে এইরূপ গমনাগমন হইত, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রধানতঃ ভারতীয় রাজন্যগণের দিগ্বিজয়, বৈদেশিকগণের ভারত আক্রমণ, বাণিজ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার উপলক্ষেই ভারতবর্ষের সহিত বিদেশের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের দিগ্বিজয়—রামায়ণ এবং মহাভারতাদি প্রাচীনগ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে, পুরাকালে হিন্দু-নরপতিগণ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাহাতে অনেক সময় তাঁহারা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া বহির্দ্দেশেও গমন করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ ছাড়িয়া দিলেও আমরা ভারতীয় রাজন্যবর্গকে বিদেশাক্রমণে নিরত দেখিতে পাই। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ২১০ খৃঃ পূঃ অব্দে সৌভাগ্যসেন-নামক একজন ভারতীয় অধিপতি সম্মিলিত সিরিয়ান ও বাকট্রিয়ান সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে বাকট্রিয়ান-অধিপতি গ্রীকরাজ এন্টিওকাস্ নিহত হন। হিন্দুজাতির অধঃপতনের সূচনাকালেও তাঁহারা স্বদেশ অতিক্রম করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। ৯৭৮

(১) ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

খৃষ্টাব্দে পঞ্চনদ-বিধৌত-প্রদেশের রাজা জয়পাল গজনী রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গজনী-রাজ সবক্তগীন গোরক্তদ্বারা হিন্দু-সৈন্যের পানীয় জল দূষিত করাতে এবং অকস্মাৎ প্রবলবেগে তুষার-পাত আরম্ভ হওয়াতে জয়পাল অকীর্ত্তিকর সন্ধি স্থাপন করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

পুরাকালে রাজ-গৌরব এবং বীরকীর্ত্তির প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় রাজ-গণের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য ছিল। আক্রান্ত অধিপতিগণ মস্তক অবনত করিয়া কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু কোন কোন স্থানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইত। ভারতীয় রাজন্যগণ ভারত-সীমার বহির্ভাগে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া বিজিত দেশ সকল স্বশাসনাধীন করিয়াছেন, এরূপ অনেক দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করিয়া-ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই। হিন্দুজাতি পারস্যদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহারও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্লিনির মতে জেতিওসিয়া, আরা-কোশিয়া, আরিয়া এবং পেরোপামিসাস্-নামক পারস্যের বিভাগ-চতুষ্টয় হিন্দুজাতির শাসনাধীন ছিল। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থ হইতেও এই মতের সমর্থন করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, গ্রীকগণ হিন্দুদের হস্তে পারস্যের বিপুল অংশ অর্পণ করেন। এতদপেক্ষা আধুনিক কালে হিন্দুগণ ভারতমহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক পণ্ডিত-গণের গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। (শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত)

সাগরিকা।

মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রোপকূল হইতে অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বহুবিস্তৃত মহাসাগর-বক্ষে যে অসংখ্য দ্বীপাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোনও কোনও গ্রন্থে ও মানচিত্রে "ভারত-দ্বীপপুঞ্জ" নামে উল্লিখিত। দ্বীপগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে, একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিয়াই কথিত হইতে পারিত। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে একত্র এরূপ দ্বীপসমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষুব-রেখার উপরে ও সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিতি হইলেও, এই সকল দ্বীপ প্রকৃতির লীলা-নিকেতন বলিয়া কথিত হইতে পারে। উত্তর-পশ্চিমের ও দক্ষিণ পূর্ব্বের সাগর-সমীরণ গ্রীষ্মতাপ প্রশমিত করিয়া বৃষ্টিপাত নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্য প্রকৃতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না। বৃক্ষলতার প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যে বাহ্য দৃশ্য মনোহর হরিদ্বর্ণে সুশোভিত;—অল্পায়াস-লব্ধ ফলশস্যে অধিবাসিগণ নিয়ত আত্মতৃপ্ত;—বাণিজ্য-বিপণির অগণ্য পণ্যসম্ভারে বেলাভূমি ক্রয়-বিক্রয়-কোলাহলে নিরন্তর মুখরিত।

পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে আমেরিকার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইবার সমসময়ে এই প্রাচ্য পণ্য-বীথিকার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে যে সকল পাশ্চাত্য নাবিক সমুদ্রপথে ভূ-প্রদক্ষিণে বহির্গত হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট ইহার সন্ধানলাভ করিবামাত্র, বহু বণিক্-সমিতি প্রাচ্য বাণিজ্য করতলগত করিবার প্রবল প্রলোভনে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কালক্রমে সমগ্র প্রাচ্য সাগরবক্ষে তাহাদিগের অপ্রতিহত অধিকার সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে।

তৎপূর্ব্বে,—বহুকাল পর্য্যন্ত—প্রাচ্য সাগরবক্ষে ভারতবর্ষের প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে বর্ত্তমান ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের লুপ্তাবশিষ্ট

পুরাতন গ্রন্থে তাহার সম্যক্ পরিচয় লাভের উপায় নাই। কিন্তু ভারতদ্বীপপুঞ্জের শিল্পে, সাহিত্যে, আচারে, ব্যবহারে, এখনও তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময়ে ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব, ভারতবাণিজ্যের অনুযাত্রী হইয়া মরুগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া, আপৎ-সঙ্কুল স্থলপথে অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সকল স্থলে তাহার স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাহা উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া, জলপথেও কতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ভারত-দ্বীপপুঞ্জে তাহার অনেক স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়— ঐ দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের যেরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যসম্বন্ধ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। তদুপলক্ষে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে ভারতীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়া, ভারতবর্ষের চতুঃসীমার বাহিরে একটি বৃহত্তর ভারতবর্ষ গঠিত হইয়াছিল। তাহার অনুকূল কারণপরম্পরার অভাব ছিল না। নৈসর্গিক শোভায় ও অপর্য্যাপ্ত শস্যসম্পদে এই নাতিশীতোষ্ণ দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পক্ষে উপনিবেশ-সংস্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। যে যুগে এই উপনিবেশ-সংস্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা মানব-সমাজের ইতিহাসের পূর্ব্বতন যুগ;—তৎকালে উপনিবেশ-সংস্থাপন-ব্যাপারেও ভারতবর্ষ সকলের অগ্রগণ্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

যাহারা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত, তাহারা "নিগ্রিটো"-জাতীয় খর্ব্বাকার কৃষ্ণকায় কুঞ্চিতকেশ অসভ্য মানব। তাহাদিগের পক্ষে ভারতীয়গণের উপনিবেশ-সংস্থাপন-চেষ্টার গতিরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা বরং ভারতীয়গণের আশ্রয়লাভ করিয়া শিক্ষায় সমুন্নত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎসূত্রে

তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে "মঙ্গোলীয়" ও "ককেশীয়" মানবের সংমিশ্রণ সাধিত হইয়া গিয়াছে। পরস্পরের সুদীর্ঘ সংসর্গ-প্রভাবে তাহাদিগের অবস্থা এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রভাবাপন্ন হইলেও অনেক বিষয়ে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও নৈসর্গিক পার্থক্য এখনও ঐ সকল স্থানে সভ্যাসভ্য দুইটি পৃথক্ মানব-সমাজের পরিচয় প্রদান করে।

ভারতবর্ষের সহিত ভারত-দ্বীপপুঞ্জের এই সুদীর্ঘ সংসর্গ মানব-সমাজের ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ইহাকে উপেক্ষা করিলে, মানব-সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। দ্বীপপুঞ্জের সন্ধানলাভের পর, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের চেষ্টায় ঐ সকল স্থানের ভূ-তত্ত্বের, জীবতত্ত্বের ও উদ্ভিজ্জতত্ত্বের আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে;—প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভারত-সংসর্গ-জনিত পুরাতত্ত্বের আলোচনা এখনও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ন্যায় ভারত-দ্বীপপুঞ্জেরও লিখিত ইতিহাসের অভাবে, পুরাকাহিনী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কোনও কোনও পুরাতন খোদিত-লিপিতে পাওয়া যায়,—এক সময়ে ভারত-লিপি ভারত-দ্বীপপুঞ্জেও প্রচলিত হইয়াছিল। এখন তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ-রূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তাহা এখনও পুরাকালের ভারত-সংসর্গের অভ্রান্ত নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান আছে। একটি দ্বীপে ইহার পরিচয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্বাচার্য্যগণ (ইংরাজী হইতে অক্ষরান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়া) "বালি-দ্বীপ" বলিয়া এই দ্বীপটির নামকরণ করিয়াছিলেন

ইহার প্রকৃত নাম বলী দ্বীপ (বলবান্‌গণের বাসস্থান)। "উশনাবলী" ও "বলীসংগ্রহ" নামক তদ্দেশের দুইখানি হস্ত-লিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবার পর, এই নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই দ্বীপের সমুদ্রোপকূল নিয়ত তরঙ্গ-সঙ্কুল বলিয়া তাহা সহসা শত্রুসেনা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারিত না ;—অধিবাসিগণও শিক্ষায়, সভ্যতায় ও বাহুবলে পরাক্রান্ত বলিয়াই পরিচিত ছিল। তজ্জন্য এখান কার হিন্দুরাজ্যের গৌরব-দীপ অনেক দিন প্রজ্জলিত থাকিবার পর, সম্প্রতি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এখন রাজশক্তি ওলন্দাজগণের করতল-গত। কিন্তু হিন্দু-সমাজ এখনও পূর্ব্ব প্রতাপেই বর্ত্তমান আছে। এখানে কিরূপে হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার লিখিত ইতিহাস এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ভারত-দ্বীপপুঞ্জে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হয়। তাহার প্রথম উপক্রমে, যাঁহারা যব-দ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া বলী দ্বীপে আসিয়া, তথায় হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এই দ্বীপে এখনও হিন্দু-সভ্যতার প্রধান নিদর্শন—সংস্কৃত-গ্রন্থের সাহায্যে ভারতীয় উপনিবেশ-নিচয়ের পুরা-কাহিনীর সন্ধান-লাভ করিতে হইলে,বলী দ্বীপ হইতেই তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত করিতে হইবে। আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, এই কারণে, বলীদ্বীপের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়।

যাঁহারা বলী দ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, হিন্দু-ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে স্বধর্ম্ম-রক্ষক সংস্কৃত-গ্রন্থাবলী রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আয়োজন করিবেন, তাহা স্বাভাবিক। মাতৃ-ভূমির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর, বলী দ্বীপের হিন্দু-সমাজের

পক্ষে গ্রন্থরক্ষার চেষ্টা একটি অবশ্য-প্রতিপালনীয় পবিত্র ব্রতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তজ্জন্য এখনও সংস্কৃত-গ্রন্থ বংশানুক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা তথ্যানুসন্ধানের অধিকতর সুযোগ লাভ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই সকল গ্রন্থের সাহায্য-গ্রহণে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের যত্নে অনেক গ্রন্থের পাঠ ও প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

কোন্ সময় হইতে কিরূপ ঘটনাচক্রে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, তাহার ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার আশা নাই। তাহা স্মরণাতীত পুরাকালের কথা। রামায়ণের ন্যায় অতি পুরাতন গ্রন্থে যব-দ্বীপের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, রামায়ণের রচনাকালে তাহার জনশ্রুতি কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল। তখন হয় ত কেবল বাণিজ্য-সম্বন্ধই বর্ত্তমান ছিল। উত্তরকালে উপনিবেশ-সংস্থাপন সেই সুদীর্ঘ বাণিজ্য-সম্পর্কের পরিণামমাত্র। তাহাকে এক দিনের বা এক যুগের ঘটনা বলিবার উপায় নাই। তজ্জন্যই ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভারতীয় উপনিবেশসমূহে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তর-বিন্যাসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক স্তরে প্রবল-পরাক্রান্ত পাশ্চাত্য-প্রভাব পূর্ব্বকালবর্ত্তী সকল প্রভাবকেই ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তৎপূর্ব্বে আরবগণের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। তাহাতেও তৎপূর্ব্বকালবর্ত্তী ভারতীয় প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যে যুগে ভারতীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বর্ত্তমান ছিল, ভাষা ও সাহিত্য হইতে তাহার পরিচয় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। আচার-ব্যবহারে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, জনসমাজের পরম্পরা-গত বিবিধ মতে ও বিশ্বাসে, এখনও তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা

আছে। তাহার সাহায্যে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভারত-সংসর্গের বিবরণ-সঙ্কলনের জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

ভারত-দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক বর্ত্তমান ছিল, এবং তৎসূত্রে নানা স্থানে ভারতীয় উপনিবেশও সংস্থাপিত হইয়াছিল,—এ সকল কথা সর্ব্ববাদিসম্মত পুরাতন কথা। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের লোক ভারত-দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই।

(অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়)

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব।

ভগবান্ বিশ্বতশ্চক্ষু,—এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহার চক্ষু নাই। কি বাহ্য জগতে, কি অন্তর্জ্জগতে কোথাও এমন স্থান নাই, যে স্থলে তিনি নাই। অতি দূরে যাহা ঘটিতেছে, তাহাও তিনি যেমন দেখিতেছেন, অতি নিকটে যাহা ঘটিতেছে, তাহাও তিনি তেমনই দেখিতেছেন। মনুষ্যের চক্ষু হইতে লুকাইতে পারি, কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে কিছুতেই লুকাইবার সাধ্য নাই। বাহিরের কার্য্য ত দেখিতেছেনই, অন্তরে—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কখন্ কোন্ চিন্তাটি উদয় হইল, মানুষ তাহা জানিল না বটে, কিন্তু তিনি তন্ন তন্ন করিয়া তাহার প্রত্যেকটি দেখিলেন। পাপের শাস্তিদাতা তিনি, তাঁহার নিকট অন্য সাক্ষের প্রয়োজন নাই। অন্তর্দ্দর্শী তিনি সমস্ত দেখিতেছেন, প্রত্যেক পাপচিন্তা, পাপবাক্য, পাপকার্য্য, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

জানিতেছেন। ধর্ম্মরাজ, বিচারপতি, পাষণ্ডদলন তিনি, পাপ করিলে নিস্তার নাই, তাহার দণ্ডবিধান তিনি করিবেনই করিবেন, পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব? যেখানেই যাই, ওই বিশ্বতশ্চক্ষ। কোথায় পলাইব? কোথায় লুকাইব? কোথায় মস্তক রাখিব? বাহিরে বিশ্বতশ্চক্ষু—ভিতরে বিশ্বতশ্চক্ষু—কাহার সাধ্য ঐ চক্ষুর দৃষ্টির বাহিরে যায়? পাপি! ঐ যে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পাপের আয়োজন করিতেছ—একবার উর্দ্ধদিকে দেখ—ঐ সমস্ত গৃহের ছাদময় ও কি? ও কাহার দৃষ্টিবাণ তোমার অন্তস্থল ভেদ করিতেছে? ঐ দেখ, প্রাচীরের প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর হইতেও কাহার দৃষ্টি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তোমার দিকে ধাবমান? আবার কক্ষতল ঐ কাহার দৃষ্টিতে ছাইয়া গেল? তুমি যে ঐ দৃষ্টির কারাগারে বন্দী হইয়া পড়িয়াছ, কোথায় সে দৃষ্টি নাই? উর্দ্ধে ঐ দেখ—বিশ্বতশ্চক্ষু, নীচে দেখ বিশ্বতশ্চক্ষু, দক্ষিণে বিশ্বতশ্চক্ষু, বামে বিশ্বতশ্চক্ষু, কেবল চারিদিকে কেন—ঐ দেখ—তোমার দেহময় ও কি? প্রত্যেক লোমকূপে ও কাহার দৃষ্টি?—সমস্ত অস্থিমজ্জা-মাংসময় ও কি দেখিতেছ?

তুমি যদি মনে কর, তুমি একাকী আছ, তাহা হইলে, সেই যে হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত পাপপুণ্যদর্শী পুরাণ-পুরুষ, তাঁহাকে তুমি জান না। তিনি একটি একটি করিয়া তোমার সমস্ত পাপকর্ম্ম দেখিয়া লইতেছেন, জানিতেছেন, তুমি তাঁহার সম্মুখে পাপ করিতেছ!

(৺অশ্বিনীকুমার দত্ত)

ক্রোধ।

ক্রোধ মনুষ্যের পরম শত্রু। ক্রোধ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষণ কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলে ত ক্রোধই। ক্রোধ যে মনুষ্যকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রোধের সময় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানি তোমার নিকট বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়, যাহার মুখখানি সর্ব্বদা হাসিমাখা, তুমি দেবভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, দেখিলেই তোমার প্রাণে আনন্দ ধরে না, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও—দেখিবে, সে স্বর্গের সুষমা আর নাই; নরকাগ্নিতে বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু আরক্ত, অধর কম্পিত, নাসিকা বিস্ফারিত, ঘন ঘন ত্রস্ত শ্বাস বহিতেছে, সমস্ত মুখ কি এক কালিমার ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে, কি এক আসুরিকভাবে পূর্ণ হইয়াছে! তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটেও যাইতে ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্ত্তমধ্যে কুৎসিত করিতে ক্রোধের ন্যায় অন্য কোন রিপুই কৃতকার্য্য হয় না।

ইহলোকে ক্রোধ জীবনের বিনাশের মূল, ক্রুদ্ধ মনুষ্য পাপ কার্য্য করে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি গুরুকেও বধ করিয়া থাকে; ক্রুদ্ধ কর্কশ বাক্য দ্বারা যাহা শ্রেয়ঃ, তাহার অবমাননা করে; ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলে, লোকের আর বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না; ক্রুদ্ধ ব্যক্তি না করিতে পারে এমন কর্ম্ম নাই, না বলিতে পারে এমন বাক্য নাই, লোকে ক্রোধের উত্তেজনায় যাহারা অবধ্য তাহাদিগকেও বধ করে; ক্রুদ্ধ ব্যক্তি আপনাকেও যমালয়ে প্রেরণ করে, ক্রোধান্ধ হইলে কোন্ কার্য্যের

কি ফল, তাহা মনে উপস্থিত হয় না, উচিত কার্য্য কি, মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না।

(৺অশ্বিনীকুমার দত্ত)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

একটি তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি যে বৃষ্টি ঝটিকা সহিয়া যুগ যুগ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা কি শূন্যকে আশ্রয় করিয়া? কখনই নহে। তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং যে সকল আভ্যন্তরীণ ধাতুপুঞ্জের সংঘাত দ্বারা তাহার দেহ গঠিত, সে ধাতুপুঞ্জও ঘন-নিবিষ্ট—এই জন্য; তদ্ভিন্ন গিরি কখনই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। গিরি যে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া; নিরন্তর বর্ষার জলধারা তাহার অঙ্গ-সন্ধিকে শিথিল করিতেছে; তাহার দৈহিক ধাতু সকলকে ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে; বহুল শিলাখণ্ড অশনি-নিনাদে শৃঙ্গ হইতে পাদদেশে পাতিত করিতেছে; চক্ষের নিমিষে তরুলতা শ্রীসৌন্দর্য্য সকলই হরণ করিয়া লইতেছে; আবার কখনও বা ভীষণ ভূকম্পে ঐ গিরিদেহ বিদারিত হইয়া জ্বালামুখী প্রকাশ পাইতেছে; শত শত বনপ্রদেশ ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া নেত্রের অগোচর হইয়া যাইতেছে; কোথাও বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, অবিশ্রান্ত জ্বলিয়া সুদূরপ্রসারী অরণ্য সকলকে ভস্মীভূত করিতেছে। গিরির জীবন কি সংগ্রামের জীবন! কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্যেও গিরি দণ্ডায়মান আছে, শীতাতপ সহিয়া বিধাতার কাজ করিতেছে, গিরির ভিত্তি দৃঢ়, গিরির দেহের বন্ধন দৃঢ় বলিয়া। এ জগতে একজন মহামনা ব্যক্তিকে আমার এই গিরির সহিত তুলনা করিতে

ইচ্ছা হয়। কোন্ গিরি এমন আছে, যাহার শীতাতপের সহিত সংগ্রাম নাই? তেমনই, কোন্ মহৎ চরিত্র এমন আছে, বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত যাহার সংঘর্ষণ নাই? আবার কোন্ গিরি এমন আছে, যে নিজের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার গুণে দণ্ডায়মান নয়? তেমনই কোন্ মহৎ চরিত্রই বা এমন আছে, যাহা আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের গুণেই মহৎ নয়?

এ জগতে যিনি উঠেন, তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া সাধারণের মধ্যেই বাড়িয়া সাধারণের উপর মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান; তিনি আভ্যন্তরীণ মালমশালার সাহায্যেই বড় হইয়া থাকেন। কুষ্মাণ্ড যেমন যষ্টির সাহায্যে মাটির উপরে উঠে, তেমনই কোন্ কাপুরুষ, কোন্ অলস শ্রমকাতর মানুষ, কেবলমাত্র অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে? এ জগতে উঠিয়া, পড়িয়া, বহিয়া, সহিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, কাঁদিয়া, কাটিয়া মানুষ হইতে হয়, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়;" মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্ব লাভের অন্য রাস্তা নাই। ঈশ্বর মানুষের সহিত চুক্তি করিয়া অল্প আয়াসে মহত্ত্ব প্রদান করেন না।

আমি ঐরূপ একটি মহৎ চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি রামমোহন রায়। নচিকেতা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "শতানামেমি প্রথমঃ," আমি শতজনের মধ্যে প্রথম হইতে চাই। রামমোহন রায় যে কালে জন্মিয়াছিলেন, সে সময়ে এ দেশবাসীদিগের ভিতরে লক্ষের মধ্যে – লক্ষের কেন কোটির মধ্যে—তিনি প্রথম হইয়াছিলেন বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? সে কালের লোকের কথাই বা বলি কেন? তাঁহার জন্মের পর এই ত শত বৎসর অতীত হইয়াছে, কে তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? কে প্রকৃত মহত্ত্বগুণে তাঁহার ত্রিসীমামধ্যে আসিতে পারিয়াছে?

বলিতে কি, শঙ্করের পর এরূপ মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ আর এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত দিবালোকের নিকটে আমরা কি খদ্যোত নহি? আমরা কি সেই প্রদীপ্ত ধূমকেতুর পুচ্ছলগ্ন জ্যোতিঃ-কণিকা-মাত্র নহি?

কিন্তু রামমোহন রায় যে লক্ষের মধ্যে এক হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহা কিরূপে? যেরূপ ক্ষুদ্র গিরিরাজির মধ্যে অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই যে তিনি সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে উন্নত-শিরা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা কোন্ গুণে? তাহাও পূর্ব্বোল্লিখিত গিরিদেহের ন্যায় আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের সাহায্যে।

প্রথম উপাদান, তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানব-আত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান। মানবের আত্মাকে তিনি অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন, এই মানব-আত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত; তাঁহা হইতেই উৎপন্ন; তাঁহা দ্বারা বিধৃত এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই ইহার নিয়তি; ইহার আশা ও শক্তি অসীম। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার এবং দাসত্বকে তিনি এই জন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; যেহেতু তদ্দ্বারা মানবাত্মাকে শৃঙ্খলিত, শক্তিহীন ও আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানে বঞ্চিত করে।

এই মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান, আর এক দিকে অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের এমনই একটা প্রভাব ছিল, এমনই একটা মহাপুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তাঁহাকে কোনও ছোট কাজের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার সমীপে ছোট কথার অবতারণা করিতেও সাহসী হইতেন না।

কেবল ইহাও নহে, মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল

বলিয়া, তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গূঢ় আত্ম-শক্তিতে এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে পারিত না; কোনও বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্য্য-সাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন, বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিতেন; এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। ইংরাজী বুল্‌ডগ্‌-নামক কুকুরের এইরূপ খ্যাতি আছে যে, সে একবার যে প্রাণীকে কাম্‌ড়াইয়া ধরে, নিজের দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সে কামড় ছাড়ে না। রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি বুল্‌ডগের কামড়ের ন্যায় ছিল; তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য হইতে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বরং সে পথে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হইত, ততই তাঁহার বীর-হৃদয় আনন্দিত হইত। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন সম্মুখে বেড়া দেখিলে আনন্দিত হয়, সে ভাবে যে, উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু পাওয়া গিয়াছে, তেমনই তাঁহার নির্ভীক হৃদয় বিঘ্ন-বাধা দেখিয়া আনন্দিত হইত, ভাবিতেন যে—উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু আছে। বিঘ্ন দেখিয়া হটিয়া যাওয়া, ভয় দেখিয়া ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতাবশতঃ সঙ্কল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, তিনি কাপুরুষতা ও নিজের শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে, কি ছোট হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্নবাধা, পাপপ্রলোভন, জীবনের সমস্যা, সকলেরই পথে উপস্থিত হয়; তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এই জন্য—তিনি

বড় ; আর তুমি আমি নীচে পাড়িয়া যাই, এই জন্য—আমরা ছোট। তিনি যে উপরে উঠিয়াছিলেন, তাহারও ভিতরকার কথা, নিজের শক্তি-সামর্থ্যে ও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।

দ্বিতীয় উপাদান, সকল মহাজনের কার্য্যের মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার কার্য্যের মূলে ছিল। তাহা এই, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই বিশ্বাস। অর্থাৎ ইহা অনুভব করা যে, এই ভৌতিক জগৎ যেমন দুর্ভেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তেমনই মানবের জীবন ও মানবসমাজ দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্ম-নিয়মের দ্বারা শাসিত। এক মহাশক্তি বা মহতী ইচ্ছা হইতে মানবজীবন ও মানবসমাজ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহতী ইচ্ছা দ্বারা বিধৃত হইতেছে, সেই ইচ্ছা ও সেই শক্তির দ্বারা মঙ্গলের পথে নীত হইতেছে। "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" তিনি সেতুস্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। মানবজীবন তাঁহারই দ্বারা বিধৃত এবং তাঁহারই শাসনাধীন ; সুতরাং এখানে ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুভব করি, তাহার অনুসরণ করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ; ফলাফল সেই ধর্ম্মাবহ পরমপুরুষের হস্তে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, এই মহৎ ভাব হইতেই সকল ধর্ম্ম-বীরের বীরত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায়ের বীরত্বও ইহা হইতে উঠিয়াছিল ; সে বীরত্বের কথা যখন স্মরণ করি, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি উপাদান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা আপনার জীবনকে ও শক্তি-সকলকে ঈশ্বরের ন্যস্ত সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করা। আমার মানসিক বৃত্তি, দেহের বল, লৌকিক ও সামাজিক সুবিধা, সমুদয়ই সেই মঙ্গল-পুরুষের গচ্ছিত ধন, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে ব্যয় হইবার জন্য, তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধনের

জন্য,—এই ভাব। ইহা ব্যতীত কোনও মহাজনের জীবন মহৎ হয় নাই ; কোনও মানুষ এ জগতে মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। সকল মহামনা মানুষের জীবনে এক অপূর্ব্ব বাধ্যতার ভাব দেখা গিয়াছে। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া কাজ করাইয়া লইয়াছে, বাধ্য করিয়া খাটাইয়াছে ; তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা না করিয়া পার নাই। সেণ্টপল একস্থলে বলিয়াছেন, "The love of Christ constraineth me." অর্থাৎ যীশুর প্রেম আমাকে বাধ্য করিতেছে। কেবল পলই যে এই প্রকার বাধ্যতা অনুভব করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রত্যেক মহামনা মানুষ এইরূপ বাধ্যতা অনুভব করিয়াছিলেন। এই যে জীবনের ভিতরে দায়িত্ব-জ্ঞান, এই যে অস্ফুট কিন্তু নিরন্তরোদ্বেলিত বাধ্যতাজ্ঞান, ইহা ভিন্ন কে কবে বড় হইয়াছে ? কে কবে বজ্রমুষ্টিতে কার্য্য করিয়াছে ? কে কবে বীরের ন্যায় সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে ? রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন, 'যে যা বলে বলুক, যে যা করে করুক, লোকে দেখুক আর না দেখুক, আমার জীবনের পূর্ণতা আমি লাভ করি ; আমার প্রতি যে কার্য্যভার পড়িয়াছে, তাহা আমি সাধন করিয়া যাই।' তুমি আমি যদি বিশ্বাসে বা প্রেমে এতটা ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে, তুমি আমিও বীরের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে পারিতাম। এই দায়িত্ব-জ্ঞান হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ ফুটিয়াছিল। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, তাহা পূর্ণাঙ্গ না করিয়া ছাড়িতেন না ; যাহা করিবেন বলিয়া ধরিতেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। বালকের ন্যায় লঘুভাবে কাজে হাত দেওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তৎপরে যেমন তাঁহার ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, তেমনই মানবের প্রতি উদার প্রেম ছিল। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে,

ঈশ্বর-প্রীতি অপেক্ষা মানব-প্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্য্যের চালক ও পোষক ছিল।

এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব হইতেই, তাঁহার উদার সার্ব্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমগ্র জগতের দুঃখ সহিতে পারেন নাই, সেই জন্য দুষ্কর নরসেবা-ব্রতে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের একটি মূলমন্ত্র উঠিয়াছিল, সেটি 'The service of man is the service of God' অর্থাৎ মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এইটি সর্ব্বদা তাঁহার মুখে শুনা যাইত। তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার মানব-প্রীতি অপরাপর অনেক মহাজনের মানব-প্রীতির ন্যায় সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে নাই। তিনি যে সর্ব্বদেশের ও সকল জাতির নরনারীর দুঃখে দুঃখী হইতেন, সকল দেশের রাজনীতির প্রতি এত দৃষ্টি রাখিতেন, যে কোন জাতির কোনও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইলে যে এত আনন্দিত হইতেন, তাহার ভিতর-কার কথা এই ছিল যে, তাঁহার প্রেম সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

(৺শিবনাথ শাস্ত্রী)

নবীন সন্ন্যাসী।

রাজকুমার সিদ্ধার্থের হৃদয়-মধ্যে যে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল, কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হইল না। সংসারে থাকিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না; কিন্তু পিতার স্নেহময় প্রাণে কি প্রকারে আঘাত করিবেন, মাতৃসমা গৌতমীর স্নেহবন্ধন কিরূপে ছিন্ন করিবেন, পতিপ্রাণা গোপাকে কি বলিয়া জন্মের মত ছাড়িয়া যাইবেন, এই চিন্তা তাঁহাকে

নিদারুণ ক্লেশ দিতেছিল। এক একবার মন দৃঢ় হইয়া উঠে, আর পিতার অপার স্নেহ—তাঁহার করুণ বদন—মনে উঠিয়া, সকল দৃঢ়তা বিলীন করিয়া ফেলে। কতবার সংসার পরিত্যাগের জন্য তাঁহার মন দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠিল, কিন্তু গোপার কথা যখন মনে উঠিত—যে গোপা স্বামী ভিন্ন আর কাহাকে জানে না, যে গোপা স্বামীকেই একমাত্র জীবনের আশ্রয় করিয়াছে, যে গোপা একদিনের জন্যও কখন কোন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে নাই, যে গোপা ভালবাসায় গঠিত, সেই গোপার কথা যখন মনে উঠিত, তখন সকল সঙ্কল্প আকাশে মিশিয়া যাইত। কিন্তু অপর দিকে এ জীবনধারণ দুর্ব্বহ ভারবোধ হইয়া পড়িল। এ পাপপ্রবণ প্রাণ লইয়া বাস করা দুরূহ হইয়া উঠিল. দেশের মধ্যে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের রাজত্ব দেখিয়া, নরনারীর প্রাণ দিবানিশি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে দেখিয়া, অসার বস্তু লইয়া কোটি কোটি মানব দিন-যামিনী যাপন করিতেছে দেখিয়া, কুমারের প্রাণ দারুণ দুঃখে পরিতপ্ত হইত এবং মুক্তির উপায় চিন্তনে এবং নরনারীর দুঃখ বিমোচনে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত, সকল সুখ বিসর্জ্জন করিয়া আপনার ও পরের প্রকৃত হিতের জন্য পৃথিবীর সকল দুঃখ নিজের মস্তকে বহন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইত।

জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য সিদ্ধার্থের হৃদয়-মধ্যে এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, গোপা এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ এ সংবাদ শ্রবণমাত্র বলিয়া উঠিলেন, "আর একটি বন্ধন উপস্থিত হইল।" পুত্রমুখ-নিঃসৃত এই কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, "আমার পৌত্রের নাম রাহুল হউক।" সিদ্ধার্থ দেখিলেন, যে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ দিবানিশি আকুল. সেই

সংসারের আর একটি নূতন বন্ধন উপস্থিত হইল; আর কিছুদিন সংসারে বাস করিলে, আরও কত বন্ধন উপস্থিত হইবে—এই ভাবিয়া শীঘ্র সংসার-ত্যাগের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পুত্রের জন্ম সংবাদে কুমার বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া রাজভবনে গমন করিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, নগরী শুভসংবাদে উৎসব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শাক্যগণ জয়োল্লাসে চতুর্দ্দিক্ কম্পান্বিত করিতেছে।

রাজকুমার আমোদ-তরঙ্গ ভেদ করিয়া একেবারে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। কলকণ্ঠা রমণীগণের গীত-ধ্বনি, বীণার মধুর বাদ্যধ্বনি, বিহঙ্গের কলধ্বনি তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত মনকে প্রশান্ত করিতে কত প্রয়াস পাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কুমারের মন কিছুতেই আত্মসঙ্কল্প বিস্মৃত হইল না। তিনি জীবনের মহাব্রত নিরীক্ষণ করিয়াছেন, কে তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করে? স্বর্গীয় বলে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, কে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে? তিনি সংসারত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু পিতার অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলে পিতার করুণ প্রাণে দারুণ শেল বিদ্ধ হইবে, এই ভাবিয়া অশ্রুজলে মুখমণ্ডল অভিষিক্ত করিয়া পিতার নিকট মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

পুত্রবৎসল শুদ্ধোদন পুত্রের নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া হতচেতন হইলেন। বহুক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে অর্দ্ধস্ফুটভাষে বলিলেন, "প্রিয়বৎস! সংসার-ত্যাগে তোমার কি প্রয়োজন, তোমার কিসের দুঃখ, সংসারে তোমার কিসের অভাব? এ বয়সে কি যোগীর বেশ শোভা পায়? পুষ্পাঘাতে যে শরীর মলিন হইয়া যায়, সে শরীরে কি ভিখারীর পরিধেয় সহ্য হয়? প্রাণাধিক! তোমাকে পাইয়া আমি হাতে স্বর্গ লাভ করিয়াছি, তোমাকে পাইয়া আমি প্রাণসমা প্রেয়সীর

মৃত্যু যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছি, তুমি আমার দুঃখের ধন—অমূল্য রত্ন। জীবন-সর্ব্বস্ব ধন! আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" এই বলিতে বলিতে রাজার বাক্যরোধ হইল। অজস্রধারে অশ্রুজল গণ্ডদেশ ভাসাইয়া মেদিনী সিক্ত করিতে লাগিল। সিদ্ধার্থও পিতার দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশান্ত হইলে, উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে রাজা বলিলেন, "কেন তুমি সংসারত্যাগী হইবে, বল? তুমি যাহা চাও, তাহাই দিব। আমাকে, এই রাজ্যকে, এই রাজকুলকে অনুগ্রহ কর, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।" কুমার বলিলেন, "আমায় চারিটি বরদান করুন। যদি আমার ভিক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন, আমি গৃহে থাকিব, নতুবা আমার সংসারে থাকিবার আর উপায় নাই। আমার ভিক্ষা এই, 'জরা যেন আমাকে আক্রমণ না করে, ব্যাধি যেন কখনও স্পর্শ করিতে না পারে, মৃত্যু যেন নিকটে না আসে এবং আমার আয়ু যেন অমিতু হয়।' জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু-ভয়ে আমি শঙ্কিত হইয়াছি। কি করিলে, ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই বলুন; আমি গৃহত্যাগী হইব না।" রাজা পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্ত হৃদয়ে বলিলেন "জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু-ভয় হইতে রক্ষা করি, আমার এমন শক্তি কি আছে? কল্পান্ত তপস্যাকারী ঋষিগণও ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।" তখন কুমার বলিলেন "যদি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারেন, তবে আমায় আর একটি বর দিন। তৃষ্ণাসম্ভূত পুত্র-স্নেহ ছিন্ন করুন, জগতের দুঃখ-মোচনে এ জীবন উৎসর্গ করিতে আমাকে অনুমতি দিন।" পুত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন আর্ত্তস্বরে চতুর্দ্দিক্ শোকার্ত্ত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুত্রের গলদেশ ধরিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কত ক্রন্দন করিলেন। কিন্তু সকলই বিফল হইল। রাজার সেই রোদনে

পাষাণও বিগলিত হয়, কিন্তু সিদ্ধার্থের মন টলিল না। রাজার বিলাপ-বচনে সিদ্ধার্থের আয়তলোচন জলধারা বিসর্জ্জন করিল, কিন্তু তাঁহার মন ফিরিল না। যখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন নরপতি শোকবিদগ্ধ-হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে পুত্রকে উদাসীন হইতে অনুমতি দিলেন। ধর্ম্মলাভের জন্য পুত্রের অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া ধার্ম্মিক পিতা একমাত্র পুত্রকে বনবাসী হইতে অনুমতি দিলেন। সিদ্ধার্থ ভক্তির সহিত পিতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে গমন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে শয়ান হইলেন।

এদিকে শুদ্ধোদন পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এক একবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, আবার চেতনা পাইয়া বিলাপধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ করেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে আমোদ কোলাহল থামিয়া গেল, নগরী বিষাদ-মূর্ত্তি ধারণ করিল। শাক্যগণ সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "মহারাজ! নিশ্চিন্ত হউন, কুমারকে আমরা রক্ষা করিব। তিনি একাকী, আমরা শতসহস্র। তাঁহার কি শক্তি, গৃহ হইতে পলায়ন করেন?" পঞ্চশত শাক্যবীর সশস্ত্র হইয়া কুমারের রক্ষার জন্য দম্ভনাদ করিল। সে আস্ফালন শ্রবণ করিয়া, শুদ্ধোদনের উদ্বেলিত প্রাণ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। শাক্যবীরগণ কেহ গজে কেহ অশ্বে আরোহণ করিয়া নগরের চতুর্দ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইল। কুমার গৃহত্যাগী হইবেন, এ সংবাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। মহাপ্রজাবতী গৌতমী চেটীদিগকে আহ্বান করিলেন। শত প্রদীপ প্রজ্বালিত হইল, অন্ধকার স্থান দিবালোকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। দাস দাসী সকলেই প্রতিজ্ঞা করিল, সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া কুমারকে রক্ষা করিবে। গৃহ ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া উজ্জ্বল দীপমালা ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া গেল। রজনী যখন দ্বিপ্রহরা, যখন জীবজন্তু নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে

বিশ্রাম করিতেছিল, রজনীর বিশাল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কেবল নিশাচর প্রাণীদিগের বিকট গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল, তখন সিদ্ধার্থ ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে উপবেশন করিলেন। তিনি জীবনের লক্ষ্য স্মরণে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, প্রাণিবৃন্দকে তৃষ্ণার দুশ্ছেদ্য নিগড়-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন, অজ্ঞান-তিমিরাবৃত সংসারী লোকের অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত করিয়া ধর্ম্মালোকে তাহাদিগের জ্ঞান-চক্ষুর বিকাশ করিবেন, গর্ব্বস্ফীত জনগণের অহঙ্কার বিনাশ করিবেন, এবং সংসার-বাসনা তিরোহিতকারী নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন! জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; আত্মবিসর্জ্জনের দুর্জ্জয় বাসনা, পাপের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, ধর্ম্মের জন্য অজেয় তৃষ্ণা, জীবের প্রতি অপার করুণা উদ্দীপ্ত হইয়া, তাঁহাকে অভিভূত করিল। জীবনের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর! কে জীবের দুর্দ্দশা মোচন করিবে? কি উপায়ে জীবের দুর্দ্দশা ঘুচিবে? এই জীব-শরীর কি অসার! শরীরের অভ্যন্তর অশ্রু-স্বেদ-মূত্র-পুরীষ-পরিপূর্ণ। এই অসার শরীরের জন্য মানুষ কি পাপেই না মগ্ন হয়! ইহা ভাবিতে ভাবিতে জীবের দুঃখে ম্রিয়মাণ সিদ্ধার্থের গণ্ডদেশ বহিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগণ জীবের পাপবিনাশের জন্য আত্ম-বলিদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সুমহৎ জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া এখন সংসারত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রজনী চন্দ্রালোকে ভাসিতেছে। জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই, সকলেই নিদ্রিত; কেবল সুদূরে অনন্ত আকাশে চন্দ্রমা ও নক্ষত্রগুলির নিদ্রা নাই, তাহারা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। সিদ্ধার্থ অনিমেষ-লোচনে অসীম আকাশে দৃষ্টি করিয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গেলেন; পৃথিবীর জন্য তাঁহার জীবন—এই সত্য উপলব্ধি করিলেন।

তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারসন্নিকটে সতর্ক হইয়া কে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আহ্বান করাতে সারথী ছন্দক উপস্থিত হইল। তাহাকে বলিলেন, "এই রজনীতেই আমি গৃহত্যাগ করিব। তুমি অশ্ব প্রস্তুত কর। বাল্যকাল হইতে যে জন্য আমার প্রাণ ক্রন্দন করে, অদ্য তাহা লাভ করিব। ছন্দক! বিলম্ব করিও না, অশ্ব প্রস্তুত করিয়া আন।"

রাজকুমারের নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া, ছন্দকের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল—তাহার আর বাক্য সরিল না। বহুকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিল, "রাজকুমার! এমন নিদারুণ কথা বলিবেন না, এ মৃণাল-কোমল দেহ, এ শশাঙ্ক-বদন, এ কমল-দল-শোভন লোচন, এ কি তপস্যার যোগ্য? আপনি এ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করুন, আমাদিগের জীবন রক্ষা করুন।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "ছন্দক! কে সাধ করিয়া এমন প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী, প্রাণসম পুত্র, স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? সংসারে আমার মতি নাই, নানা ভোগবিলাসে পরিবেষ্টিত থাকিয়া আমি তাহাতে নির্লিপ্ত ছিলাম, নানা স্বখৈশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিয়াও আমার মন তৃপ্ত হইত না। যাহাতে মন তৃপ্ত নয়, তাহা লইয়া কেন এ জীবন যাপন করিব? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এ জীবন তপস্যায় নিযুক্ত করিব; এ চেষ্টায় যদি শরীর ধ্বংস হয়, তাহাও শ্লাঘ্য মনে করি। জীবের দুঃখ আর সহিতে পারি না। ছন্দক! গৃহত্যাগে তুমি আমার সহায় হও, তপস্যার বিঘ্ন করিও না।"

ছন্দক বলিল, "দেবেন্দ্র বা মনুষ্যেন্দ্র হইবার জন্যই লোকে দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হয়। আর্য্যপুত্রের তাহার কিছুরই অভাব নাই। বহুজনসমাকীর্ণ, বহু ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ এই রমণীয় নগর, নানাবিধ পুষ্প-

ফল-মণ্ডিত ও বিহগ-কূজিত প্রমোদ উদ্যান, কুমুদ-কহ্লার পরিশোভিত সরোবর, কৈলাসপর্ব্বত-সদৃশ মহাপ্রাসাদ, রত্নকিঙ্কিণী-জাল-সমীরিত অন্তঃপুর, বিবিধ বাদিত্র-সংযোগে হাস্যলাস্য-ক্রীড়িত অমিত সুখের উপচার, এ সকল থাকিতে আপনার তপস্যার প্রয়োজন কি? দেবপুত্রের এমন তরুণ যৌবন, কোমল শরীর, কৃষ্ণকেশ। এখন ক্ষান্ত হউন, বৃদ্ধবয়সে তপস্যা করিবেন।"

কুমার বলিলেন, "বাসনা-সম্ভোগ অনিত্য, ধর্ম্মনাশকর। ইহা চপলার ন্যায় চঞ্চল, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, পরিণামে বেদনাত্মক, ইহা মায়ামরীচি সদৃশ; যে ইহা দ্বারা প্রলুব্ধ, দুঃখ ভোগে তাহার জীবন পর্য্যবসিত হয়। জ্ঞানিগণ সভয়ে ইহা পরিত্যাগ করেন, নির্ব্বোধেরাই ইহার পরিচর্য্যা করে। আর আমি ইহাতে জড়িত হইব না। এই ভবসমুদ্র নিজে উত্তীর্ণ হইয়া, জগৎকে উত্তীর্ণ হইবার পথ প্রদর্শন করিব। নিজে মুক্ত হইয়া চরাচর বিশ্বের মুক্তির পথ অনর্গল করিব।"

সিদ্ধার্থের কথা শ্রবণ করিয়া ছন্দক শোকদগ্ধহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "দেব! তবে কি সংসারত্যাগে আপনি কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন?"

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "অটল অচলের ন্যায় আমার প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ়! মোক্ষ-পথ নির্দ্ধারণে জীবন যৌবন সকলই উৎসর্গ করিয়াছি। দিঙ্‌মণ্ডল সন্ত্রস্ত করিয়া অশনি যদি আমার মস্তকে পতিত হয়, হিমালয়শৃঙ্গ স্খলিত হইয়া যদি আমার গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করে, জলরাশি সংক্ষোভিত হইয়া যদি মহাপ্লাবন উপস্থিত করে, তথাপি আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইবে না। অতএব আমাকে আর প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইও না। ছন্দক, তোমাকে অনুনয় করি, এ সুমহৎ কার্য্যে তুমি আমার সহায় হও।" ছন্দকের সম্মুখে মানব-জীবনের নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, সে দ্বার দিয়া

একটি নূতন রাজ্য তাহার নয়নপথে প্রকাশিত হইল। সে রাজ্যের অসীমতা, সে রাজ্যের প্রভাব ও শোভা দেখিয়া, সে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও নীরব হইল। সে অপূর্ব্ব অদৃষ্ট রাজ্যের নূতন বার্ত্তা জগতে আনয়ন করিবার জন্য সিদ্ধার্থ এ অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর সংসারসুখ পরিবর্জ্জন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা জীবনের সদ্ব্যয় আর কি হইতে পারে, এই চিন্তা করিয়া ছন্দক বলিল, "প্রভুর আজ্ঞাপালনে যদি এ জীবন সমর্পণ করিতে হয়, দাস তাহাতেও কুণ্ঠিত নহে।" দ্রুতগামী অশ্ব প্রস্তুত করিবার জন্য ছন্দক অশ্বালয়ে গমন করিল। ছন্দক বিদায় হইলে, সিদ্ধার্থ ভাবিলেন, জন্মের মত ত সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম, গমনকালে একবার নবসঞ্জাত পুত্র ও প্রাণাধিকা গোপার মুখ দর্শন করিয়া যাই; মনে মনে এই চিন্তা করিয়া ধীর পদসঞ্চারে তিনি সূতিকাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন, প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, সপ্তদিনের শিশু গৃহ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে, গোপা আলুলায়িত কেশে একহস্ত সন্তানের মস্তকতলে রাখিয়া অপর হস্তে তাহাকে বক্ষঃস্থলে জড়াইয়া পুষ্পশয্যায় বিঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন! সন্তানটি জন্মের মত একবার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন— এই শেষ বাসনা, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না। পাছে গোপার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, পাছে গৃহত্যাগের এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়, এই ভয়ে শেষ আশা চরিতার্থ হইল না।

সিদ্ধার্থ স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে কত বিসংবাদী ভাব তাঁহার মনের উপর দিয়া চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে দুর্জ্জয় বলপ্রয়োগে হৃদয় হইতে স্নেহের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিলেন, উন্মাদের ন্যায় দ্রুত পদবিক্ষেপে নিমেষমধ্যে অন্তঃপুর-সীমা অতিক্রম করিয়া উন্মনস্কভাবে ছন্দকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে ছন্দক অমিত-

তেজ তড়িদ্‌গামী কণ্ঠক-নামক সুবৃহৎ সুশুভ্র অশ্ব সজ্জিত করিয়া উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ শশব্যস্তে এক লম্ফে অশ্বোপরি উপবিষ্ট হইলেন। নগর-দ্বারে শত প্রহরী জাগরিত আছে—এই ভয়ে তিনি নীরবে নগর-প্রাচীরাভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন,—ছন্দকও নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল। মহাবল অশ্ব একলম্ফে সমুন্নত প্রাচীর পার হইয়া নগরের বাহির হইল। যে নগরে স্নেহময় পিতা, পতিপ্রাণা ভার্য্যা, নবজাতপুত্র, স্নেহময়ী মাতৃসমা গৌতমী, জীবনের লীলাস্থান পড়িয়া রহিল, সে নগরের প্রতি শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সিদ্ধার্থ অশ্ববেগ সংবরণ করিয়া একবার থামিলেন, তাঁহার হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিয়া প্রলোভন তাঁহাকে অভীপ্সিত ব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। রাজ্য-সুখের প্রলোভন তাঁহার হৃদয়মধ্যে উদিত হইল। সিদ্ধার্থ ভীমবলে সে প্রলোভন পরাজয় করিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য তৃষিত, নরনারীর দুঃখে বিদগ্ধ, তাই এ প্রলোভন সহজে অতিক্রম করিলেন।

সিদ্ধার্থ ইঙ্গিত করিলেন: অশ্ব নক্ষত্রবেগে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। পথে শতবাধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া অশ্ব প্রধাবিত হইল—শাক্যরাজ্য পার হইয়া বৈশালী, বৈশালী রাজ্য পার হইয়া মল্ল রাজ্যে প্রবেশ করিল। কত দেশ, কত জনপদ পার হইয়া অবশেষে রজনী-প্রভাতকালে অশ্ব কপিলবস্তু হইতে পঞ্চত্বারিংশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী অনোমা-নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদী উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধার্থ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। নদীর রজতবর্ণ সিকতাময় বেলাভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলিলেন "ছন্দক! আমার গাত্রাভরণ ও অশ্ব লইয়া তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া যথেচ্ছ স্থানে চলিয়া যাই।" ছন্দক বলিল, "প্রভু, আমিও সন্ন্যাসী হইয়া

আপনার অনুবর্ত্তন করিব।” ছন্দক কত অনুনয় করিল, কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি একে একে গাত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া ছন্দকের হস্তে দিলেন। ছন্দক নীরবে সজলনয়নে এ হৃদয়বিদারকদৃশ্য দেখিতে লাগিল। ‘সুচিক্কণ ভ্রমরকৃষ্ণ দীর্ঘ কেশ-জাল সন্ন্যাসীর শোভা পায় না।’ এই চিন্তা করিয়া হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। নিজপরিহিত রত্নজড়িত বারাণসীবস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন, ‘এ মহামূল্য বস্ত্র ভিক্ষুকের উপযুক্ত নয়, অতএব ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।’ চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলেন, এক ব্যাধ শতচ্ছিদ্র জীর্ণ কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া নদীতীরে শিকার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাহার বস্ত্রের সহিত নিজবস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিলেন। ব্যাধ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বস্ত্র বিক্রয় করিবার জন্য নগরাভিমুখে চলিয়া গেল। যাঁহার শরীর সর্ব্বদা মণিমুক্তায় জড়িত হইয়া থাকিত, যাঁহার কেশের পারিপাট্য-সাধনে কত বিলাস-সামগ্রী, কত পরিচারক সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, যিনি দিবসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশ পরিধান করিতেন, যিনি যানারোহণ ব্যতীত কখনও একপদ অগ্রসর হন নাই, অনবদ্য-বপুঃ দিব্যকান্তি সুকোমলশরীর, এমন রাজপুত্র অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন, কেশপাশ ছেদন করিলেন, সুকোমল পদ উলঙ্গ করিলেন, কাযায়বস্ত্র তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া পরিধান করিলেন! হস্তে ভিক্ষাপাত্র, কটিদেশে রজ্জুর কটিবন্ধ গ্রহণ করিয়া, নবীন রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইলেন! হা পরমেশ্বর! এ সংসারে কাহাকে কি বেশে সাজাও, কে বলিতে পারে? পরমেশ্বর! তোমার ইচ্ছার গভীর মর্ম্ম কে উদ্ঘাটন করিবে?

রাজকুমারের সন্ন্যাসবেশ দর্শন করিয়া ছন্দক বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। কণ্ঠক রাজকুমারের সুদীন বেশ দর্শন করিয়া

চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল! পিতার অতুল বিভব ও রমণীয় প্রাসাদ, অনুপম ক্ষমতা, রূপবতী গুণবতী ভার্য্যা, সপ্তদিনের পুত্র পশ্চাতে রাখিয়া সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়সে সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসী হইলেন। সেই নির্জ্জন নদী-সৈকতে সন্ন্যাসিবেশে সজ্জিত হইয়া সিদ্ধার্থ বলিলেন, "ছন্দক! এই আভরণ লইয়া পিতাকে দিও। সকলকে বলিও, আমার জন্য যেন কেহ দুঃখ না করে। পিতাকে বলিও—আমি অকৃতজ্ঞ নহি, কোন সাংসারিক দুঃখে বিরক্ত হইয়া আমি সন্ন্যাসী হই নাই। দুঃখ শান্তির উপায় নির্দ্ধারণ এবং জীবের দুর্গতি বিনাশ করিতে আমি সন্ন্যাসী হইলাম। যখন আমার আশা সফল হইবে, তখন পিতার নিকট ফিরিয়া যাইব, এবং সকলের নয়নাশ্রু বিমোচন করিব। অতএব তুমি শীঘ্র ফিরিয়া গিয়া আমার উৎকণ্ঠিত পিতাকে এই সংবাদ দিয়া সান্ত্বনা কর। অধিক বিলম্ব হইলে, মহাদুঃখে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। ছন্দক! আর বিলম্ব করিও না, আমার জন্য খেদ করিও না, তুমি শীঘ্র ফিরিয়া যাও।"

ছন্দক অশ্ব লইয়া বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিল। যতদূর দৃষ্টি যায়, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল; যখন আর দেখা গেল না, তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চতুর্দ্দিক্ শোকসাগরে ভাসাইয়া কপিলবস্তু অভিমুখে ফিরিয়া চলিল। শ্মশানে মৃতপুত্র দাহ করিয়া পিতা যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া আসেন, ছন্দকও আজ সেইরূপে রোদন করিতে করিতে চলিল। বর্ণিত আছে, বনের পশু কণ্ঠক প্রভুর শোকে ভগ্ন হৃদয় হইয়া পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

কুমার গৃহ হইতে চলিয়া গেলে অন্তঃপুরিকাগণ কুমারকে দেখিতে না পাইয়া, গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইল। অন্তঃপুরের সকল স্থান খুঁজিল, কিন্তু কুমারকে পাইল না।

তাহারা নিরাশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল, গভীর নিশীথে তাহাদিগের বিলাপধ্বনি নিদ্রিত প্রাণিবৃন্দকে চমকিত করিয়া জাগরিত করিল। তাহা শ্রবণ করিয়া, শুদ্ধোদন শঙ্কাকুল হৃদয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং অন্তঃপুরে কিসের শব্দ, জানিবার জন্য শাক্যদিগকে প্রেরণ করিলেন। শাক্যগণ দ্রুতপদে ফিরিয়া গিয়া বলিল "কুমার অন্তঃপুর হইতে কোথায় গিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছে না।" ইহা শুনিয়া শুদ্ধোদনের প্রাণ উড়িয়া গেল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাহাকেও নগরদ্বার রক্ষা করিতে, কাহাকেও নগরমধ্যে কুমারের অন্বেষণ করিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, অনুসন্ধানার্থ নূতন লোক পাঠাইলেন। নগরের কোনও স্থান খুঁজিতে অবশিষ্ট রহিল না; কিন্তু কোন স্থানেই কুমারকে পাওয়া গেল না। তখন রাজা চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, "কুমারকে না পাইলে গৃহে ফিরিও না।" অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দিকে বিদ্যুদ্‌-বেগে ছুটিল। পর্ব্বতকাননে প্রবেশ করিয়া কুমারের অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কুমারকে প্রাপ্ত হইল না। তাহারা দেশবিদেশে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপুত্রের অন্বেষণ করিল, কোথাও তাঁহাকে পাইল না। বহু অনুসন্ধানের পর একদল অশ্বারোহী দূর হইতে দেখিল, এক ব্যক্তি কুমারের বস্ত্রাদি মস্তকে করিয়া আসিতেছে। এ ব্যক্তি বস্ত্রলোভে কুমারের প্রাণবধ করিয়াছে, এই মনে করিয়া তাহারা ঐ ব্যক্তিকে বন্দী করিল। তাহারা ক্ষণকাল পরে দেখিল, ছন্দক কুমারের আভরণ লইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আসিতেছে। তাহার নিকটে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বন্দীকে ছাড়িয়া দিল। যখন অশ্বারোহিগণ শুনিল, কুমার সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তিনি আর কখনও গৃহে ফিরিবেন না, তখন ছন্দকের সহিত বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া চলিল।

ছন্দক আভরণ লইয়া, অন্তঃপুরে যেখানে রাজা উন্মত্তপ্রায় হইয়া বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আভরণ দর্শন করিয়া শুদ্ধোদন ও গৌতমী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সে ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া চারিদিক্ হইতে রমণীগণ দৌড়িয়া আসিল এবং ভূমিতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। গৌতমীর হৃদয়-বিদারক বিলাপ শ্রবণ করিয়া, শুদ্ধোদন মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহুযত্নে তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল। চেতনা পাইয়া অৰ্দ্ধস্ফুট-ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হা অন্ধের যষ্টি! হা বৃদ্ধের সম্বল! আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেলে? হা পুত্র! আমার আর কেহ নাই, আর যে ক্লেশ সহ্য হয় না। হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যায়!" এই বলিতে বলিতে পুনরায় মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে রাজা মুহুর্মুহু চেতনা-হীন হইতে লাগিলেন। এদিকে গৌতমীর বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে আকুল হইয়া উঠিল, রমণীগণের কোমল প্রাণে দুঃখাভিঘাত অসহ্য হইয়া পড়িল, শাক্যগণ অবিরলধারে অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিল। প্রজাগণ হাহাকার ধ্বনিতে চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিল! রাজপুরী বিষাদমূর্ত্তি ধারণ করিল। অবশেষে শুদ্ধোদন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন, "মহর্ষি কালদেবল বলিয়াছেন, পুত্র বুদ্ধ হইবেন, বুদ্ধ হইয়া জগতের দুঃখ-শান্তির উপায় করিয়া দিবেন। পুত্র জগতের দুঃখমোচনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সৎকার্য্য আর কি হইতে পারে? অতএব আর কেহ তাঁহার জন্য খেদ করিও না; তাঁহার জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হউক, সকলে এই আশীর্ব্বাদ কর।" গৌতমী শোকাবেগ সংবরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, নীরবে সরোবরতীরে গমন করিয়া কুমারের আভরণ তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। স্মৃতিচিহ্ন অতল জলে মুহূর্ত্তমধ্যে ডুবিয়া গেল! কিন্তু স্মৃতি অপসারিত হইল না! সে হৃদয়-

কন্দরে আবদ্ধ থাকিয়া হুতাশনের ন্যায় দিবানিশি জ্বলিতে লাগিল। গোপার কথা আর কি বলিব? কুমার চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বজ্রাহতের ন্যায় তাঁহার স্মৃতি বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল, তাঁহার চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু মুখ হইতে বিলাপ বাক্য স্ফুরিত হইল না, জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। যে শোক এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল, ছন্দকের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তাহা উথলিয়া উঠিল। বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া গোপা সুদীর্ঘ কেশদাম ছিন্ন করিলেন, একে একে গাত্রাভরণ খুলিয়া ফেলিলেন, রাজবস্ত্র দূরে ফেলিয়া একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। এই দিন হইতে গোপা ভূমিশয্যা সার করিলেন, উপাদেয় দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া, কখনও একাহার, কখনও অনশনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই দিন হইতে গোপা অঙ্গরাগ পরিত্যাগ করিয়া, আপনার লাবণ্য ভস্মে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। গোপা স্বামী থাকিতে বিধবা হইলেন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। স্বামী সকল ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, পতিব্রতা কামিনী আর কি করিবেন? তিনিও যৌবনে সন্ন্যাসিনী হইলেন। গোপার সন্ন্যাসিনী বেশ দর্শন করিয়া, আত্মীয় স্বজনের প্রাণ দুঃখে বিদীর্ণ হইল—নীরব প্রকৃতিও যেন মুখ ফুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। অঞ্জনরাজ আসিয়া গোপাকে কত সান্ত্বনা করিলেন; কত অনুরোধ করিলেন! কিন্তু গোপা সন্ন্যাসিনী-বেশ পরিত্যাগ করিলেন না; অঞ্জনরাজ তাঁহার শোকদগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য দেবদহে লইয়া যাইতে কত প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু গোপা কিছুতেই স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিলেন না। সুকুমার দেহে ব্রহ্মচর্য্যের বিষম ক্লেশ সহিল না। গোপার সকল সুখ জন্মের মত ফুরাইল!

(শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র)

মন্সুরের তত্ত্বজ্ঞান-লাভ।

সাধকপ্রবর মন্সুর নির্জ্জনে যোগ-সাধনে উপবেশন করিলেন; আহার, বিহার, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতি মানব-স্বভাব-সুলভ যাবতীয় ইন্দ্রিয় সম্পর্কীয় কার্য্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন রহিলেন। কেবল সেই একই ভাব, সেই ফল্গু নদীর অন্তঃপ্রবাহ, সেই বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা, সেই ধ্যানস্তিমিতনেত্র !—নীরব ও নিস্পন্দ ! মশক-মক্ষিকাদিগের উপবেশনে দূরে থাক, দংশনেও গাত্র স্পন্দিত নহে। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন দুই দিন করিয়া ক্রমে সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, মাসের পর বৎসর; এইরূপে কত দিন, কত সপ্তাহ, কত মাস, কত বৎসর চলিয়া গিয়া অনন্তকালের গভীর গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইল, জগতের কত স্থানে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, কত মানবের ভাগ্য-চক্রের ঘূর্ণনে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল, কিন্তু মন্সুরের এই ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না, স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ নিরন্তর নিখিলনাথের ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্ট ;—সাধন-সমুদ্রের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইয়া নির্জ্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চল রহিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত সহস্র আনন্দোৎসব, সুমধুর বাদ্যভাণ্ড বা কোনরূপ ভীষণ অনিষ্টপাত হইলেও তদীয় চিরায়ত্ত চক্ষু-কর্ণ ভ্রমেও তদনুসরণে ধাবিত হইত না। ফলতঃ তিনি সংসারের আবিল্য-জাল হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, মায়া-মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অনন্য-চিত্তে খোদার প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। সে প্রেমের মর্ম্ম কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু আগ্নেয়গিরির

গহ্বরাভ্যন্তরে অনলরাশি পরিপূর্ণ হইলে, গিরি সে অগ্নি উদ্গীরণ না করিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারে? পাত্র পূর্ণ হইলে বারি স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আহা! এক দিবস অকৃত্রিম ধার্ম্মিক, প্রেমোন্মত্ত মন্‌সুর প্রেমের পূর্ণ আবেগে অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন—"অনাল্ হক্" (অহং ব্রহ্ম বা আমিই ঈশ্বর)! উঃ কি ভীষণ অধর্ম্মের কথা। কি পাপের কথা!! কি স্পর্দ্ধাজনক অন্যায় উক্তি!!! রক্তমাংসময় নশ্বর মানবে—ইন্দ্রিয়ের অঙ্গুলিসঙ্কেতে চালিত দুর্ব্বল মানবে—জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র মানবে—ঈশ্বরত্বের অধিকার! গোষ্পদে বিশাল বারিনিধির আরোপ! ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ নহে? ভক্তের কি এই উক্তি? কখনই নহে। সকলে ইহা শুনিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় নীরবে চাহিয়া রহিল। এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে এই সংবাদ নগরময় প্রচারিত হইতে আর বাকি রহিল না। যে শুনে সেই স্তম্ভিত, সেই হতচৈতন্য। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। বোগ্‌দাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বসমাজে এই একই কথা—একই বিষয়ের আন্দোলন। কেহ কেহ, "হায়! ধর্ম্মপ্রাণ মন্‌সুর পাগল হইয়াছেন" বলিয়া, শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণ মন্‌সুরের সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভাই! তোমার মনে এই বিকৃতি জন্মিল কেন? তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ? তুমি এক জন পরম জ্ঞানী, তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমাদের অনধিকার-চর্চ্চা ও ধৃষ্টতামাত্র! তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতেছি, সাবধান! জান ত, এ ধর্ম্ম-বিগর্হিত নিদারুণ পাপকথা। এ কথা পুনর্ব্বার উচ্চারিত হইলে, তোমার বিপদ্ উপস্থিত হইবে। এমন কি, ইহাতে তোমার জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব

স্থির হও, যাহাতে এই কুচিন্তা অন্তরং হইতে বিদূরিত হয় এবং চিত্ত প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক ও সচেষ্ট হও। এরূপ উক্তি তোমার পক্ষে,—তোমার পক্ষে কেন, জগতের কোন লোকের পক্ষেই মঙ্গল-জনক নহে। তাই পুনর্ব্বার বলিতেছি, তুমি আপনাকে জগতের শত্রু করিও না, চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন কর।" ইত্যাকার কতই প্রবোধ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। সকলই ব্যর্থ হইল। প্রেমমুগ্ধ মন্সুর এ সান্ত্বনা-বাক্যে ভুলিলেন না।

প্রবহমাণা স্রোতস্বতীর দিগন্তগ্রাসী প্রবল প্রবাহ রোধ করে, কাহার সাধ্য? তিনি নরলোক-দুর্ল্লভ শান্তি সুধাপ্রদ প্রেমপারাবারের গভীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া আছেন, লোকের নিষেধ-বাক্যে সেই চিরসুখের স্থান কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? সুখময় সরলপথ ছাড়িয়া কোন্ ব্যক্তি কণ্টকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করে? শত যত্নেও মন্সুরের মানসিক গতি আর ফিরিল না; সুহৃদ্বর্গের উপদেশ উপেক্ষিত হইল। তিনি উপহাসব্যঞ্জক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং গম্ভীর ভাবে বলিলেন—

"আনামান আহোয়া ওয়ামান্ আহোয়া আমা,
নাহ্নো রুহানে হাললনা বদানা।
ফা এজা আব্সারতানী আবসার তাহু,
ওয়া এজ আব্সার তাহু আব্সার তানা।"

অর্থাৎ আমিই তিনি,—যাঁহাকে আমি চাহি—ভালবাসি; এবং যাহাকে আমি চাহি—ভালবাসি, তিনিই আমি। আমরা দুইটি আত্মা এক দেহে আছি। এই হেতু তুমি যখন আমাকে দেখ, তখন তাঁহাকে দেখিবে, এবং তাঁহাকে দেখ, তখন আমাকে দেখিবে।

ফলতঃ আমাকে দেখিলেই, তোমাদের তাঁহাকে দেখা হইবে।

তোমরা আমাকে জীবনের ভয় দেখাইতেছ কি জন্য? আমার আবার জীবনের আশা কিসের?

আমার কি জীবন আছে? আমি ত ইতিপূর্ব্বেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমি যে মৃত! মৃতের কি পার্থিব ভয় বা জ্বালাযন্ত্রণা আছে, না, কখনও হইতে পারে? অথবা যদি আমার জীবন থাকে, তাহা ত অতি তুচ্ছ পদার্থ! যাহা এই আছে, পর মুহূর্ত্তে নাই, সে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের মূল্যই বা কত? সেই অকিঞ্চিৎকর পদার্থের জন্য আবার ভয় কি? তাহার মমতা—যত্নই বা কি জন্য? ইহা বলিয়া ধর্ম্ম-মদমত্ত মন্‌সুর ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া পুনঃপুনঃ "হক্ হক্ অনাল হক্" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

(শ্রীমোজাম্মেল হক্)

সিংহল।

আমাদের আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির প্রসাদে ভারতসাগরীয় সিংহল দ্বীপটি ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি রামচরিত বর্ণন-প্রসঙ্গে সুললিত ভাষায় ধন-রত্ন-শোভিতা লঙ্কার যে মহতী সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া, উহাকে অমরাবতীর অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া বোধ হয়; এই নিমিত্ত এখনও কেহ কেহ উহাকে স্বর্ণপুরী বলিয়া মনে করেন। এতদ্দেশীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রামায়ণের প্রতি এতই অনুরক্ত যে, অনেকে আত্মীয় বন্ধুর অপেক্ষা রাম, রাবণ ও লঙ্কার বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন! প্রবল-প্রতাপ দশাননের অমরাবতী-নিন্দিত অধিকার-পদ, রমণী-কুলের রত্নভূতা জনকনন্দিনীর

কারাবাস-স্থান, রঘুকুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্রের অসাধারণ বিক্রমের লীলা-ক্ষেত্র প্রভৃতি যে কোন বিশেষণের সহিত সিংহলের উল্লেখ করা যাউক না কেন, তাহাতেই লঙ্কাপুরীর পূর্ব্ব কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়,—রাম-চরিত্রের সুপবিত্র-ভাব মনোমধ্যে জাগরূক হইয়া উঠে। ফলতঃ রামায়ণের আখ্যায়িকা-সমূহ হিন্দুসন্তানের চরিত্রগঠনের প্রধান উপাদান, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জন্য অনেকে নিজ নিজ পুত্রগণকে বিদ্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতে রামায়ণের সুমধুর শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতে শিক্ষাদান করেন।

কিন্তু সিংহলের আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই তাদৃশ অভিজ্ঞ নহেন। এই জন্য এখনও আমাদের দেশের কোন কোন অশিক্ষিত ব্যক্তির বিশ্বাস, সিংহলের অধিবাসীরা রাক্ষস। কবির কল্পনা প্রসূত কৌতুককর উক্তি সকল কেহ কেহ বাস্তবিক বলিয়া মনে করেন। লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধ্যাদি প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগের প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কবি-গুরু রত্নাকর কল্পনার প্রতিভায় যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই এতদ্দেশীয় সাধারণ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ফলকে অবিকৃতভাবে প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। লঙ্কার পরিমাণ ও দূরত্বাব সম্বন্ধেও অনেকের ঐরূপ ভ্রম হইতে পারে। লঙ্কার চতুষ্পার্শ্বে লক্ষ-যোজন বিস্তৃত সমুদ্র,—কবির এইরূপ উক্তি, মহোদধির বিশালতা-মাত্রের পরিচায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু সমগ্র ভূমণ্ডলের পরিধি-পরিমাণ, কিঞ্চিদূন পঞ্চবিংশতি সহস্র মাইল। এই দ্বীপের দৈর্ঘ্য দুই শত সপ্ততি মাইল মাত্র, বিস্তার দুই শত চারি মাইলের অনধিক এবং পরিমাণফল চতুর্বিংশতি সহস্র ছয় শত বর্গ মাইল।

এখানে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ এই তিন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই বাস করে। তন্মধ্যে বৌদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের সংখ্যাই অধিক।

প্রসিদ্ধ রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়ে বহুসংখ্যক পুণ্যব্রত বৌদ্ধ ভিক্ষু তিব্বত, তাতার, চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি নানাদেশে অহিংসা-ধর্ম্মের প্রচারার্থ প্রেরিত হন। কপিলবস্তুর রাজকুমার ভোগসুখের অসারতা এবং পৃথিবীর দুঃখময় ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, সযত্নে ও সন্তর্পণে ভারতীয় সরস উর্ব্বর ক্ষেত্রে যে অহিংসা-পাদপের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, মহাপ্রভাবশালী ধর্ম্মবীর অশোক নরপতি স্বকীয় মহিমায় তাহাকে সংবর্দ্ধিত ফলপুষ্পে সুশোভিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু দ্বারা বিপন্ন এই নরলোকে সাম্য ও মৈত্রীভাবের উদ্দীপক উদার উপদেশের মহিমা অশোকের সময়েই এই আর্য্যভূমি হইতে উচ্ছলিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ ও অধ্যবসায়ের প্রভাবে বৌদ্ধমত এসিয়া মহাদেশের অর্দ্ধাধিক অংশে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। দুই সহস্র বর্ষাধিক কালের পরিবর্ত্তনেও উহার বিশেষ কোন হানি করিতে পারে নাই। মহারাজ অশোকের একমাত্র কন্যা সঙ্ঘমিত্রাও ধর্ম্মোন্মাদে সংসারের অসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি রাজোচিত ভোগ-বিলাস বিসর্জ্জন করিয়া যাবজ্জীবন ধর্ম্ম-প্রচারে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যেই স্বয়ং সিংহলে গমন করিয়া সুদীর্ঘকাল তথায় অবস্থিতি করেন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত ক্রম-সূক্ষ্ম হইয়া সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ঐ অপ্রশস্ত ভূভাগকে কুমারিকা অন্তরীপ বলে। এই কুমারিকা অন্তরীপটি ভারত-ভূমির নাসিকা-স্বরূপ। সিংহল দ্বীপ আমাদের ভারতমাতার নাসাভরণস্থিত মনোহর মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে! কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহাকে ভারত-ভূমির মুকুট-

ভ্রষ্ট মুক্তাসার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ সিংহলের আকৃতি অনেকাংশে মুক্তাফলেরই অনুরূপ বটে। আবার এই দ্বীপের সন্নিকটবর্ত্তী সাগরভাগে মণিমুক্তাদি যে সকল মহামূল্য উপাদেয় রত্নরাজি নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে ইহাকে ঐশ্বর্য্য-নিকেতন রত্নাকরের রত্ন-ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার উত্তরাংশে প্রসিদ্ধ সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি সূর্য্যবংশের পূর্ব্বগৌরব প্রকাশ করিতেছে। সিংহলের দৃশ্যও অতি মনোরম।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বর্ণানুসারে যেখানে তাম্রপর্ণী নদী মান্নার উপসাগরের সহিত সঙ্গত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে অতি উৎকৃষ্ট মুক্তার উৎপত্তি হয়। ঐ নদী প্রাচীন পাণ্ড্য রাজ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত। বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশ করমণ্ডল-উপকূলের যেখানে অবস্থিত, প্রাচীন পাণ্ড্য জনপদ সেইখানেই ছিল। ফলতঃ ত্রিবাঙ্কুরের নিকট হইতে সিংহলের উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত সমগ্র সাগরভাগ হইতেই মুক্তা-শুক্তি সকল উত্তোলিত হইয়া থাকে। শুক্তি-গর্ভে মুক্তার উৎপত্তি অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। ঐ সকল শুক্তির মধ্যে কতকগুলির গাত্রে এক প্রকার ছিদ্র হয়। কি কারণে যে শুক্তি-গাত্রে ঐরূপ ছিদ্রের উৎপত্তি হয়, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বোক্ত শুক্তি সকলের এক প্রকার রোগ হইতে ঐরূপ ছিদ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তৎকালে উল্লিখিত ছিদ্রগুলির পূরণার্থ শুক্তি সকলের গাত্র হইতে স্বভাবতঃ এক প্রকার রস বহির্গত হয়। ঐ রসই কঠিন ভাব ধারণ করিয়া মুক্তাকারে পরিণত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ ও সিংহল এই উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাগর-ভাগে অতি উৎকৃষ্ট মুক্তা-গর্ভ শুক্তি সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন কবিগণ মুক্তাকলাপের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, উহার অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। স্থলতর

মুক্তা-খচিত ভূষণ মনোজ্ঞ শোভা ও মহতী সমৃদ্ধির লক্ষণ। এতদ্দেশীয় ধনশালী ব্যক্তিগণ যেরূপ অত্যধিক মূল্যে মুক্তা-কলাপের সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উৎকৃষ্ট-জাতীয় স্থূলতর মুক্তার এক একটি সহস্রাধিক মুদ্রায় বিক্রীত হইয়া থাকে।

সিংহল-বাসীদিগের সহিত এদেশের বণিক্-সম্প্রদায়ের বাণিজ্য-সংস্রবের কথা বহুকাল হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, বঙ্গদেশীয় বণিকেরা এ দেশের কৃষিজাত ও কারু-রচিত দ্রব্য সকলের বিনিময়ে ঐ সকল মহার্হ রত্নের সংগ্রহ করিতেন। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ আগ্রহের সহিত তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ মুক্তা অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া লইতেন। যদিও তৎকালে সমুদ্র-পথে গমনের তাদৃশী সুবিধা ছিল না, তথাচ যথেষ্ট লাভের আশায় এদেশের বাণিজ্য-জীবিগণ ঐ দুর্গম সাগর-পথে গমনাগমন করিতেন।

বঙ্গীয় কবি-কুল-ভূষণ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী সিংহলপত্তনে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি অপূর্ব্ব কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পথেই কালীদহে 'কমলেকামিনী' বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিবরের অদ্ভুত কল্পনা-নৈপুণ্যের বিকাশ হইয়াছে। তরঙ্গাকুল সমুদ্রমধ্যে কমলোপরি আসীনা গণেশ-জননীর মূর্ত্তি দর্শনে ষোড়শী রমণী-কর্ত্তৃক মাতঙ্গের গ্রাস ও উদ্গীরণ কবিকঙ্কণের অপূর্ব্ব কল্পনা! পিতৃহীন বালক শ্রীমন্তের সুশীলতা, সৎসাহস, ধীরতা ও ভগবদ্-ভক্তির বিষয় পাঠ করিলে, সকলেরই অন্তঃকরণ শান্ত-করুণরসে বিগলিত হইয়া যায়।

এই দ্বীপের সাগর-সন্নিহিত অধিকাংশ প্রদেশ নিম্ন। কিন্তু মধ্যভাগ উন্নত ও পর্ব্বত-মালায় পরিব্যাপ্ত। ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে কোন কোনটির উচ্ছ্রায় সাগর-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় তিন মাইল। ঐ সকল পর্ব্বত

হইতে যে কয়েকটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মহাবলি-গঙ্গা, বালু-গঙ্গা, বেলবে ও গোয়িদোরা এই কয়টি প্রধান। ঐগুলি দ্বারা অধিবাসিগণের কৃষি-বাণিজ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। বর্ষাকালে ঐ সকল স্রোতস্বতীর জল বর্দ্ধিত হইয়া, উভয় কূলের বহুদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া থাকে; তাহা দ্বারা সেই সকল ভূভাগের শস্যোৎ-পাদিকা শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ প্লাবনময়ী ভূমিতে দারুচিনি, মরিচ, শুণ্ঠী, গুবাক, ইক্ষু, আবলুসকাষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ পণ্যদ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উপকূল-ভাগে যথেষ্ট নারিকেল বৃক্ষ তীরভূমির শোভা সম্পাদন করিতেছে।

সিংহল দ্বীপে যে সকল পর্ব্বত আছে, সেইগুলির মধ্যে সমুদ্র-তট-স্থিত 'আদম শিখর'-নামক এক গিরিশৃঙ্গ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার উপরিভাগে একটি পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়। উহা পাদোন চতুর্হস্ত বিস্তৃত। সিংহলের অধিবাসীরা সকলেই এই পদাঙ্কটির প্রতি গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। তত্রত্য মুসলমান অধিবাসীরা বলেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত আদিপুরুষ আদম এই স্থানে এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া, বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ঐ সময়ে প্রস্তরোপরি তাঁহার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বলেন, বুদ্ধদেব সিংহলে আগমন সময়ে প্রথমে ঐ স্থানে উপনীত হন এবং পদচিহ্ন দ্বারা ঐ স্থানকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। আবার এখানকার হিন্দু অধি-বাসী ও মলয়বর-প্রদেশীয়েরা মনে করেন, উহা ত্রিলোকীনাথ মহেশ্বরের পদাঙ্ক। যাহা হউক, গিরি-শৃঙ্গে অঙ্কিত এই চিহ্ন, উল্লিখিত হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধেয় হওয়াতে আদম-শিখরে বহু-সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে এবং এই উপলক্ষে এখানে নানাবিধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়।

সিংহলের পশ্চিমভাগে প্রসিদ্ধ কলম্বো বন্দর; ইহা এই দ্বীপের রাজধানী। এখানে কাফি, নারিকেল তৈল ও দারুচিনির বাণিজ্য হইয়া থাকে। দক্ষিণাংশে গল-নামক প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয়। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানহইতে যে সকল সামুদ্রিক পোত ভারতমহাসাগরের উপর দিয়া আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার অভিমুখে গমন করে, তাহারা এখান হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। পূর্ব্বাংশে ত্রিনকমলী (ত্রিকুনামলী) নগর; এই নগরের সাগর-তটবর্ত্তী অংশ অতি সুদৃশ্য। মধ্যভাগে অনুরাধা নগরীতে সিংহলের প্রাচীন কীর্ত্তি-গৌরবের অনেক ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কান্দী পূর্ব্বতন নরপতিগণের শেষ রাজধানী ছিল।

কুমারিকা অন্তরীপ হইতে সিংহলের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী সাগরভাগ অগভীর ও তরঙ্গাকুল। এই নিমিত্ত ঐ সাগরাংশের উপর দিয়া সামুদ্রিক পোত সকলের গমনাগমনের সুবিধা হয় না।

সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের যেরূপ নিকটবর্ত্তী, তাহাতে ভারতবর্ষীয়-দিগের ভাষার সহিত এখানকার অধিবাসিগণের ভাষার সাদৃশ্য সহজেই প্রতীত হইয়া থাকে। সিংহলবাসীদিগের প্রাচীন ভাষার নাম পালি। পালিভাষা সংস্কৃতেরই রূপান্তর মাত্র। এক্ষণে সিংহলের অধিবাসীরা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, তাহা পালির অপভ্রংশ-জাত এবং তৈলঙ্গ ও পারসিক ভাষার সহিত মিশ্রিত।

এই দ্বীপের অধিবাসীরা বহুকাল হইতে স্বদেশীয় পুরাবৃত্তের অনুসন্ধানে যত্নশীল। মহাবংশ, রাজাবলী, রাজরত্নাবলী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থে প্রাচীন রাজবংশের বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থে সূর্য্য-বংশাবতংস রামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয়ের কথাও বর্ণিত আছে। তাহাতে অবগত হওয়া যায়, প্রসিদ্ধ

শকাদিত্যের জন্মগ্রহণের দুই হাজার চারিশত চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাঘবেন্দ্র রাম কিষ্কিন্ধ্যা-বাসী সৈন্যগণের সহিত লঙ্কায় আগমন করিয়া, লঙ্কাধিপতি দশাননকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু ঐ কাল-পরিমাণ প্রকৃত কি না, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা দুষ্কর। প্রাচীনকালে বর্ষ-নিরূপণের সহিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহের প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল না। অনেকে বলেন, শকাদিত্যের জন্মের অন্ততঃ তিন হাজার ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পৌরাণিক যুগের কাল-নিরূপণ যে আনুমানিক প্রমাণের উপর নিভর করে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ঐ সকল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শাক্য-সিংহ বুদ্ধদেব শকাব্দারম্ভের ছয় শত দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং সিংহলে গমন করিয়া স্বীয় মত প্রচারিত করেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি পুনর্ব্বার সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ইতিবৃত্ত পাঠে আমরা বঙ্গদেশের সহিত সিংহলের রাজবংশের সংস্রবের পরিচয়ও পাইয়া থাকি।

মহাত্মা বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ সময়ে বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম বিজয়, কনিষ্ঠের নাম সুমিত্র। বিজয় অতিশয় উদ্ধত ও প্রজা-পীড়ক ছিলেন; দুর্দ্দান্ত সমবয়স্কগণের সহিত মিলিত হইয়া, প্রজাদিগের উপর সর্ব্বদা বিষম অত্যাচার করিতেন। প্রজাগণ ঐ দুরাচার রাজপুত্রের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠে। ইহাতে নরপতি সিংহবাহু অগত্যা প্রজাপীড়ক পুত্রকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া প্রজাগণের সান্ত্বনা করেন। দুরাত্মা বিজয় আত্ম-সদৃশ অর্দ্ধ সাত শত সমবয়স্কের সহিত পোতারোহণে সাগরপথে গমন করিয়া, অবশেষে সিংহলে উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসিগণ প্রাচীনকালে যে সমুদ্রপথে

গমনাগমন করিতেন, ইহা দ্বারা তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়; কবিকুল-ভূষণ কালিদাসও রঘুরাজের দিগ্বিজয়-বর্ণন-প্রসঙ্গে বঙ্গবাসিগণকে নৌ-সাধন-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

যাহা হউক, বিজয়সিংহ সিংহলে গমন করিয়া, কুবাণী-নামিকা এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন এবং কিয়ৎকাল শান্তশিষ্টের ন্যায় তথায় কালযাপন করেন। কিন্তু যাহার প্রকৃতি দূষিত, সে কত কাল শিষ্টভাবে থাকিতে পারে? কিছুকাল পরে বিজয়সিংহ রাজকুমারী কুবাণীর নিকট রাজ্যলাভের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সহধর্ম্মিণীও তাঁহার সহকারিণী হইলেন। এমন সময়ে রাজপরিবারের মধ্যে এক বিবাহ-সমারোহ উপস্থিত হইল। এই উপলক্ষে সিংহলের সমস্ত প্রধান ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। বিজয়সিংহও সহচরগণের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ইহাই আপনার অভীষ্টসাধনের উত্তম সুযোগ বুঝিয়া, ঐ রাত্রিতে দুর্ব্বৃত্ত সহচরগণের সাহায্যে নরপতি ও মুখ্য ব্যক্তিদিগের প্রাণসংহার-পূর্ব্বক রাজপদ গ্রহণ করিলেন!

দুর্ব্বৃত্ত বিজয়সিংহ এইরূপ গর্হিত উপায়ে সিংহলের আধিপত্য লাভ করিয়া, ৩৮ বৎসর অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্যসুখ ভোগ করেন। ইহার পর তিনি অপুত্রক দশায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে পিতার নিকটে এই বলিয়া দূত প্রেরণ করেন যে, 'আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ এই সিংহলের রাজপদ-গ্রহণার্থ প্রেরণ করিবেন।' কিন্তু যে সময়ে বঙ্গদেশে এই সংবাদ প্রেরিত হয়, তখন বঙ্গাধিপতি সিংহবাহু দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুমিত্র শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া, সাগর-বেষ্টিতা লঙ্কায় গমন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি আপনার কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডুবাসকে সিংহলে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডুবাস সিংহলে

উপনীত হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে বিজয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ সময়ে উপতিস্স-নামা সুবিজ্ঞ মন্ত্রী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। পাণ্ডুবাসের আগমনে তিনি রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পাণ্ডুবাস রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলে, প্রজাগণ সৌরাজ্য সুখে কালাতিপাত করে। এই সময় হইতে দুই হাজার তিন শত চব্বিশ বৎসর পাণ্ডুবাস এবং তাঁহার ছয় জন শ্যালকের উত্তরাধিকারিগণ লঙ্কায় রাজত্ব করেন। মধ্যে মধ্যে কয়েকবার মলয়বর-প্রদেশীয় পরাক্রান্ত নরপতিগণ এই দ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকার কখন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তাহার পর এই দ্বীপ ইংরাজ-জাতির অধিকারভুক্ত হইয়া, বর্ত্তমানে সুখ-শান্তি-সম্পন্ন হইয়াছে।

(শ্রীরামদয়াল চট্টোপাধ্যায়)

ধম্মপদং* ।

জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আছে, "ধম্মপদ" তন্মধ্যে একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধম্মপদগ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এ গুলি তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তৎসমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন; অন্ততঃ এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল নীতিবাক্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বাঙ্গালা অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন। এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশ এমনি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দ্দিক্ হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া, আপনার করিয়া, সুসম্বদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গিয়াছেন,- যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব ভগবদ্‌গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহতমূর্ত্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কি ধম্মপদে, কি গীতায়, এমন অনেক

* ধম্মপদং—অর্থাৎ ধম্মপদম্-নামক পালিগ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও অনুবাদ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত।

কথাই আছে, ভারতের অন্যান্য নানাগ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মগ্রন্থকে যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করেন, তাঁহারা যে ফললাভ করিবেন, এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। এখানে আমরা ইতিহাসের দিক্ হইতে বিষয়টাকে দেখিতেছি—সেইজন্য ধম্মপদ গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া, আমরা তাহার সহিত ভারতবর্ষের সংস্রবের কথাটাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

সকল মানুষের জীবনচরিত যেমন, তেমনি সকল দেশের ইতিহাস একভাবের হইতেই পারে না, একথা আমরা পূর্ব্বে *বলিয়াছি। এইজন্য, যখন আমরা বলি যে, ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মিলে না, তখন এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষে এক বা একাধিক জাতি কোনও দিন সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং এদেশে কে কবে রাজা হইল, কতদিন রাজত্ব করিল, তাহা লিপিবদ্ধভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোন আগ্রহ জন্মে নাই।

ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত, তাহা হইলে, ইতিহাসের বেশ মোটা-মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোন ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে;—তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্ব্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন

* রামায়ণের আলোচনায়।

সাম্য স্থাপন করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড় বড় বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস। সেই যোগটি কি লইয়া? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম্ম লইয়া।

কিন্তু ধর্ম্ম কি, তাহা লইয়া তর্কের সীমা নাই—এবং ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বাহ্য রূপ যে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তাহা হইলেও এটা বোঝা উচিত, পরিবর্ত্তন বলিতে বিচ্ছেদ বুঝায় না। শৈশব হইতে যৌবনের পরিবর্ত্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে না। ইউরোপীয় ইতিহাসেও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বহুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিণতির ভাব দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাসবিদের কাজ।

ইউরোপীয়গণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া মুখ্যতঃ রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের ঐক্য।

ইউরোপে ধর্ম্মের চেষ্টা আংশিকভাবে কাজ করিয়াছে, রাষ্ট্রচেষ্টা সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে করিয়াছে। ধর্ম্ম সেখানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইলেও

রাষ্ট্রের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, যেখানে দৈবক্রমে তাহা হয় নাই, সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের চিরস্থায়ী বিরোধ রহিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে মোগলশাসনকালে শিবজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবজীর ধর্ম্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।

মানুষ মুখ্যভাবে কোন ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করে, তাহাই তাহার প্রকৃতির পরিচয় দেয়। লাভ করিব, এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়,—কল্যাণ করিব, এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণকে মানে, টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাধা আসে, সেগুলিকে সাবধানে কাটাইয়া তবে তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়—যে ব্যক্তি লোভকেই মানে, তাহার পক্ষে ঐ সকল বাধার অস্তিত্ব নাই।

এখন কথা এই, কল্যাণকে কেন মানিব? অন্ততঃ ভারতবর্ষ লাভের চেয়ে কল্যাণকে, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে কি বুঝিয়া মানিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

ভারতবর্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখা যায় যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এই সম্বন্ধকে ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্ণয় করিয়াছে, কিন্তু ব্যবহারে এক জায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দিক্ হইতে ভারতবর্ষ একই কথা বলিয়াছে।

এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, আত্ম-অনাত্মের মধ্যে কোন সত্য প্রভেদ নাই। যে প্রভেদ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার মূলে অবিদ্যা।

কিন্তু এক ছাড়া যদি দুই না থাকে, তবে ত ভালমন্দের কোনও

স্থান থাকে না। কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। যে অজ্ঞানে এককে দুই করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা মায়ার চক্রে পড়িয়া দুঃখের অন্ত থাকিবে না। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মের ভালমন্দ স্থির করিতে হইবে।

আর এক সম্প্রদায় বলেন, এই যে সংসার আবর্ত্তিত হইতেছে, আমরা বাসনার দ্বারা ইহার সহিত আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছি ও দুঃখ পাইতেছি—এক কর্ম্মের দ্বারা আর এক কর্ম্ম এবং এইরূপে অন্তহীন কর্ম্মশৃঙ্খল রচনা করিয়া চলিতেছি—এই কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া মুক্ত হওয়াই মানুষের একমাত্র শ্রেয়ঃ।

কিন্তু তবে ত সকল কর্ম্ম বন্ধ করিতে হয়। তাহা নহে, এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। কর্ম্মকে এমন করিয়া নিয়মিত করিতে হয়, যাহাতে কর্ম্মের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন্ কর্ম্ম শুভ, কোন্ কর্ম্ম অশুভ, তাহা স্থির করিতে হইবে।

অন্য সম্প্রদায় বলেন, জগৎসংসার ভগবানের লীলা। এই লীলার মূলে তাঁহার প্রেম—তাঁহার আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সার্থকতা।

এই সার্থকতার উপায়ও পূর্ব্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের উপায় হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। নিজের বাসনাকে খর্ব্ব করিতে না পারিলে, ভগবানের ইচ্ছাকে অনুভব করিতে পারা যায় না। ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি। সেই মুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কর্ম্মের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাঁহারা অদ্বৈতানন্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাও বাসনা-মোহকে ছেদন করিতে উদ্যত; যাঁহারা কর্ম্মের অনন্তশৃঙ্খল হইতে মুক্তিপ্রার্থী,

তাঁহারাও বাসনাকে উৎপাটিত করিতে চান, ভগবানের প্রেমে যাঁহারা নিজেকে সম্মিলিত করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন, তাঁহারাও বিষয়বাসনাকে তুচ্ছ করিবার কথা বলিয়াছেন।

যদি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশগুলি কেবল আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের সীমা থাকিত না। কিন্তু এই ভিন্ন সম্প্রদায়গণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে তত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম বা যতই স্থূল হউক, সে তত্ত্বকে কাজের মধ্যে অনুসরণ করিতে হইলে যতদূর পর্য্যন্তই যাওয়া যাক্, আমাদের গুরুগণ নির্ভীকচিত্তে সমস্ত স্বীকার করিয়া, সেই তত্ত্বকে কর্ম্মের দ্বারা সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোন বড় কথাকে অসাধ্য বা সংসারযাত্রার সহিত অসঙ্গত বোধে কোন দিন ভীরুতাবশতঃ কথার কথা করিয়া রাখে নাই। এইজন্য এক সময়ে যে ভারতবর্ষ মাসাংশী ছিল, সেই ভারতবর্ষ আজ প্রায় সর্ব্বত্রই নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। যে ইউরোপ জাতিগত সমুদয় পরিবর্ত্তনের মূলে সুবিধাকেই লক্ষ্য করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, কৃষির ব্যাপ্তি-সহকারে ভারতবর্ষে আর্থিককারণে গোমাংস রহিত হইয়াছে। কিন্তু মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধানসত্বেও অন্য সকল মাংসাহারও—এমন কি, মৎস্যভোজনও ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতেই লোপ পাইয়াছে। কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই উপদেশ জৈনদের মধ্যে এমন করিয়া পালিত হইতেছে যে, তাহা নিতান্ত বাড়াবাড়ি না মনে করিয়া থাকিবার উপায় নাই।

যাহাই হউক, তত্ত্বজ্ঞান যতদূর পৌঁছিয়াছে, ভারতবর্ষ কর্ম্মকেও ততদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ তত্ত্বের সহিত কর্ম্মের

ভেদ সাধন করে নাই। এজন্য আমাদের দেশে কর্ম্মই ধর্ম্ম। আমরা বলি, মানুষের কর্ম্মমাত্রেরই চরম লক্ষ্য কর্ম্ম হইতে মুক্তি—এবং মুক্তির উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তত্ত্বের মধ্যে আমাদের যতই পার্থক্য থাক্, কর্ম্মে আমাদের ঐক্য আছে। অদ্বৈতানুভূতির মধ্যেই মুক্তি বল, আর বিগত-সংস্কার নির্ব্বাণের মধ্যেই মুক্তি বল, আর ভগবানের অপরিমেয় প্রেমানন্দের মধ্যেই মুক্তি বল—প্রকৃতি-ভেদে যে মুক্তির আদর্শ, উহা যাহাকেই আকর্ষণ করুক না কেন, সেই মুক্তিপথে যাইবার উপায়গুলির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। সে ঐক্য আর কিছু নয়, সমস্ত কর্ম্মকেই নিবৃত্তির অভিমুখ করা। সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম্ম তেমনি কর্ম্মকে অতিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে—পুরাণে এই উপদেশই দিয়াছে এবং আমাদের সমাজ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

ইউরোপ কর্ম্মকে কর্ম্ম হইতে মুক্তির সোপান করে নাই—কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াছে। এই জন্য ইউরোপে কর্ম্মসংগ্রামের অন্ত নাই—সেখানে কর্ম্ম ক্রমশঃই বিচিত্র ও বিপুল হইয়া উঠিতেছে, কৃতকার্য্য হওয়া সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য। ইউরোপের ইতিহাস কর্ম্মেরই ইতিহাস।

ইউরোপ কর্ম্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া কর্ম্মকরা সম্বন্ধে স্বাধীনতা চাহিয়াছে। আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব—সেই স্বাধীন ইচ্ছা, যেখানে অন্যের কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতাকে হনন করে, কেবল সেইখানেই আইনের প্রয়োজন। এই আইনের শাসনব্যতিরেকে সমাজের প্রত্যেকের যথাসম্ভব স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। এইজন্য ইউরোপীয় সমাজে সমস্ত শাসন ও শাসনের অভাব প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্যই কল্পিত।

ভারতবর্ষও স্বাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা একেবারে কর্ম্ম হইতে স্বাধীনতা। আমরা জানি, আমরা যাহাকে সংসার বলি, সেখানে কর্ম্মই বস্তুত কর্ত্তা, মানুষ তাহার বাহন-মাত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা এক বাসনার পরে আর এক বাসনাকে, এক কর্ম্ম হইতে আর এক কর্ম্মকে বহন করিয়া চলি—তাহার পরে সেই কর্ম্মের ভার অন্যের উপর চাপাইয়া দিয়া হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি। এই যে বাসনার তাড়নায় চিরজীবন অন্তবিহীন কর্ম্ম করিয়া যাওয়া, ইহারই অবিরাম দাসত্ব ভারতবর্ষ উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে।

এই লক্ষ্যের পার্থক্য থাকাতেই ইউরোপ বাসনাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়াছে এবং আমরা বাসনাকে যথাসম্ভব খর্ব্ব করিয়াছি। বাসনা যে কোনও দিনই শান্তিতে লইয়া যায় না,—পরিণামহীন কর্ম্মচেষ্টাকে জাগরিত করিয়া রাখে, ইহাকেই আমরা বাসনার দৌরাত্ম্য বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। ইউরোপ বলে, বাসনা যে কোনও পরিণামে লইয়া যাউক না, তাহা নিয়তই যে আমাদের প্রয়াসকে উদ্রিক্ত করিয়া রাখে, ইহাই তাহার গৌরব।

আমাদের গৃহধর্ম্ম, আমাদের সন্ন্যাসধর্ম্ম, আমাদের আহারবিহারের সমস্ত নিয়ম-সংযম, আমাদের বৈরাগী ভিক্ষুকের গান হইতে তত্ত্ব-জ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই বলিতেছে—আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক মুক্তির পথ গ্রহণ করিবার জন্য,—সংসারের অন্তহীন আবর্ত্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবার জন্য দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকা ।

পদ্যাংশ

ঈশ্বর ।

জগদীশ !

এ ভব-ভবন মাঝে
যে দিকে যখন চাই,
তোমার করুণারাশি
কেবলি দেখিতে পাই । ১

তোমার আদেশে রবি
উজল কিরণময়,
তোমার আদেশে বায়ু
ভুবন ভরিয়া বয় । ২

চাঁদের মধুর আলো
যখন জগতে ভাসে,
তোমার করুণা তায়
উছলি উছলি হাসে । ৩

আবার গগনে যবে
কোটি তারা দেয় দেখা,
তোমার মহিমা যেন
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা । ৪

বিহগে ললিত গীত
শিখায়েছ ভালবাসি,
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভারাশি। ৫

ভূধর, সাগর, মেঘ,
বসন্ত, বরিষা-ধারা
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তারা। ৬

নগরের কোলাহল
বিজনের নীরবতা,
না শুনিতে বলে সদা
তোমারি স্নেহের কথা। ৭

কত যে বাসিছ ভাল
কিছু না জানিতে পাই,
যখন যা প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই। ৮

ভাঙ্গিলে ভবের খেলা
কোল পেতে দিবে স্থান,
দেখেও দেখিনে, তব
নাহি ভাব কুসন্তান। ৯

নাহি চাও প্রতিদান
নাহি রাখ কোন আশা,
নীরবে বাসিছ ভাল
ধন্য বটে ভালবাসা। ১০

কি আর চাহিব নাথ,
তোমার চরণ তলে,
তুমি যার সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে ? ১১
এইমাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার, তাই
সদা যেন মনে রাখি। ১২
যতটুকু, যত বিন্দু,
যা হয় এ ক্ষমতায়,
সাধিয়া তোমারি কাজ
যেন এ জীবন যায়। ১৩
ধরম, করম-ফল
সকলি তোমারি হরি* !
ভকতি প্রণতি নাথ !
ধর, এ মিনতি করি। ১৪

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

* আমি যে যে কর্ম্ম করি, ঐগুলি তোমারই কর্ম্ম অর্থাৎ তোমার আদেশ পালনের জন্যই ঐ সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি। ঐ সকল কর্ম্মের যে শুভাশুভ ফল, উহা ভক্তি ও প্রণতির সহিত তোমাতেই অর্পণ করিতেছি। তুমি উহা গ্রহণ কর বিনয়ের সহিত এই প্রার্থনা করি।

দামোদর-তীরে স্বপ্নদৃষ্ট কানন।

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ,
ক্ষীর-সম স্বাদু নীর,
বৃক্ষ নানাজাতি বিবিধ লতায়,
সুশোভিত উভ তীর.
বিন্ধ্যগিরি-শিরে জনমি যে নদ
দেশদেশান্তরে চলে,
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে :
পবিত্র করিলা যে নদের কূল
সুকবি কঙ্কণ কবি
ফুটায়ে কবিতা- কুসুম মধুর
বাণীর প্রসাদ লভি।
যে নদ নিকটে রস-বিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
ক'রেছে গউড়বাসী,
সেই দামোদর- তীরে এক দিন
অরুণ-উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্য-মার্গে ধরণী-শরীরে
কিরণ পড়িছে ফুটি।
গগন-ললাটে চূর্ণ-কাল মেঘ
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,

দামোদর-তীরে স্বপ্নদৃষ্ট কানন।

কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে।
হেথা সূর্য্যরশ্মি দামোদর-জলে
আলো করি দুই কূল,
হেথা তরু-শিরে তৃণলতা-দলে
রঞ্জিয়া প্রভাতী ফুল।
হেরি চারু শোভা ভ্রমি তীরে তীরে
পরশি মৃদু পবন,
সাংসারিক তাপে হৃদয় পীড়িত,
চিন্তায় আকুল মন।
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে,
শেষে শ্রান্তি-অভিভূত,
মুদি চক্ষু দুটি কোন বৃক্ষতলে
ক্রমে তন্দ্রা আবির্ভূত।
ক্রমে নিদ্রাঘোরে অবসন্ন তনু,
পরাণী আচ্ছন্ন হয়,
স্বপন-প্রমাদে সংসার ভাবনা
পাশরিত সমুদয়।
হেরি যেন কোন নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই;
আসি কত দূর ছাড়ি কত দেশ
কানন দেখিতে পাই;
অতি মনোহর কানন রুচির
যেন সে গগন কোলে,

কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চল
পবনে হেলিয়া দোলে,
বরণ হরিৎ বিটপে ভূষিত
সরল সুন্দর দেহ,
বৃক্ষ সারি সারি সাজায়ে তাহাতে
রোপিলা কেন বা কেহ।
শোভে বন-মাঝে বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায়;
মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে
দুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি কমল কুমুদ
কত সে তড়াগে ভাসে,
কত জলচর করি কলধ্বনি
নিয়ত খেলি উল্লাসে,
ভ্রমে রাজহংস সুখে কণ্ঠ তুলি
মৃণাল উপাড়ি খায়,
রৌদ্র-সহ মেঘ তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায়,
তড়াগ-সলিলে প্রতিবিম্ব ফেলি
কত তরু পরকাশে,
হেলিয়া হেলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাসে,
দুলিয়া দুলিয়া বায়ুর হিল্লোলে
তটেতে সলিল চলে;

উড়িয়া উড়িয়া সুখে মধুকর
বেড়ায় কমল-দলে,
শ্যামা দেয় শীস্, বন হৃষ্ট করি
ভ্রমে সে ললিত তান;
প্রতিধ্বনি তাব পূবি চারি দিক্
আনন্দে ছড়ায় গান;
ঝরে সুমধুর কোকিল-ঝঙ্কার
সকল কাননময়,
মধুবৃষ্টি যেন ঘন কুহুরবে
শ্রুতি বিমোহিত হয়।

(৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

সায়ং-চিন্তা।

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
ডুবাতে দিবস-শ্রমে বিস্মৃতি-সলিলে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে উঠিলাম গিরিশিরে,
বাসনা, জুড়াতে স্রোতঃ-সম্ভূত অনিলে
কার্য্য-ক্লান্ত কলেবর, সন্তাপিত মন।

২

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি সুন্দরী
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিত-প্রায়, সুবর্ণে মণ্ডিত কায়,

উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনী * ।

৩

রঞ্জিত আকাশতলে, নীল-তরঙ্গিণী
দেখাইছে প্রতিবিম্ব বিমল দর্পণে,
ভাসে তাহে মেঘগণ, কাঁপে তরু অগণন,
নাচিছে হিল্লোল-মালা মন্দ সমীরণে,
বহিতেছে গিরিমূল চুম্বিয়া তটিনী।

৪

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গ-নিচয়,
সুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ;
নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে,
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন,—
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ-ভয়।

৫

ওই দেখ তরুতলে প্রফুল্ল-হৃদয়
গাইতেছে উচ্চৈঃস্বরে, না জানে কি গায়—
লতা-পাতা জড় করি, কভু ভাঙ্গি পুনঃ গড়ি,
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়,
হায় রে, শৈশবকাল সুখের সময়।

৬

চিন্তা-কালভুজঙ্গিনী করে না দংশন,
নিরাশ প্রণয়-দুঃখে দহে না জীবন;

* কাদম্বিনী—মেঘশ্রেণী।

দুরাকাঙ্ক্ষা-পারাবার বিশাল লহরী তার,
খেলে না হৃদয়ে, আহা! জানে না এখন,
মানব জনম তার, দাসত্ব-জীবন।

৭

হাস হাস হাস শিশু! নহে দিন দূর,
সংসার-সাগর-পারে বসিয়ে যখন,
বিষাদ-তরঙ্গ-মালা, গণিতে গণিতে কালা
হইবে প্রফুল্ল মুখ, জানিবে তখন,
নির্ম্মল শৈশব-ক্রীড়া সুখের স্বপন।

৮

আমিও ইহার মত ছিলাম নির্ম্মল,
সতত ছিলাম সুখে সুপ্রসন্ন মনে,
আমার জীবন-কলি, (দিতে সুখে জলাঞ্জলি),
কে ফুটা'ল, পোড়াইতে ভীম হুতাশনে?
কে সুখ-সাগরে মম মিশা'ল গরল?

৯

কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
কেনই বিবেক-শক্তি হ'ল বিকসিত,
উথলিতে অভাগার, শোকসিন্ধু অনিবার,
নিজ হীন অবস্থায় করিতে দুঃখিত,
কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব-স্বপন।

(৺নবীনচন্দ্র সেন)

নদী ও কালের সমতা।

ইংরাজি হইতে অনুবাদিত।

নদী আর কাল-গতি একই প্রমাণ,
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।
ধীরে ধীরে নীরব-গমনে গত হয়,
কিবা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়;
উভয়েই গত হ'লে আর নাহি ফেরে,
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে।

সর্ব্ব অংশে একরূপ যদিও উভয়,
চিন্তা-রত চিত্তে এক ভেদ জ্ঞান হয়—
বিফলে না বহে নদী ; যথা নদী ভরা,
নানা শস্য-শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল, সদাত্ম-ক্ষেত্রের* শোভাকর,
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

(৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

* সাধু-জীবন রূপ ক্ষেত্রের। যাহারা সময়ের সদব্যবহার করে, কাল তাহাদের সাধুজীবন রূপ ভূমির উৎকর্ষাধায়ক (উন্নতি-কারক) হয়। কিন্তু ঔদাস্যে কালক্ষেপণ করিলে, ঐ কাল জীবনকে মরুভূমির ন্যায় অতি ভীষণ অবস্থায় পরিণত করে।

সূর্য্য।

দেব দিবাকর, অন্ধকার-হর,
সৌন্দর্য্যের উৎস, তেজের আকর,
কেন না তোমারে নানাদেশে নর
সেবিবে অচল ভকতি ভাবে ? ৪

তুমি দেখা দিলে উদয়-অচলে,
রূপের ছটায় ভুবন উজলে,
সঙ্গীত-তরঙ্গ চৌদিকে উথলে,
ধরাতল সাজে মোহন ভাবে। ৮

তোমার প্রসাদে* দেব সুধাকর
আনন্দে বরষি সুধাময় কর,
সাজান যতনে অবনী অম্বর,
যেন সন্তাপিত মানব মন, ১২

রজনীর শান্ত রসেতে রসিয়া,
হৃদয়ের জ্বালা যাইবে ভুলিয়া,
ভকতির ভরে পড়িবে ঢলিয়া,
হইবে প্রেমের রসে মগন। ১৬

তোমার আদেশে জলধর-দল,
বিজলীর মালা গলে ঝলমল,
ছাইয়া নিমেষে গগনমণ্ডল,
বরষে হরষে সলিলরাশি. ২০

---

* চন্দ্র নিজে জ্যোতির্ম্ময় নহে। সূর্য্যের কিরণের প্রতিবিম্বেই চন্দ্রকে স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি দেখা যায়।

বিষম নিদাঘ-তাপ নিবারিতে,
কাতর কৃষকে প্রাণদান দিতে,
শুষ্ক বসুমতী সুফলা করিতে,
পুঁলকে পূরিতে ধরণীবাসী। ২৪

তোমার প্রভাবে হিমানী-ভবনে
জনমে তটিনী। তোমার পালনে
লভি পীন তনু যবে শুভক্ষণে
নামি ধরাতলে প্রকাশ পায়, ২৮

সুখে বসুন্ধরা হয় ফলবতী,
প্রফুল্ল দুকূলে তরু কি ব্রততী,
জীবন পাইয়া সব হৃষ্টমতি,
ভোগের ভাণ্ডার উথলি যায়। ৩২

তোমারি আলোক-মালায় ভূষিত,
তোমারি শোভায় সুন্দর সজ্জিত,
তোমারি বলেতে* গগনে ধাবিত,
গ্রহ ধূমকেতু শশাঙ্কচয়, ৩৬

যেরূপে ভ্রমিতে বলিয়াছ যারে,
ভ্রমিছে নিয়ত সেই সে প্রকারে,
নিরূপিত পথ ত্যজিতে না পারে,
শৃঙ্খলে গ্রথিত যেন রে রয়। ৪০

তোমার প্রসূত অবনীমণ্ডল,
গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতুদল,

* মহাকর্ষণ প্রভাবে।

আদিকালে তুমি আছিলে কেবল,
হৃদয়ে করিয়া এই জগৎ,   ৪৪
একে একে তুমি সৃজিলে সকল,
প্রকাশিয়া ক্রমে স্বীয় তেজ* বল,
করি দশদিকে কত কীর্ত্তিস্থল,
মানব কি ছার বুঝিতে তাবৎ।   ৪৮
এই ধরাধামে তেজরূপ ধরি,
ওহে বিশ্ববীজ! গগনে বিচরি
করিতেছ কাজ দিবস শর্ব্বরী,
প্রকাশি বিবিধ প্রকার বল;   ৫২
জীব কি উদ্ভিদ্ তব অবতার,
যন্ত্রের শকতি তোমার বিকার,
তব ক্রিয়াস্থল সকল আধার,
তুমি অবনীর এক সম্বল।   ৫৬
তুমি মেঘরূপে বরষিছ জল,
তুমি কৃষিরূপে ধরিতেছ হল,
গোমূর্ত্তিতে তুমি টানিছ লাঙ্গল,
তুমি শস্যরূপে পুনঃ উদিত!   ৬০
তুমি নর হ'য়ে গড়িতেছ কল,
তাহে চালাইতে লাগে যে যে বল,
বিজ্ঞানেতে বলে তুমি সে সকল
তোমার মহিমা অপরিমিত।   ৬৪

* যাবতীয় তেজ ও ক্রিয়া সৌরতেজ হইতেই উদভূত।

প্রথমে যেমন করিয়ে সৃজন,
কালে কালে সবে করি আকর্ষণ,
পুনরায় নাকি করিবে গ্রহণ,
জগৎ হইবে তোমাতে লয় * ! ৬৮
আদিকালে তুমি আছিলে যেমন,
পরিশেষে তুমি রহিবে তেমন,
এক, অদ্বিতীয়, অখিল কারণ,
পুনঃ নব-সৃষ্টি-শকতিময়। ৭২

(৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)

নিদ্রা।

রজনীর সহচরী নিদ্রে মায়াবিনি !
চেতনে মুহূর্ত্তে তুমি কর অচেতন !
জীব-সঙ্ঘ-শব্দময়ী এই যে মেদিনী,
তোমার প্রভাবে মৌনী হয়েছে কেমন !

স্পন্দহীন শিশুগণ সহজ-অস্থির,
খেলা ভুলে নীরবেতে করেছে শয়ন।
প্রসূতি চেতনাশূন্য নিস্পন্দ-শরীর,
শিশুপ্রতি নাই আর সতর্ক নয়ন।

* সৌর জগতের যাবতীয় গ্রহাদি সূর্য্যমণ্ডল হইতেই প্রসূত এবং প্রলয়কালে সূর্য্যমণ্ডলেই লীন হইবে।

বিষয়ী বিভব যার সদা অন্বেষণ,
ধন-লোভে অতিশ্রমে কাতর না হয় ;
এখন সে শ্রমশীল, অলসপ্রধান,
দেখে না বিফলে তার যেতেছে সময়।

ধন্য নিদ্রে, তোমার কুহক বিমোহন !
শোক দুঃখ দূরীভূত তোমার পরশে !
সুস্থিরহৃদয়ে নিশা করিছে যাপন
অশ্রু জল-অভিষিক্ত যে জন দিবসে।

নয়ন-নন্দন-প্রিয়-পুত্র-শোকাতুরা
অভাগিনী জননী ভুলেছে শোক-জ্বালা !
জীবন-সর্ব্বস্ব-পতি-বিয়োগ-বিধুরা
মরম-বেদনা তার ভুলিয়াছে বালা !

আশ্চর্য্য সে ইন্দ্রজাল ! হে নিদ্রে ! তোমার,
স্বপন সম্ভূত যাহে, অদ্ভুতের শেষ
এ হেন যোগ্যতা আর নাহি দেখি কার',
মিথ্যারে সাজাতে দিয়া সত্যের সুবেশ।

দরিদ্র কুটীরে শুয়ে ভুঞ্জে রাজসুখ,
সুধা-ধবলিত-গৃহে ভিখারী ভূপতি,
অপুত্রক আনন্দেতে দেখে পুত্রমুখ,
গৃহবাসী করে দূর প্রবাসে বসতি।

ধন্য ইন্দ্রজাল ! যাহে যোগীন্দ্র-বাসনা
স্বর্গধামে যায় নর বিনা তপস্যায় !

প্রসন্ন-সলিলা মন্দাকিনী কলস্বনা,
ললিত-লহরীভঙ্গে বাহিত যথায় !

কল্পতরু, নিয়তই পুষ্পিত, ফলিত,
ফলদানে রাখে যথা যাচকের মান,
তুষার-ধবলা, সুরবালা-নিষেবিত,
কামদুঘা, দুগ্ধধারা করে যথা দান !

বৃন্দারক*-বৃন্দ-মাঝে দেবেন্দ্র বাসব,
বামে শচী তনুরুচি মাধুরী-সম্ভাব,
বৈজয়ন্তধামে শোভা সমৃদ্ধি সে সব,
নয়নে বিশদ আহা বিভাসিত তাব !

লম্বমান আপিঙ্গল জটা পৃষ্ঠ'পরি,
মধ্যাহ্ন-তপন, মহাযশাঃ তপোধন,
দেবর্ষি নারদ, করে বীণা-যন্ত্র ধরি,
হরিগুণ-গানে তার তোষেন শ্রবণ !

কম্বুগ্রীবা-প্রলম্বিত মন্দারের মালা,
তাল-মান-সুসঙ্গত-ভূষণ-শিঞ্জন,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী-বালা,
উল্লাসে উৎফুল্ল-আঁখি নিরখে সে জন !

বীতরাগ বিহঙ্গম সঙ্গীত-আলাপে,
মোহাবেশে পশিয়াছে কুলায়-মাঝারে।

* বৃন্দারক—দেব

অবহেলি নব ফুল্ল মল্লিকা-গোলাপে,
মন্ত্রমুগ্ধ শিলীমুখ বিমুখ ঝঙ্কারে।

নবতৃণবিমণ্ডিত ভূমিখণ্ডে গাভী
চরে না, সম্বিৎহারা,* নাই হাম্বারব ;
উন্নত ককুদ, মেঘ-গম্ভীর-আরাবী
শিথিল শরীর-গ্রন্থি বৃষভ নীরব।

রাখাল মুরলী করে না বাদন,
করতালী-তালে গীত না গায় কৃষক,
পল্লীবাল ভুলিয়াছে ধাবন-কূর্দ্দন,
উচ্চহাস হাসে নাকো বাচাল যুবক।

অশ্বরথ রাজপথে করে না প্রয়াণ,
মানুষের যাতায়াত নাহিক তথায়,
নিরাতঙ্কে সারমেয় সেখানে শয়ান,
কিংবা বায়ুভুক্ সর্প তথা লম্বকায়।

নানা নর-কণ্ঠ-স্বরে কোলাহলময় —
জনাকীর্ণ পণ্যশালা হ'য়েছে বিজন,
বিক্রেতা গ্রাহক নাই, নাই বিনিময়,
নাই প্রয়োজন বুঝে মূল্য-নিরূপণ।

বিথারিয়া† মায়া, সদ্যঃ-সংজ্ঞা-বিঘাতিনী
মুখর জঙ্গমে নিদ্রা মূক জড় করি,

* চৈতন্য-শূন্য।
† বিস্তার করিয়া।

এই যে প্রকৃতি, স্পষ্ট চৈতন্যরূপিণী,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার লইতেছে হরি*।

হর্ষ-খেদ-ক্রোধ-ভয়-বিস্ময়-উদ্রেকে
সমর্থ কবির কাব্য-রস-আস্বাদনে,
বিমুখী হইলে বাণী, বঞ্চিত অনেকে,
স্বপ্ন কিন্তু কুতূহলী করে সর্ব্বজনে।

অয়ি নিদ্রে! অসামান্য কুহক তোমার,
কিন্তু তোমা চেয়ে শ্রেষ্ঠ আছে একজন—
অল্পক্ষণ তুমি দেহ কর অধিকার,
তার স্পর্শে জীব চিরনিদ্রায় মগন!

সে নিদ্রায় শয়নের নাহি প্রয়োজন;
দিবা নিশা ভেদ নাই সেই কুহকীর,
তুমি ত বিলম্ব সও; তিলেক কারণ
বিলম্ব না সহে সেই বিনয়-বধির।

মিথ্যা ঘটনায় সৃষ্ট স্বপন তোমার,
সে নিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মা যখন,

---

* বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়া (চেষ্টা) গুলি যেরূপ যথানিয়মে ও অচিন্তনীয় ভাবে চলিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ প্রকৃতির সহিত চৈতন্যময় অধিষ্ঠাতা বিরাজমান রহিয়াছেন। কিন্তু নিশীথ সময়ে জীবগণের নিদ্রিত অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিলেই মনে হয়, ঐ প্রকৃতিতে চৈতন্যভাব নাই— অর্থাৎ উহা চিৎশক্তি-বিহীনা।

এই যে অবনী-মাঝে জনম তাহার,
প্রকৃত ঘটনা যত ভাবে সে স্বপন *।

(৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

যমুনা-তটে।

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদী-রাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল।
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে,
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকের পাঁতি শোভে তরু-শাখা'পরে,
নিরিবিলি ঝিঁঝিঁ ডাকে জগৎ ঘুমায়;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভেসে যায়।

ভাসিয়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা† ডুবেছে যাহার,

* জীবের দেহ ও সংসার নশ্বর। কিন্তু আমরা ঐ সকলকে নিত্যবৎ মনে করি। আবার জীব যখন লোকান্তরে গমন করে, তখন এই পার্থিব ব্যাপার সকলকে স্বপ্নবৎ অলীক ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বুঝিতে পারে।

† ধ্রুবতারা—ধ্রুবনক্ষত্র অর্থাৎ লক্ষ্য বিষয়।

নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে
হুহু করি দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,—
শুনিলে গভীর ধ্বনি, পবনের গতি,—
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তায় মগ্ন বিজন ভূমিতে।

হায় রে, প্রকৃতি-সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি।
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি, থাকি কভু দিবা রাতি,
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?

বসিয়া যমুনা তটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হ'লো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না!
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,

কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল!
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙ্গা* মন যার সেই সে বুঝিল।
(৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতা।

১

সুকোমল অঙ্কে নিয়া,
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া,
স্নেহ বাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননি, কর পুনঃ বালক আমায়!
তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মা গো বিষয়ের রণে!—
তুমি গড়েছিলে যাহা,
আর আমি নাই তাহা,
তব প্রেম-স্বর্গ-কথা কিছু নাই মনে!—
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে।

---

*লক্ষ্য-ভ্রষ্ট নৈরাশ্য-কাতর।

২

নিজ অঙ্গ-অংশ দিয়া,
এই তনু নিরমিয়া,
চিত হ'তে দিয়া চিত দীপে দীপপ্রায়,
আমায় সৃজেন যিনি,
ধাতার স্বরূপ তিনি ;—
জীব-দেহ, ব্রহ্মাণ্ড সমান তুলনায়।—
পরদেশ এ ধরায়,
অসম্বল অসহায়,
আসি আত্মা, পেয়ে যাঁর আতিথ্য কৃপার,
পথ-ক্লান্তি পাসরিয়া,
নব সঙ্গি-সঙ্গ নিয়া,
রঙ্গরসে পাসরে আলয় আপনার ;
মহতী মহিমা, বাক্যে কে বর্ণিবে তাঁর !

৩

মিলাইয়া হৃদি যুক্তি,
ভাবিলে বুঝিবে উক্তি,
জননীর ভাব-সিন্ধু অগাধ অপার !
বিশ্বচয় দ্বীপপ্রায়,
বলয়িত আছে যায়,
নর-বুদ্ধি-ভেলায়, কি পার পায় তার !
হের গিয়া সূতিকায়,
মূর্চ্ছিতা মাতার কায়,
কে বুঝে, কে বুঝাইবে প্রসব-বেদন !

সুত কান্দে,—কাণে যায়,
নয়ন মেলিয়া চায়,
করুণায় করে সব দুঃখ আবরণ!—
নব তনু লভি মৃত্যুপাসরে মরণ!

৪

যে যত্নে, যে যাতনায়,
সন্তানে বাঁচায় মায়,
সুবিস্তারে বর্ণিতে না শক্তি সারদার!
সদা ব্যগ্র, সদা ত্রাস,
শূন্য অন্য অভিলাষ,—
এক ধ্যান, এক চিন্তা, নিয়ত মাতার;—
অনশন, জাগরণ,
নানা দেবে নিবেদন,
হৃদি-সিন্ধু দোলে, অল্প-হেতু-মৃদু-বায়ু!
যদি দিলে নিজ প্রাণ,
পায় সুত পীড়া-ত্রাণ,
মমতা-নিকেত মাতা, কাতর না তায়!
বিগলিত হৃদি, চির-স্রবিত* ধারায়!

৫

ক্ষুদ্রকায়, চেষ্টা-হীন,
শিশু সুত নিদ্রা-লীন,
নিকটে বসিয়া মাতা, অনিমেষে চায়!

---

* চিরবাহিত অর্থাৎ হৃদয় স্নেহরসে গলিত ও ঐ স্নেহেরূপ অবিরত ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

তমোময় নিশাযোগে,
বিশ্ব মুগ্ধ নিদ্রা-ভোগে,
সজাগর প্রহরী, বিধাতা যেন তায় !
চাহিয়া মায়ের মুখে,
শিশু সুত হাসে সুখে,—
হাসে মাতা, কে বুঝে আনন্দ পরিমাণ !
কবি ভাবগ্রাহী যেন,
দুজনে মিলন হেন—
প্রেম-কাব্য-চর্চ্চায় উভয়ে ফুল্ল-প্রাণ !
প্রসূতি-সন্ততি, সিন্ধু-সুধাংশু সমান !

৬

সন্ততি সুখেতে রবে,
অরোগী দীর্ঘায়ু হবে,
সমাজে গণিত হবে নীতি-পরায়ণ ;—
শুভ কাজে অনুরক্ত,
হবে মাতা-পিতা-ভক্ত,
প্রিয়কার্য্য করিবে, না লঙ্ঘিবে বচন ;—
বিবিধ বিপদ্-ভরা,
এলে সুখহরা জরা,
সযতনে সুতে সেবা করিবে তখন ;—
হেরে' পুত্র-আচরণ,
পুণ্য গা'বে দশ জন ;—
জননীর মনে সদা বাসনা এমন ;—
মাতৃ-অঙ্ক শঙ্কা-শূন্য ভুবন-পাবন।

৭

বালকের উপদ্রব,
নিত্য নব কত কব,
মাতা বিনা, সহিতে কি পারে অন্য জন
যা দেখিবে তা চাহিবে,
সাধ্যাসাধ্য না বুঝিবে,
গগনের চাঁদ চায়, না পেলে রোদন ,—
মাতার হৃদয়োপরে,
প্রহারে যুগল করে,
সবলে কুন্তল ধরি করে আকর্ষণ ,—
জননী বেদনা পায়,
সরোষ-নয়নে চায়,
চোখে চোখে মিলে পুনঃ হাস্যে দুই জন-
আছে কি প্রেমের ছবি কোথায় এমন ।

৮

সুতের অশুভ যায়,
যদি শত সুখ তায়,
জননীর চিত্ত কভু সে দিকে না চায় ।
সদা পুণ্য-পথে গতি,
কোমল করুণ মতি,
মাটিতে চলিতে কীট দলিতে ডরায় ।
যদি কভু ক্রোধভরে,
কারে কটূ-উক্তি করে,
অভিশাপ ডরে পুনঃ ধরে তার পায় ।

স্নেহের প্রশংসাভরে,
হৃদয়ে না হর্ষ ধরে,
উছলে নয়ন, স্তন স্রবিত ধারায় !—
পুণ্যপ্রেম-আপ্লাবন ধরে না ধরায় !

৯

সুরভি-পরশভরে
যথা শূন্য তরু'পরে
প্রকটে কলিকাকুল বিবিধ বিধান ,—
জননীর শিক্ষাদানে,
সেরূপ শিশুর প্রাণে,
বিকসিত নিত্য নব ভাব, নব জ্ঞান ,
মালী যথা কীটকুলে,
বধে তরু হ'তে তুলে,
ধ্বংসে মাতা, সহজাত কুমতি তেমন,—
দেব গুরু প্রণমিতে,
প্রিয় বাক্যে সম্ভাষিতে,
ছাড়িতে অশুভাচার, অসত্য ভাষণ ;—
কে ত্বরা শিখাতে পারে জননী যেমন !

১০

প্রভাতের অধ্যয়নে
ত্বরা পাঠ বসে মনে,
শৈশব সমান কাল নাহি শিখিবার ,-

অঙ্কুরে নমিত হয়,
তরু চির-বাঁকা রয়,
এ জনমে নাহি ঘুচে বাল্যের সংস্কার,
মাতার মুখের বাণী,
শৈশবে নিশ্চিত মানি,
মুষ্টিমধ্যে বারণ, বিশ্বাস তায় করে ;—
এক বর্ষে শ্রমভরে,
যে কিছু শিখাবে পরে,
এক মাসে মাতৃ-বাক্যে হৃদয় তা ধরে ;—
তুষিয়া শিখাবে মাতা, প্রহারিয়া পরে !

১১

স্মরিয়া মায়ের মায়া,
পুলকে না পূরে কায়া,
আঁখি না রসাক্ত হয়,—হেন যেই জন !
তার কাছে না থাকিব,
তারে নাহি বিশ্বাসিব,
করে মম কণ্ঠনালী করিবে ছেদন !
মুখে মাতৃ-নিন্দা ফুটে,
ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চি(য়া) উঠে,
বিষ-ভরা মুখে করে অনল বমন .
জননীরে কটু ভাসে,
উল্লাসি নরক হাসে ;—
কট-কট-রবে করে কপাট-পাটন,—
শাণ দেয় শস্ত্রচয় যমচরগণ।

১২

বিকার-বিষাদ-হীন,
কোথা সে সুখের দিন!—
হা শৈশব-বসন্ত—সন্তোষ-ফলময়!
সে ধরা কি আছে আর,
অথবা এ ছায়া তার!
আছে সব শব হেন, সে সজীব নয়!—
ফলে সে মিষ্টতা নাই,
সে বাস না ফুলে পাই,
শীতল সে সরঃস্নানে তেমন না হয়!—
নাই সে শরীর মন,
তবু আমি সেই জন,
ফুটিতেছে ক্রমে হৃদে স্মৃতি সমুদয়!—
ফল-ফুল নাই—বন আছে কাঁটাময়!

১৩

আর কি সে তনু আছে,
ছিল যা মায়ের কাছে!—
কোথা ফুল্ল সে কপোল, সে ফুল্ল নয়ন!—
কোথা নৃত্য হর্ষভরে,
কোথা করতালি করে,
কোথা সে চপল কায়, সপুলক মন—
কোথা খল-খল হাস,
কোথা কল কল ভাষ,

সে সুষুপ্তি সুখময় নাহি পাই আর।
ভাবি-ভয় বিবর্জ্জিত,
কোথা সে অদীন চিত,
নিকুঞ্জে না দেখি আরাধ্যের দেবতার!
দেখিতে না পাই হাসি মুখে প্রতিমার!

(৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)

প্রহরী।

চারিদিকে গ্রন্থরাশি পাঠের আগার মাঝে
বসিয়া নাসিরউদ্দিন জ্ঞানের সাধক সাজে।
কি আনন্দে মগ্ন যোগী! কঠোর সে সাধনায়,
স্বরগের সুধা-ধারা হৃদিমাঝে ব'য়ে যায়।
আনন্দে উঠিছে ফুটি, পবিত্র উজল হাসি,—
কোরাণ নকলে রত: চারিদিকে গ্রন্থরাশি।
সহসা চাহিয়া মুখ কঙ্কণের ঝণংকারে
দেখেন পাঠান রাজ বেগম দাঁড়ায়ে দূরে।
ফুল্ল পারিজাত সম হাসি হাসি মুখখানি,—
কে যেন দিয়েছে তায় বিষাদ কালিমা টানি'।
পড়িতেছে গণ্ডবহি' দর বিগলিত ধারা,
নত মুখে, মহারাণী কাঁদিছেন আত্মহারা।
অতি সন্তর্পণে রাখি ক্রোড় হ'তে বহিখানি
চলিলা সম্রাট ত্বরা, যথা ছিল মহারাণী।

আদরে মুছায়ে অশ্রু অতীব কোমল স্বরে
বলিলেন "প্রিয়তমে, কি হয়েছে বল মোরে।"
স্বামীর আদরে অশ্রু আরো দ্রুত ধারে বয়,
ভাবাবেগে মহারাণী-নিশ্চল নির্ব্বাক্ রয়।
বহুক্ষণ পরে শেষে বলিতে লাগিল ধীরে,
"জাঁহাপনা! শেষ বাঁদী ছিল যে আমার তরে,
তোমার আদেশে আজি বিদায় দিয়াছি তায়,
সেকিতে ছিলাম রুটি দেখ হাত জ্বলে যায়।
নষ্ট হ'য়ে গেছে রুটি, কাঁদিতেছিলাম তাই;
তোমার আহার তরে আর কিছু ঘরে নাই।
বিশাল এ ভারতের সম্রাট্ আমার স্বামী,
একটি বাঁদীও কিগো পেতে নাহি পারি আমি?
পুড়েছে আমার হাত, তুমি রবে অনাহারে,
অগণিত ধনরত্ন রাজ-কোষে কার তরে?"
থামিলেন মহারাণী, সম্রাট্ বলিল ধীরে,
"মহারাণি! কাঁদিতেছ শুধু তুমি এরি তরে?
হাত পুড়িয়াছে তব, মোর হাত আছে ঠিক,
এর জন্য এত কাঁদা! ছিছি মহারাণি! ধিক্!
তুমি যদি নাহি পার করিবারে গৃহ-কাজ,
নিজ হস্তে লব তাহা, আমিই করিব আজ।
আমি ভেবেছিনু বুঝি অঙ্গ, বঙ্গ, উড়িষ্যায়,
দারুণ দুর্ভিক্ষ ক্লেশে বহু লোক মারা যায়;
তারি জন্য বুঝি তুমি কাঁদিতেছ গৃহ-কোণে,
প্রজাদের শোক বুঝি বিষম বেজেছে প্রাণে।

প্রিয়তমে ! এই দুঃখে এ ভাবে কাঁদিতে আছে ?
ভাব দেখি, তোমা চেয়ে কত দুঃখী দেশ মাঝে—
সদা নিদারুণ দুঃখে করিতেছে হাহাকার !
তুমি কাঁদিতেছ ভাবি' এক বেলা অনাহার ?
অগণিত ধনরত্ন রাজার ভাণ্ডারে আছে ,
আমার ভাণ্ডার নয়, তার পানে চাওয়া মিছে ।
আমি ত প্রহরী মাত্র, নাহি মোর অধিকার,
সে ধনের কণামাত্র করিবারে ব্যবহার ।
প্রত্যহ কোরাণ লিখি করি যাহা উপার্জ্জন,
তাহাতেই দু'জনার চলে গ্রাস-আচ্ছাদন ।
পরধনে লোভ করা সে কি ভাল মহারাণি ?
তোমার সে ভাব নয়, আমি তাহা ভাল জানি ।
নিরুৎসাহ না হইও, মনে রেখো দিনমান
মাথার উপরে থাকি দেখিছেন ভগবান ।"

(অজ্ঞাত কবি

বঙ্গবাণী ।

দ্যুলোক ভূলোক পুলকি' আলোকে জননী আমার রাজে,
অযুত ভক্ত অমল রক্ত মরম কমল-মাঝে ।
মুঞ্জরে ফুল চরণে ভৃঙ্গ গুঞ্জরে মধুবাণী,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী । (১)

'চণ্ডীদাস' যে মণ্ডিল শির হীরক-কিরীট-ভাবে,
'জ্ঞান' 'গোবিন্দ'* বৃন্দাবনের সুন্দর ফলহারে,
'লোচন'+ ঢালিল পাদ্য, গোরার লোচন-সলিল আনি,
আমার বঙ্গবাণী, সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী। (২)
দ্বৈপায়নের ভৃঙ্গার জলে অভিষেক করে 'কাশী',
'কবিরাজ'‡ আনে ভক্ত হিয়াতে ধূপ ধূনা ধূমরাশি,
'কৃত্তি' জ্বালিল বর্ত্তি তমসাতীর্থের হবি আনি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী। (৩)
'কবিকঙ্কণ'§, দিল কঙ্কণ ক'রে চণ্ডীর গানে,
'কবিরঞ্জন'¶ রঞ্জিল পদ হৃদয় রক্ত দানে,
'রায় গুণাকর'|| আরতি আলোকে উজলে অঙ্গখানি,
আমার বঙ্গবাণী, সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী। (৩)
'প্রভাকর** প্রভাকরে' দিল টিপ, ভাল উজলিয়া জাগে,
'রঙ্গ'++ ভূষিল ক্ষত্র তেজের অরুণ অঙ্গরাগে,
'দাশরথি'‡‡ দিল নবনী আনিয়া পল্লী-পরাণ-ছানি,
আমার বঙ্গবাণী, সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী। (৫)

* বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

\+ সুপ্রসিদ্ধ কবি লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

‡ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত প্রণেতা।

§ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী চণ্ডী কাব্যের প্রণেতা।

¶ পরম ভক্ত ও সিদ্ধ কবি রামপ্রসাদ রায় কবিরঞ্জন।

|| রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদা-মঙ্গলাদি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা।

** কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর-নামক সংবাদপত্রের প্রণেতা।

++ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মিনী উপাখ্যান প্রভৃতি কাব্যের প্রণেতা।

‡‡ দাশরথি রায়ের পাঁচালি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

বহে 'অক্ষয়' 'বিদ্যাসাগর' নৈবেদ্যের থালা,
'দীনবন্ধু' সে গৃহপ্রাঙ্গণে ধরিল গন্ধ-ডালা।
পুরোহিত শুচি যার পূত-রুচি 'ভূদেব' বিগত-গ্লানি,
আমার বঙ্গবাণী, সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী। (৬)
'বঙ্কিম' তার অঙ্কিল চারু কাজল উজল আঁখে,
'নবীন' ঘোষিল জয় বাণী যার পাঞ্চজন্য শাখে,
'হেমের' হৈম হৃদয়-বীণাটি শোভিল শুভ্র পাণি,
আমার বঙ্গবাণী, সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী। (৭)
মরালের মত "মধু" গান-রত চরণ বেড়িয়া ভাসে,
"গিরিশ" হরষে হরিচন্দন বরষে নূপুর পাশে।
নিখিলের শির কবি "রবি" যার চরণে আনিল টানি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের বাণী। (৮)
হাসি-কান্নার হীরা-পান্নার দুল দিল "দ্বিজরাজ"*
"রজনী" করেছে রজনীতে খেলা, প্রভাতে "প্রভাত"† আজ,
দেব নর ঋষি মিলিয়াছে আসি' পুষ্পাঞ্জলি-পাণি,
আমার বঙ্গবাণী, সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী। (৯)

(শ্রীকালিদাস রায়)

(*) কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ইনি যেমন হাস্যরসের তেমনি করুণরসের কবিতায় সিদ্ধহস্ত।

(†) উপন্যাস-লেখক প্রসিদ্ধ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

হাসি ও অশ্রু।

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে' অর্দ্ধ জীবন করেছিতো অপচয়!
চলে' যারে সুখের রাজা, দুঃখের রাজা নেমে আয়!
গলা ধ'রে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়;
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে বসবাস—
ইহাই আমার ব্রত হোক, ইহাই আমার অভিলাষ।
নিয়ে আয় সেই সীতার ভাগ্য, দময়ন্তীর অশ্রুধার,
শকুন্তলার পরিত্যাগ, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার,
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক,
হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বান্ত—নিয়ে আয় সেই অশ্রু-লোক।
সীজার হানিবলের * পতন, সেকেন্দরের রাজ্যলোপ,
নেপোলিয়ন-বিপক্ষেতে সারিবদ্ধ ইয়োরোপ,
দারার মাথার উপর খড়্গ, ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুভয়,
পাণিপথে বিশ্বজয়ী মহারাষ্ট্রের পরাজয়,
সে সব দৃশ্য নিয়ে আয় রে—সুখের দৃশ্য সুখে থাক—
আজি আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বহে' যাক।
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল—
ওরে তোরা হাত ধরে' আমায় সেথায় নিয়ে চল।

* সীজার রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও নানা বিষয়ে অতুলনীয় শক্তিসম্পন্ন। সেনেট্ সভার সভ্যেরা চক্রান্ত করিয়া ইঁহাকে ঐ সভাগৃহ মধ্যেই নিহত করেন।

হানিবল—বীরত্বে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কার্থেজের সহিত রোমের যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি রোমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করেন। শেষে সৈন্যাভাবে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।
কর্ম্মের জন্য দেহপাত ও ধর্ম্মের জন্য জীবনদান!
সত্যের জন্য দৃঢ়ব্রত, পরের জন্য নিজের প্রাণ,
বুভুক্ষুকে ভিক্ষা দেওয়া, ব্যাধির পার্শ্বে জাগরণ,
নিরাশ্রয়কে গৃহ দেওয়া, আত্মরক্ষা দৃঢ়পণ;
পিতার জন্য পুরুর * কুষ্ঠ, পরের জন্য ভীষ্মের † প্রাণ,
ভগীরথের তপস্যা ও দধীচির সেই অস্থি দান,
গান্ধারীর সেই স্নেহের উপর স্বকীয় কর্ত্তব্য-জ্ঞান,
সীতার সেই স্বর্গীয় ক্ষমার আলোকিত উপাখ্যান,
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস,—
সেই বাজ্যো নিয়ে যা'রে কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে,
শেষে প্রাণের উজানটানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে দে।

(৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

* শুক্রাচার্য্যের শাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলে পুরু আপনার যৌবন পিতাকে দিয়া, স্বয়ং পিতার জরা গ্রহণ করেন। [মহাভারত দ্রষ্টব্য]

† ভীষ্মদেবের সমগ্র জীবনই পরার্থে নিয়োজিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয়ী করিবার জন্য নপুংসক শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুনকে শরক্ষেপণের উপদেশ দেন ও তাহাতেই প্রাণত্যাগ করেন। [মহাভারত দ্রষ্টব্য]

বন্দী।

ভেবেছিলাম আমার প্রতাপ করিবে জগৎ গ্রাস,
আমি রব একলা স্বাধীন সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনী দিন লোহার শিকল খানা,
কত আগুন, কত আঘাত, নাইক তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হ'য়েছে কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে আমারি এই ডোর।

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দুই বিঘা জমি।

শুধু বিঘে দুই, ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে,
বাবু বলিলেন,—"বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি—"তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই,
চেয়ে দেখ মোর আছে বড় জোর মরিবার মত ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে :—"বাপু! জানত হে, করেছি বাগান খানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীর্ঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি,
সজল চক্ষে,—"করুন রক্ষে কাঙ্গালের ভিটাখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ, সে মাটি সোণার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া?"
আঁখি করি লাল, রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌন ভাবে,
কহিলেন শেষে, ক্রুর হাসি হেসে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"
পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—

কবিল ডিক্রি সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে !
এ জগতে হায়, সেই বেশী চায়, আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান্ রাখিবে না মোহ-গর্ত্তে,
তাই লিখি' দিল বিশ্ব-নিখিল দু'বিঘার পরিবর্ত্তে !
সন্ন্যাসীর বেশে ফিরি দেশে দেশে, হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোহর দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশি দিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি !
হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে বছর পনর ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হোলো।
নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ-সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি !
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গৃহগুলি।
পল্লব ঘন আম্র কানন, রাখালের খেলা গেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘী-কালোজল নিশীথ-শীতল স্নেহ !
বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্ চান্, চোখে আসে জল ভরে'।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি, রথ তলা করি বামে।
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে,
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ীর কাছে।
বিদীর্ণ হিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি,

প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আম গাছ, একি !
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক কালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম !
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন ?
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতক্ষণে আমারে চিনিল মাতা,
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।
হেন কালে হায় যমদূত-প্রায় কোথা হতে এল মালী;
ঝুঁটী-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তারে, "আমি ত নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তা'রি কলরব ?"
চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধরে', কাঁধে তুলি লাঠি গাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতে ছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, "মারিয়া করিব খুন।"
বাবু যত বলে, পারিষদ দলে বলে তার শত গুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটী আম ভিখ্ মাগি মহাশয়।"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধু বেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি মহারাজ সাধু হ'লে আজ, আমি আজ চোর বটে।

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুণ্ডরীকের প্রতি শ্বেতকেতু।

সমাপ্ত করিনু যবে বিদ্যা চতুর্দ্দশ
কহিলেন প্রিয় ভাষে পিতা স্নেহময়,
"সযতনে সর্ব্ব বিদ্যা শিখাইনু তোরে,
অতুল প্রতিভা-বলে অতি অল্পকালে
সকলি শিখিলি ; শ্রম সার্থক আমার।
কিন্তু বৎস, চিরদিন জানিস্ হৃদয়ে,
অধ্যাপন, অধ্যয়ন, নহেরে দুষ্কর ;
দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত।
নীতি ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিলে যেমন,
প্রতি কর্ম্মে, প্রতি বাক্যে, প্রতি পাদক্ষেপে
তোমাতে সে সব যেন করে অধ্যয়ন
সর্ব্বলোকে। অদ্যাবধি বিস্তীর্ণ সংসারে—
ধরি কর্ত্তব্যের পথ চলিবে আপনি।"

(শ্রীমতী কামিনী রায়)

নিশাকালে বিহঙ্গম-রব।

(১)

যথা চাই, শান্তি মূর্ত্তিমতী ;
না নড়ে পল্লব-বল্লী, নীরব নগর-পল্লী,
রজত-পালঙ্কে নিদ্রা যায় বসুমতী ;

নীরবতা বর্ষিয়া আকাশে,
আপনার মহিমা প্রকাশে,
উথলে ভাবুক-চিতে ভাব-স্রোতস্বতী।

(২)

শুনিলাম কি মধুর স্বর ;
লীলারঙ্গে তালে তালে পবন তরঙ্গজালে,
করিল অমিয়ময় শ্রবণ-কুহর !
যথা কুসুমের কাণে কাণে,
উষানিল মনোহর তানে,
পবিত্র-প্রণয়-গীত গায় নিরন্তর।

(৩)

মরি, এ কি মধুর সঙ্গীত !
দেবর্ষি নারদ নাকি, নীলাম্বর-পথে থাকি,
হরিগুণ-গানে মগ্ন বিমোহিত-চিত,
বীণাপাণি-বীণায় জিনিয়া,
সুধাময় সুস্বর বর্ষিয়া,
জগতের যোগানন্দ করেন বৰ্দ্ধিত।

(৪)

কিংবা বুঝি রাগিণী সুন্দরী,
বিমল তরল-রূপে, মোহিয়া আকাশ-ভূপে,
আরোহি জগৎ-প্রাণ পবন-লহরী,
করিছেন প্রাণরক্ষা ভবে,
শ্রান্তিহরা নিদ্রা আসি যবে,
হরিয়া লইয়া গেছে চৈতন্য-প্রহরী।

(৫)

অথবা কি হৈল দিব্য জ্ঞান !
স্বর্গে বিদ্যাধরী গায়, তাই বুঝি শুনা যায় ?
মর্ত্ত্যে কি সম্ভবে হেন মধু-মাখা গান ?
অপ্সরী কিন্নরী দলে দলে,
নৃত্য করি দেব-সভাতলে,
ধরেছে আনন্দে মজি সুধাময় তান।

(৬)

লোকে বলে গগনমণ্ডলে ;
কালচক্রে অনুক্ষণ, ঘুরিতেছে গ্রহগণ,
তালে তালে বিভুগুণ গাইয়া সকলে ;
বুঝি সেই গীত মনোহর,
শুনিলাম এত দিনান্তর,
জনম সফল আজি হ'ল ভাগ্যবলে।

(৭)

অথবা কি বিবিধ কৌশলে,
করি মহা অনুরাগ, সুখে সাধিতেছে রাগ,
প্রফুল্ল কবির আত্মা নীল নভস্তলে,
দুঃখধাম ধরণী ছাড়িয়া
পঞ্চভূতে পঞ্চ সমর্পিয়া
যাইতেছে ধ্রুবলোকে যবে পুণ্যফলে।

(৮)

কিংবা তুমি অজ্ঞাত বিহঙ্গ ;
প্রসন্নতা-পূর্ণ চিতে, ঢালিতেছ চারিভিতে,
হৃদয়-ভাণ্ডার হ'তে আনন্দ-তরঙ্গ ;

কোথা বাস কি নাম তোমার ?
স্বরগর্ব্ব আছে কোকিলার ;
তব সহ তুলনায় তার স্বর ভঙ্গ।

(৯)

দুঃখ তুমি জান না কখন ,
যন্ত্রণা-জড়িত চিত, নাহি পারে কদাচিত,
করিতে এমন ভাবে মধু বরিষণ ;
যদি তুমি অবনী-নিবাসী,
কোথায় পাইলে সুখরাশি ?
কি উপায়ে ছিঁড়িয়াছ দুঃখের বন্ধন ?

(১০)

চন্দ্রকরে যেমন কাননে ;
যেখানে আলোক হাসে, অন্ধকার তার পাশে.
সেইরূপ সুখ দুঃখ মানব-জীবনে।
আমাদের সুখের সহিত,
চিরকাল যন্ত্রণা মিশ্রিত ;
মধুর সঙ্গীতালাপ বিষের জ্বলনে।

(১১)

এ সংসার-সরসীর জলে,
এক বৃন্তে পুষ্পদ্বয়, ফুটে সুখ দুঃখময়,
কেহ না তুলিতে পারে একটি কমলে,

একের আশয়ে নীরে গিয়া,
উঠে হাতে দুটি জড়াইয়া,
ভ্রমে উভয়ের হার পরে লোকে গলে।

(৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)

ইন্দ্র ও রঘু।

আরম্ভিলা অশ্বমেধ কোশল-ঈশ্বর,
ক্রমে ঊনশত যজ্ঞ করিলা সাধন ;
রক্ষিলা যজ্ঞের অশ্ব রঘু বীরবর,
সঙ্গে ল'য়ে শত শত রাজার নন্দন।
অতঃপর শততম যজ্ঞের কারণ
ছাড়িলা হোমের ঘোড়া অনিবার-গতি,
পাছে পাছে রক্ষিগণ ; ত্রিদশের পতি
অদৃশ্যে আসিয়া অশ্ব করিলা হরণ।
দেখিলা সহসা রঘু, দেব পুরন্দর
ধাইছে পূরব পানে ল'য়ে অশ্ববর,
রথের রশ্মিতে বাঁধি সারথি তাঁহার
দমিছে অশ্বের তেজ, চাপল্য অপার।
ইন্দ্রের নিমেষ-হীন সহস্র নয়ন,
হরিত রথের অশ্ব, করি বিলোকন,
চিনিলা বাসুবে রঘু ; সুগভীর স্বরে
বিদারি গগনতল নিবারিল তাঁরে।

"যজ্ঞের প্রথমে পূজা, ত্রিদিব ঈশ্বর,
পাও তুমি, এই কথা বলে ত্রিসংসার .
অজস্র যাগেতে রত জনক আমার,
কেন তাঁর যজ্ঞনাশে তুমি হে তৎপর?
"ত্রিলোক-পালক তুমি, দলহ আপনি
দিব্যচক্ষে হেরি যজ্ঞ-বিদ্বেষী দুর্জ্জন,
তুমি যদি নাশ যজ্ঞ, সুরকুল-মণি,
কোথা রবে যাগ-যজ্ঞ ভজন পূজন?
"যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এই তুরঙ্গম
দেহ ছাড়ি, দেবরাজ, নিবেদন মম;
দেখায় বেদের পথ যেই মহাজন
পাপের পঙ্কিল পথে চলে কি কখন?"
রঘুর সুতেজ বাক্য করিয়া শ্রবণ,
বিস্ময় মানিল মনে ত্রিদিশ-ঈশ্বর,
নিবারিলা নিজ রথ: বাসব তখন
বারিদ-গম্ভীর-স্বরে করিলা উত্তর।
"যা বলিলা সত্য বটে ক্ষত্রিয়-কুমার,
নিজ যশ রক্ষিবারে সবার প্রয়াস,
যে যশে যশস্বী আমি জগতে প্রকাশ,
সে যশ খণ্ডিতে চাহে জনক তোমার।
বেদের বচনে হরি 'পুরুষ-উত্তম',
'মহেশ্বর' নাম একা ধরেন শঙ্কর,
'শতক্রতু' নাম আমি ধরি অনুপম,
বল এই নামত্রয় পায় কি অপর?

"এই হেতু হরিয়াছি আমি অশ্ববরে ;
বিফল প্রয়াস তব, যাও ফিরে ঘরে ;
কেন হে আমার হাতে হারাইবে প্রাণ,
কপিলের কোপে যথা সগর-সন্তান ?"
হাসি উত্তরিলা রঘু নির্ভয় অন্তর—
"এ প্রতিজ্ঞা যদি তব, দেব পুরন্দর,
ধর অস্ত্র, দেহ রণ, না জিনি রঘুরে,
নারিবে রাখিতে ঘোড়া কহিনু তোমারে।"
এত বলি রঘুবীর চাহি ইন্দ্র-পানে
কোদণ্ডে যুড়িলা শর, আলীঢ়ে* সত্বরে
দাঁড়াইলা বীরদর্পে, দীর্ঘ কলেবরে
জিনিয়া পিনাক-পাণি স্বয়ম্ভু ঈশানে।
কুপিলা মঘবা† শুর রঘুর বচনে
সুবর্ণ-বাণের ঘায় ব্যথিত অন্তরে
বরষিলা শরজাল ভীম শরাসনে,
ইন্দ্রধনু-চ্ছটা পড়ে নবঘনোপরে,
রঘুর ময়ূরপুচ্ছ বাণ খরশাণ
ইন্দ্রের অশনি-ধ্বজা করিল ছেদন,
সুরশ্রীর কেশ যেন হইল কর্ত্তন,
অপমানে ক্রোধে ইন্দ্র অনল সমান।

* আলীঢ়—শরক্ষেপণের সময়ে এক প্রকার উপবেশন—ইহাতে দক্ষিণ পদ অগ্রে রাখা হয়।

† মঘবন্—ইন্দ্র।

বাধিল তুমুল রণ রঘু-পুরন্দরে,
অধে ঊর্দ্ধে শরজাল ছুটিছে সঘন!
সপক্ষ ভুজঙ্গ যেন ছাইল গগন,
দেবসেনা রঘুসৈনা স্তম্ভিত অদূরে।
হরিচন্দনেতে লিপ্ত দেবরাজ-করে
স্বনিছে ধনুর গুণ গভীর গর্জ্জনে,
গরজে ভীষণ সিন্ধু যেমতি মন্থনে :
কাটিলা সে গুণ রঘু অর্দ্ধচন্দ্র-শরে।
ত্যজি ধনু দেবরাজ মহা ক্রোধভরে
তুলিলা নাশিতে রিপু অশনি ভীষণ,
স্ফুরন্ত জ্যোতির রাশি সাক্ষাৎ শমন
চূর্ণ গিরিকুল-পক্ষ যাহার প্রহারে!
বক্ষেতে বাজিল বজ্র, পড়িলা কুমার ;
হাহাকার করে সেনা, পড়ে অশ্রুনীর,
ক্ষণ পরে সংবরি উঠিলা রঘুবীর,
হরষে কুমার-সেনা গর্জ্জিল আবার।
পুনঃ আরম্ভিলা রঘু কঠোর সমর,
খরতর শরজালে ছাইয়ে অম্বর :
রঘুর বীরত্বে ইন্দ্র পাইলেন প্রীতি,
শত্রুও গুণের বশ, বীরের এ রীতি।
প্রীত হ'য়ে রঘুরে কহিলা বজ্রপাণি,
"যে বজ্র-আঘাতে মম টলে হে ভূধর,
কার সাধ্য তোমা বিনা সহে সে অশনি?
ছাড়ি হোম-অশ্ব, মাগি লহ অন্য বর।"

ইন্দ্রের বচন শুনি দিলীপ-সন্ততি,
স্বর্ণ-পুঙ্খ বাণ-তেজে উজ্জ্বলিত করে
রাখিলা সে বাণ পুনঃ তূণের ভিতরে ;
উত্তরিলা যুবরাজ, দেবরাজ প্রতি—
"যদি না ছাড়িবে অশ্ব, দেব আখণ্ডল,
বিধিমতে শত যজ্ঞ হ'লে সমাপন
জনমে যে ফলরাশি, দেহ সেই ফল
জনকে, অজস্র ব্রতে ব্রতী অনুক্ষণ।
রুদ্রতেজে তেজী পিতা যজ্ঞের সভায়,
অপরে সমীপে তাঁর যাইতে না পারে,
দেহ আজ্ঞা, দেবদূত যাউক তথায়
বিবরিয়া এ বারতা কহিবে তাঁহারে।"
'তথাস্তু' বলিয়া ইন্দ্র করিলা গমন,
চালাইল দেবরথ মাতলি সারথি ;
সেনা সহ ফিরে রঘু আপন ভবন,
হারায়ে যজ্ঞের অশ্ব নিরানন্দ-মতি।

(৺নবীনচন্দ্র দাস)

সীতা ও সরমার কথোপকথন।

একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা, আঁধার কুটীরে
নীরব ! দুরন্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসবকৌতুকে—

হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি.
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল। বসিছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়িছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-বারতা!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে!
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে; সরমা সুন্দরী,—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধবেশে।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুরস্বরে, "দুরন্ত চেড়ীরা

তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে,
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি! আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর, সধবা তুমি, তোমারে কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি।
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি।"
কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিল ফোঁটা
সীমন্তে, সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারারত্ন যথা।
দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা!
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব আকাঙ্ক্ষিত
তনু, কিন্তু চিরদাসী দাসী ও চরণে।"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিশ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকল,
চিহ্নহেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!

মণি, মুক্তা, রতন কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে ?"
কহিলা সরমা, "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ংবর-কথা তব সুধামুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি !
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমা রক্ষোরাজ, সতি ? এই ভিক্ষা করি,
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী ।
কি ছলে ছলিলা রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে,
এ চোর ? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে !"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া ।—
"ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে—
বাঁধি নীড় থাকে সুখে, ছিনু ঘোর বনে
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবন সম ।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি,
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, দেখ ভাবি মনে,

কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি, মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু, কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে।

"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘুকুলবধূ আমি! কিন্তু এ কাননে
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি।
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটীবনচর মধু* নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক-† গীতে
খোলে আঁখি? শিখিসহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক নর্ত্তকী
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গ,—স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘনবর-শিরে,
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে

* বসন্তকাল।
† চৈতন্য-কারক, নিদ্রাভঙ্গসময়ে স্তুতি-পাঠক।

মহাদরে, পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা
আপনি সুজলবতী, বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসী মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে, হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?"
 এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে!
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে!
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে।
 "স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে, কি কাজ স্মরিয়া ?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে!"
 উত্তরিলা প্রিয়ংবদা ; (কাদম্বা * যেমতি
মধুস্বরা)—"এ অভাগী, হায় লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে

* শ্যামপক্ষী, কলহংসী

এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।—
"বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি
বারিরাশি দুই পাশে, তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে!
কে আছে সীতার আর এ অররুপুরে * ?
পঞ্চবটী বনে মোরা, গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি † আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবী-করে!
সরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভু
সৌরকররাশি-বেশে সুরবালাকেলি
পদ্মবনে ‡; কভু সাধ্বী ঋষিবংশবধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন, রঞ্জিত আহা কত শত রঙে;
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়; কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,

---

* রাক্ষস-পুরীতে।

† মহারণ্য-শোভা।

‡ প্রস্ফুটিত পদ্ম সকলের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া, যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, উহাই যেন দেবকন্যাগণের ক্রীড়া।

গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি ;
কভুবা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগনে যেন নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল-রসাল-মূলে ! কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ! কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?" নীরবিলা আয়তলোচনা
বিষাদে ! কহিলা তবে সরমা সুন্দরী,—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে !

রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ, নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা ?
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনি !
কহ দেখি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণাধ্বনি, দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লবমাঝারে
সরস মধুর মাসে, কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !"

(৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত).

শক্তিশেল-বিদ্ধ লক্ষ্মণের মুমূর্ষু অবস্থায় রামচন্দ্রের বিলাপ।

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে,
"রাজ্য ত্যজি বনবাসে নিবাসিনু যবে
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে নিত্য নিশাকালে,
ধনু করে, হে সুধন্বি ! জাগিতে সতত
তুমি ! আজি রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি
বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে

বিরাম! রাখিবে আজি কে, কহ আমারে?
উঠ বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে
প্রাণাধিক, কহ শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃ-কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়! না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভূক্-সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুল-জয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে।
তোমার শয়নে হনূ বলহীন বলী,
গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বিষাদে
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলিদল! উঠ ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি।
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।

শক্তিশেল-বিদ্ধ লক্ষ্মণের মুমূর্ষু অবস্থায় রামচন্দ্রের বিলাপ

নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধাবেন যবে
মাতা, 'কোথা রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি ব'লে বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ?
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে, হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন, মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা, তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ? আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি ! দয়াময়ী তুমি,
শিশির-আসারে নিত্য সরস* কুসুমে

* রসযুক্ত (সিক্ত) কর।

নিদাঘার্ত্ত, প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ! বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে,
বাঁচাও করুণাময়,' ভিখারী রাঘবে ।
(৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত

স্বভাবের শোভা ।

একদা নিদাঘকালে নিশীথ সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয় ।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে ।
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
ডুবিল বিমল-সুখ-সিন্ধু-জলে মন ।
উত্তালতরঙ্গময় সাগর সমান,
কোলাহল-পূর্ণ ছিল যেই জনস্থান,
নির্ব্বাত-তড়াগসম হ'য়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগভীর শান্ত-দরশন ।
তরু'পরে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
সুধার সুধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে ।
ভুবনব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস,
বোধ হয় প্রকৃতি-বদন ভরা হাস ।
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে ।

টুপ টুপ পড়িছে শিশিরবিন্দুচয়,
প্রকৃতির আনন্দাশ্রু অনুভূত হয়।
চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে,
সমুজ্জ্বল অগণন তারকা প্রকাশে ;
যেন নীল চন্দ্রাতপ ঝক্ ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সুকৌশলে !
অনন্তর প্রমোদ-অন্তরে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে।
বিকসিত কামিনী-কুসুম-তরুতলে
বসিলাম চিন্তা-সখী সহ কুতূহলে।
মনোরমা সে তটিনী নয়ন-রঞ্জিনী,
নিরমল নীরময়ী মৃদুলগামিনী।
মন্দ মন্দ বায়ুভরে মন্দ মন্দ হেলে,
বিধুর উজ্জ্বল আভা তার হৃদে খেলে।
কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুলকুল,
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল :
আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
নানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কূল।
শশিকরে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি, কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায় !
কোথায় মাধবীসহ জড়িত হইয়া,
সহকার নদী'পরে পড়েছে বাঁকিয়া ;
যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল—দর্পণে
মুখ দেখিতেছে তারা পুলকিত মনে।

কোথাও বাঁশের ঝাড় ঝাঁকিয়া পড়েছে,
কোথাও তেঁতুলডাল হেলিয়া র'য়েছে ;
শোভিছে তাদের ছায়া সলিল ভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে, সমীরণভরে।
সারি সারি তরণী দু'ধারে শোভা পায়,
দাড়ী মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায় ;
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাহিছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।

এইরূপ প্রকৃতির রূপ দরশনে
আহা ! কি বিমল সুখ উপজিল মনে !
শিহরিল কলেবর পুলকে পূরিল ;
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল ;
মনে মনে কহিলাম, "অয়ি সুপ্রকৃতে !
শোভনে, বিচিত্র-চারু-ভূষণে ভূষিতে !
মরি মরি, কিবা তব মোহিনী মূরতি !
নিরখি নয়নে হ'ল জড়প্রায় মতি।
অপরূপ তব রূপ, এক রূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময়।

যখন প্রাবৃট্‌কালে জলদের দল,
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগনমণ্ডল,
ঝম্ ঝম্ রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর,
মাঝে মাঝে ভীম রবে গরজে গভীর,
থেকে থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলা চমকে,
ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে,

কদম্ব কেতকী আদি কুসুমনিকরে,
ফুটিয়া কানন-কায় অলঙ্কৃত করে,
তখন তোমার চারু রূপ দরশনে,
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে ?
সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন
নব পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন,
ফুল্ল ফুল দুর্ব্বাদল চারু আভরণে
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্যবদনে ;
বিহঙ্গ-নিনাদচ্ছলে গাও সুললিত ;
তখন না হয় কার মানস মোহিত ?
এইরূপ যে সময়ে যেই রূপ ধর,
তা'তেই তখন ভব-জন-মন হর ।
সাধে কি গো কত মহা মহা কাব্যকর,
উপেক্ষিয়া নগরের শোভা মনোহর,
গভীর অরণ্যে, ঘন শ্যামল প্রান্তরে,
ভীষণ বিজন গিরি-গহ্বরে গহ্বরে,
হেরিবারে তোমার এ রূপ বিমোহন
অনুক্ষণ স্তব্ধভাবে করেন ভ্রমণ ?
সাধে কি গো ! কবিদের সফল নয়ন,
তুচ্ছ ভাবে অট্টালিকা-স্তম্ভ সুশোভন ?
সামান্য তরুর পাতা করি দরশন
চারু কারু-কার্য্যে তাঁরা বিমোহিত হন ।
ধিক্ সে মনুষ্যগণে ধিক্ ধিক্ ধিক্ !
তোমা চেয়ে শিল্পে যারা বাখানে অধিক !

হেরিতে কৃত্রিম শোভা ব্যগ্র-চিত্তে ধায়,
তোমার সৌন্দর্য্যপানে ফিরিয়া না চায়!
কৃত্রিম কুসুম দেখে প্রসক্ত-হৃদয়,
স্বভাবজ ফুল্ল ফুলে অনুরক্ত নয়;
মনুষ্য-নির্ম্মিত রম্য হর্ম্ম্যের ভিতরে,
বদ্ধ থাকে চিরকাল প্রফুল্ল অন্তরে:
উদ্যান, বিপিন, গিরি করিয়া ভ্রমণ,
তোমার বিচিত্র-রূপ হেরে না কখন;
বনবাসী বিহঙ্গের মধুময় গান
শ্রবণ করিয়া, কভু না জুড়ায় প্রাণ।
বিফল তাদের জন্ম, বিফল জীবন,
বিমল আনন্দ তারা না জানে কেমন।
ধন্য ধন্য সেই সুচতুর শিল্পকর!
যে রচিল তোমার এ তনু মনোহর!
বিচিত্র কৌশল তাঁর অনন্ত শকতি,
বারেক ভাবিলে হয় অবসন্না মতি।
বল গো শোভনে অয়ি প্রকৃতি সুন্দরি!
কে রচিল তোমার এ কান্তি সুখকরী?
কোথা সেই রচয়িতা সর্ব্বগুণাধার?
কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর!

(৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

সীতাহরণে রামের খেদ।

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে
কি করিব কোথা যাব ভাইরে লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে পাব সীতা বল এইক্ষণ॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী নাহি জানায়ে আমায়॥
গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদি আমি হইয়াছি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে।
কৈকেয়ীর মনোঽভীষ্ট পূর্ণ এতদিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে॥
কনক-লতার প্রায় জনক-দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥

দিবাকর, নিশাকর, গ্রহ তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমো-নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার॥
দশদিক্ শূন্য দেখি সীতার অভাবে।
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয় না ভাবে॥
আমি জানি পঞ্চবটি তুমি পুণ্যস্থান।
তাই সে এখানে করিলাম বাসস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলা যে আমারে।
গুণময়ী সীতা মম দিলা তুমি কা'রে॥
শুন পশু পক্ষী মৃগ শুন বৃক্ষ লতা।
বল কে হরিল মম চন্দ্রমুখী সীতা॥
হে অরণ্য ওহে গিরি বন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥

(৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত)

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

দ্বিজসভা-মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ-মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে।
লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে॥

যে লক্ষ্য বিন্ধিবে, কন্যা পাবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয়, চিত্তে হইলা অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি, চাহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া সে দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥
"কোথাকারে যাহ দ্বিজ, কিসের কারণ!
সভা হ'তে উঠি যাহ, কোন্ প্রয়োজন॥"
অর্জ্জুন বলেন, "যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে।"
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, কর্ণ, দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে?
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে॥
বলিবেক ক্ষত্র সবে, লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে?

এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র, দ্বিজগণেরে কহিল॥
"কি কারণে দ্বিজগণ, কর নিবারণ?
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন?
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ?"
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কার্য্যে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ!
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক!
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান!
বাতুল হইল কিংবা করি অনুমান॥
কিংবা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব, নহে কি যা'বে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে নাহি অমনি ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম-নীলোৎপল-আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আ-জানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর জানু সুবলিত ॥
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত
এই ক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে হেন জনে কি কর্ম্ম অশক্য ॥
তবে পার্থ প্রণময়ে ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, চাহি দ্বিজগণে ॥
"লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ॥"
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
"লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হোক দ্রুপদনন্দিনী ॥
ধনু ল'য়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য, বলহ নিশ্চয় ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রচ্ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে ॥

কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্র বিন্ধিবেক যেই জন ॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়িল অর্জ্জুন ॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি ॥
হাতেতে দধির পাত্র ল'য়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥
দেখিয়া বিস্মিত হইল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল, "রহ রহ, যাজ্ঞসেনি।
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি?
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ?
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এই ক্ষণে দিতে পারি ॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল, কে জানে নিশ্চয়?
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মীন কেমনে বিন্ধিল?"

তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে করে জল নিরীক্ষণ॥
কেহ বলে বিন্ধিয়াছে, কেহ বলে নয়।
"ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয়?
শূন্য হ'তে মীন যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
"কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।"
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
"অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহিলে সে কতক্ষণ রবে॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার।
যতবার বলিবে, বিন্ধিব ততবার॥"
এ বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সভাজন স্থিরনেত্রে দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥

দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ॥

(৺কাশীরাম দাস

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে,
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি;
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী;—
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফেরফার।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
বুঝহ ঈশ্বরী, আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি;
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ-বংশজাত,
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত;
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম;
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন!

কু-কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ-ভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি,
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে ;
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।
পাটনী বলিছে, আমি বুঝিনু সকল ;
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবে কিবা বল ?
দেবী ক'ন, দিব, আগে পারে লয়ে চল।
যার নামে পার করে ভব-পারাবার,
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার !
বসিলা নায়ের বাড়ে, নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ !
পাটনী বলিছে, মা গো, বৈস ভাল হ'য়ে,
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে ল'য়ে !
ভবানী কহেন, তোর নায়ে ভরা জল,
আল্‌তা ধুইবে, পদ কোথা থুব বল্‌ ?
পাটনী বলিছে, মা গো, শুন নিবেদন,
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙা চরণ।
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিলা তুখানি পদ সেঁউতী উপরে।

বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র, যে পদ ধেয়ায়,
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়,
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে,
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে?
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে।
সোণার সেঁউতী দেখি পাটনীর ভয়;
এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়!
তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিলা,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিলা।
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী;
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে, চক্ষে বহে জল,
দিয়াছ যে পরিচয়, সে বুঝিনু ছল।
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলে পদ,
কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়;
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয়।
তপ জপ জানি নাহি, ধ্যান জ্ঞান আর;
তবে যে দিয়াছ দেখা, দয়া সে তোমার।
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য-উদয়,
সেই দয়া হ'তে মোরে দেহ পরিচয়।
ছাড়াইতে নারি, দেবী কহিলা হাসিয়া,
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া।

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা।

আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে,
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব,
বর মাগ মনোমত, যাহা চাহ দিব।
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে,
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান,
দুধেভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘরে যায় ;
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।
সাত পাঁচ মন করি, প্রেমেতে পূরিল,
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল।
তার বাক্যে মজুন্দারে' প্রত্যয় না হয়,
সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়।
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি ;
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি ;
গন্ধে আমোদিত ঘর, নৃত্য বাদ্য গান ;
কে বাজায়, নাচে গায়, দেখিতে না পান।
পুলকে পূরিল অঙ্গ, ভাবিতে লাগিলা ;
হইল আকাশবাণী, অন্নদা আইলা।
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ, কভু না খুলিবে ;
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে।
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার,
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার।

(৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর)

কৈলাস।

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর, কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর, অপ্সরোগণের বাস॥
তরু নানাজাতি, লতা নানাভাতি, ফলে ফুলে বিকসিত
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ, নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে, সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল, শার্দ্দূল রাখাল, কেশরী হস্তি-রাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে, ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সব পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, কেহ না হিংসয়ে কা'রে
যে যা'র ভক্ষক, সে তার রক্ষক, কেহ কা'রে নাহি মারে
নাহি ভেদাভেদ, নাহিক বিচ্ছেদ, শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই, কেবল সুখের মূল॥
চৌদিকে দুস্তর সুধার সাগর, কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদী 'পরে চিন্তামণি ঘরে বসি' গৌরী ত্রিপুরারি॥
নন্দী দ্বারপাল, ভৈরব বেতাল, কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ, ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ, গণিতে কার শকতি॥

(৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর)

উমার আব্‌দার।

গিরিবর! আর আমি পারি না হে, প্রবোধ দিতে উমারে!
উমা, কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান, নাহি খায়
ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা ধ'রে দে উহারে:
আমি পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে॥
কাঁদিয়া ফুলায় আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে
কি পারে?
"আয় আয় মা মা" বলি, ধরিয়া কর অঙ্গুলি, যেতে চায় না জানি
কোথারে!
আমি কহিলাম তায়, "চাঁদ কিরে ধরা যায়?" ভূষণ ফেলিয়া
মোরে মারে!
উঠে বসি গিরিবর, বহু করি সমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে ক'রে,
আনন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে;
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে!!
(৺রামপ্রসাদ সেন)

খুল্লনার নিকটে দেবকন্যার আত্ম-পরিচয়

কহিব কি আর, কুশল বিচার
কহিতে বিদরে বুক।
স্বামী দেশান্তর, সতা স্বতন্তর,
নিত্য দেয় মোরে দুখ॥

গন্ধ-বেণে জাতি পিতা লক্ষপতি,
স্বামী সাধু ধনপতি।
আনিতে পিঞ্জর, গৌড় নগর,
গেছেন রাজ-আরতি॥

করিয়া প্রহার, অষ্ট অলঙ্কার,
সতিনী লইল বলে।
পাট-শাড়ী নিয়ে, মোরে দিল খুঁয়ে,
নিযুক্ত কৈল ছাগলে॥

কুবের সমান, স্বামী ধনবান্,
উজানী সমাজে জানে।
পরিতে বসন, না মিলে ওদন,
ছাগী ল'য়ে ভ্রমি বনে॥

লহনার ভয়, উচিত না কয়,
যো আছে পাড়াপড়্শী।
কহিলে উচিত, করে বিপরীত,
লহনা পাপ-রাক্ষসী॥
উজানী নগরে, দেখি ভাল ঘরে,
বিয়া দিলা বাপ মায়।
সতিনী দুর্ব্বার, যেন ক্ষুরধার,
কাননে ছাগ রাখায়॥
মোর মাতা পিতা, না গণিল সতা,
লহনা কালসাপিনী।
এক ঘরে খেলা, রাহু শশি-কলা,
বাঘিনী সঙ্গে হরিণী।
উদর দহন হয় অনুক্ষণ,
তৈল বিনা ঘোরে মাথা।
বিধি কি নিষ্ঠুর, লবণ কর্পূর,
কা'রে ক'ব দুঃখ কথা॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বশে, নিদ্রার আবেশে,
শুইনু তরুর মূলে।
হারাইয়া ছাগী, আমি যে অভাগী,
ভ্রমি নানা তরুতলে॥
হইয়া আকুল, নাহি বান্ধি চুল,
চাহিয়া ভ্রমি ছাগলে।
যদি ছাগ পাই, তবে ঘরে যাই,
নহে প্রবেশিব জলে॥

নিরবধি ফিরি, ঝোপ দরী গিরি,
সাপে বাঘে নাহি খায়।
বঞ্চিল গোসাঞি, হেন জন নাই,
কোথা ছাগ, তা বুঝায়॥
লহনার ভয়, প্রাণ স্থির নয়,
কেমন করি উপায়।
দিয়া পরিচয়, করিলা অভয়
দেবী মহামায়া তায়॥
(৺মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

মগরায় দুর্জ্জয় ঝড়।

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর-পবনে মেঘ করে দূর্ দূর্॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
নদীজলে বৃষ্টিজলে উথলে মগরা।
কুল যুড়ে বহে জল একাকার ধরা।
করি-কর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার নদী কৈল হারা॥
দিবানিশি সম চারি মেঘের গর্জ্জন।
কা'রো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥

মগরায় দুর্জ্জয় ঝড়।

পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি॥
ছৈ'-ঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥
চণ্ডীর আদেশে বীর ধায় হনূমান্।
ডিঙ্গার চাউনি ভাঙ্গে করে খান খান॥
ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় বীর করে ঢুশাঢুশি।
কৌতুকে হাসেন জয়া সিংহরথে বসি॥
সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার।
বিষম সঙ্কটে পাব কিরূপে নিস্তার॥

(৺মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী)

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকার বিবৃতি ও জীবনী।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় ১২২৭ সালে মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই ক্ষণজন্মা পুরুষ দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়া, নানাগুণে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ইঁহার বয়স যখন ৮ বৎসর, তখন গ্রাম্যপাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পিতার সহিত কলিকাতায় আসেন। ইঁহার পিতা বিদ্যাশিক্ষার জন্য ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ঈশ্বর অসাধারণ প্রতিভা ও যত্নে অল্পকালের মধ্যেই ঐ কলেজের একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার যোগ্যতা দেখিয়া, প্রত্যেক শ্রেণীর অধ্যাপক মহাশয়ই ঈশ্বরকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এইরূপ প্রশংসা ও দক্ষতার সহিত ১৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া, তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং 'বিদ্যাসাগর' এই মহনীয় উপাধি লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্মজীবন অতি প্রশংসনীয়। উহাতে তাঁহার দান, দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, কার্য্যদক্ষতা, আত্মমর্য্যাদা-বোধ ও তেজস্বিতার পরিচয় ততোঽধিক পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া, ইনি প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি বেতাল-পঞ্চ-বিংশতি-নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। উহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি ওজস্বিতাপূর্ণ। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। রাজপুরুষেরা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কর্ম্ম-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া, অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। এই সময়ে তাঁহার বেতন মাসিক ৫০০৲ টাকা হয়। তিনি বিশেষ দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত দীর্ঘকাল এই কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের নানা বিষয়ে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল; প্রধান প্রধান বিদ্যানুরাগী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ কলেজকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। আবার কিছুকাল পরে যখন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত-ভেদ হয়, তখন তিনি স্বচ্ছন্দে ঐ সম্মান ও অর্থলাভের পদ পরিত্যাগ করেন!

বাঙ্গালাভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট মহোপকৃত। তিনি যে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, ঐগুলির ভাষা প্রাঞ্জল ও আদর্শ সাধুভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার লেখার এই একটী বিশেষ গুণ যে, তিনি যেখানে যে শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন শব্দ বসাইলে, ভাষা সেরূপ সুগঠিত বোধ হয় না। ঐ সময়ে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা ভাল ছিল না। ভাষার ঐ অবস্থায় তিনি এমন সুন্দরভাবে পদ-

যোজনা করিয়া গিয়াছেন যে, এখনও ঐরূপ লেখাই বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে। ফলতঃ, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাস, শকুন্তলা, জীবনচরিত, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ আদরের সহিত প্রচলিত আছে।

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন। দরিদ্রের মলিন মুখ দেখিলেই তাঁহার মন গলিয়া যাইত। তিনি আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত অনেককে মাসিক নিয়মিত সাহায্য করিতেন। ইহা ভিন্ন ঋণদায়, কন্যাদায়, মাতাপিতৃদায়-গ্রস্ত কত ব্যক্তি যে তাঁহার সাহায্যে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ফ্রান্সদেশে অবস্থিতির সময়ে ঋণদায়ে কারাবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যেই তিনি রক্ষা পান। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং ঋণ করিয়াও লোকের দায় উদ্ধার করিতেন।

ইনি দেশ-হিতকর নানাবিধ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মধ্যবিত্ত লোকের পুত্রেরা অধিক বেতন দিয়া রাজকীয় কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিত না। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রোপলিটেন কলেজ স্থাপন করেন। তাঁহার এই কার্য্যের অনুকরণে এদেশীয়-দিগের দ্বারা পরিচালিত আরও কয়েকটী কলেজ হইয়াছে। পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহু বিবাহ করিতেন। ইঁহারই একান্ত যত্নে ঐ প্রথা রহিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তিনি বাল-বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ দিবার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মহাত্মা বিদ্যাসাগর অতি সাধারণ ভাবেই চলিতেন। আহার বা পরিচ্ছদ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে, তাহাকে বড়লোক বলিয়া বুঝা যাইত না। অথচ রাশি রাশি অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র ও তৈজসপত্র অকাতরে দীন দরিদ্রদিগকে মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকাদি হইতে তাঁহার যে প্রচুর আয় ছিল, উহা আপনার বা পুত্র কন্যাদিগের জন্য রাখিয়া যান নাই। এমন কি, বহুকাল কলিকাতায় একটী বাসবাটীও প্রস্তুত করেন নাই। শেষদশায় বন্ধু বান্ধবগণের বিশেষ অনুরোধে একটী বাসবাটী প্রস্তুত হইয়াছে। এই মহাত্মা ১২৯৭ সালের শ্রাবণ মাসে দেশবাসিগণকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কুশ ও লবের পরিচয়।

সীতাদেবী যে সতীসাধ্বী এবং রমণীকুলের আদর্শভূতা, তাহা সকলেই জানিতেন; তথাচ লঙ্কা-সমরের পরে কঠোর অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা তাহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে লইয়া সুগ্রীবাদির সহিত অযোধ্যায় আগমন ও পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রজাগণ যাহাতে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারে, এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রজাগণের মনের ভাব গোপনে জানিবার জন্য তিনি দুর্ম্মুখ-নামক এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর রাখিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিয়া, গুপ্তভাবে প্রজাগণের মনের ভাব জানিয়া আসিত ও রামচন্দ্রকে তাহা

জানাইত। এক দিন দুর্ম্মুখ কোন কোন ব্যক্তির মুখে এইরূপ শুনিয়াছিল, "রাজমহিষী সীতা কিছুকাল রাবণগৃহে ছিলেন। আমাদের রাজা রামচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া গৃহে রাখিয়াছেন। এখন আমাদের স্ত্রীলোকেরা পরগৃহে গমন করিলে, আমরা তাহাদিগকে আর নিবারণ করিতে পারিব না।" দুর্ম্মুখ আসিয়া, ঐ কথা রামচন্দ্রকে বলিলে, তিনি বিবেচনা করিলেন, সীতাদেবী যে পরম সাধ্বী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যখন রাজপদ গ্রহণ করিয়াছি এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রজাদের মনস্তুষ্টি করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—অদ্যও ঋষিশিষ্যের নিকটে ঐরূপ কথা বলিয়াছি, তখন ঐ বাক্যের অনুযায়ী কার্য্য করা আমার উচিত কি না? এইরূপ চিন্তায় অভিভূত হইয়া, রাম সমস্ত রাত্রি অতি কষ্টে অতিবাহন করিলেন। ঐ সময়ে সীতাদেবী পূর্ণগর্ভা ছিলেন এবং স্বামীর নিকট এই প্রার্থনা করেন, 'আমি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে গিয়া মুনিপত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিব, আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।' তাহাতে রামচন্দ্র তপোবন-দর্শনচ্ছলে লক্ষ্মণের সহিত সীতাদেবীকে বাল্মীকির তপোবনে পাঠাইয়া দিলেন। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি যোগবলেই উহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সীতাদেবীকে বিশেষ যত্নের সহিত আশ্রমে লইয়া গিয়া, নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে তাঁহার শোকশান্তির চেষ্টা করেন। অল্পকাল মধ্যেই সেখানে জানকীর দুইটী যমজপুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। মহর্ষি বিশেষ যত্নের সহিত বালক-দুইটীর লালনপালন করেন ও তাহাদের একের নাম কুশ ও অন্যের নাম লব রাখেন।

মহর্ষি রামচরিত অবলম্বন করিয়া যে মহাকাব্য রচনা করেন, উহার নাম রামায়ণ। ইনি আমাদের দেশের আদিকবি। রামচরিত যেমন অতুলনীয়, রামায়ণও তেমনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য। মহর্ষি বাল্মীকি বিশেষ যত্নের সহিত কুশ ও লবকে ঐ সমগ্র মহাকাব্য অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন।

কিছুকাল পরে রামচন্দ্র নৈমিষ ক্ষেত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে নানা দেশের রাজা, মুনি ঋষি ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রিত ও সমাগত হইয়াছিলেন। বাল্মীকি শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া, ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করেন এবং কুশ ও লবকে রামায়ণ গান করিতে উপদেশ দেন। এই প্রবন্ধে ঐ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহোদয়ের 'সীতার বনবাস' গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহর্ষি—(মহান্ ঋষি, কর্ম্মধা), পরম ঋষি, ঋষিশ্রেষ্ঠ।

ঋষি—দৃশ্+কি (কর্তৃবাচ্য) শাস্ত্র-দর্শী।

বাল্মীকি—বল্মীক+ষ্ণি, বল্মীক হইতে উদ্ভূত (নির্গত), আদিকবি, রামায়ণ-প্রণেতা। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে, প্রথমে ইঁহার রত্নাকার নাম ছিল। ঐ সময়ে ইনি দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। দেবর্ষি নারদ কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া, ইঁহাকে রাম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ঐ সময় হইতে রত্নাকর দীর্ঘকাল 'রাম' নাম জপ করিতে থাকেন। পরে বহু বৎসর যোগাসনে বসিয়া তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। তাহাতে ইঁহার দেহ বল্মীক স্তূপে (উইঢিপিতে) আচ্ছন্ন হয়। তাহাতেই বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার প্রণীত রামায়ণ গ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য।

কোকিল-কণ্ঠ—কোকিলের কণ্ঠ-স্বরের ন্যায় কণ্ঠস্বর যাহার (উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি), সুমধুর স্বরে গানকারী, মধুর গায়ক।

নৈমিষ—(নিমিষ+ষ্ণ) পুণ্যক্ষেত্রবিশেষ, এখানে ভগবান্ নিমিষ ক্ষণের (চক্ষুর পলকের অর্থাৎ অতি অল্প কালের) মধ্যে অসুরগণকে নিহত করায় নৈমিষ নাম হইয়াছে।

অরুন্ধতী—নঞ্-রুধ+তন্ কর্তৃবাচ্যে+ঈপ্ স্ত্রীলিঙ্গে; বশিষ্ঠ-পত্নী, যিনি পতির ধর্ম্ম-কর্ম্মের রোধ (প্রতিবন্ধ) না করেন।

প্রতিকৃতি—প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিরূপ।

যদৃচ্ছা-লব্ধ—(কর্ম্মধা ও ৩তৎ) অনায়াস-লব্ধ, স্বচ্ছন্দে (অনায়াসে) যাহা পাওয়া যায়। যদ্-ঋচ্ছ+অ ভাবে+আমণ্ স্ত্রীং।

প্রতি(তী) হার—দ্বাররক্ষক। প্রতিহারী (প্রতি-হৃ+ণিন্ কর্তৃবাচ্য) দ্বাররক্ষক।

রূপ-লাবণ্য—বর্ণ ও আকৃতির সৌন্দর্য্য; রূপ-মাধুরী।

চরিতার্থ—সফল-মনোরথ।

সংশয়াপনোদন (৩তৎ) সন্দেহনিবারণ।

অনির্ব্বচনীয়—নঞ্-নির্—বচ্+অনীয় কর্ম্মবাচ্যে, যাহা বাক্যদ্বারা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, বাক্যাতীত।

সাষ্টাঙ্গ—যাহা অষ্টাঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, ভূমিলগ্ন প্রণামবিশেষ। অষ্টাঙ্গ—জানু, পদ, হস্ত, বক্ষঃ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য, দৃষ্টি এই আট অঙ্গ 'জানুভ্যাঞ্চ তথা পদ্‌ভ্যাং পাণিভ্যামুরসা ধিয়া। শিরসা বচসা দৃষ্ট্যা প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।'

কশ্যপের আশ্রমে।

এই প্রবন্ধ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা' হইতে উদ্ধৃত। মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নামক গ্রন্থের অনুবাদে ঐ 'শকুন্তলা' প্রণীত হইয়াছে।

শকুন্তলার জন্ম, শকুন্ত (পক্ষী)-কর্তৃক লালন, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে পালন, মহারাজ দুষ্মন্তের সহিত গান্ধর্ব্ব বিধানে পরিণয়, দুর্ব্বাসার শাপ, অভিজ্ঞান-প্রদর্শনে শাপ-বিমোচন, অভিজ্ঞান দেখাইতে না পারায় দুষ্মন্তের বিস্মৃতি ও অধর্ম্ম-ভয়ে পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়গুলি মূল প্রবন্ধেই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

কশ্যপ—মরীচির পুত্র। ইনি দেব ও দৈত্যগণের আদিপুরুষ।

দুষ্মন্ত—চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত। ভরত শকুন্তলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নামানুসারেই ভারতবর্ষ (ভরতের রাজ্য) এই নাম হইয়াছে।

স্থান-মাহাত্ম্যে—স্থানের মহিমায় অর্থাৎ তপোবনে যেরূপ শান্তি ও পরস্পর সৌহৃদ্য থাকা উচিত, তাহা দ্বারা।

হিংসা—বধ, হনন।

দ্বেষ—শত্রুভাব, পরানিষ্ট ইচ্ছা করা।

মদ—মত্ততা, গর্ব্ব।

মাৎসর্য্য—আপনার প্রাধান্য মনে করা, অন্যের অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বলা বা দেখান।

অবিকৃত-চিত্তে—বিকারশূন্য মনে অর্থাৎ ক্রোধ বা বিরক্তিশূন্য ভাবে।

হস্তগ্রহ—হস্তদ্বারা গ্রহ (গ্রহণ), মুষ্টি।

অপ্‌সরা-সম্বন্ধে—এই বালকের মাতা (শকুন্তলা) মেনকা অপ্‌সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই সম্পর্কে—শকুন্তলা ও তাঁহার এই পুত্র এই দেব-ভূমিতে অবস্থান করিতেছেন। (দুর্ব্বাসার শাপে মহারাজ দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া ধর্ম্মভয়ে পরিত্যাগ করেন। তখন শকুন্তলা নিরুপায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন। তাহা শুনিয়া, মাতা মেনকা গর্ভবতী শকুন্তলাকে এই কশ্যপের তপোবনে আনয়ন করেন। শকুন্তলা এই স্থানেই এই পুত্রটী প্রসব করিয়াছেন)।

শকুন্ত-লাবণ্য—৬ষ্ঠীতৎপুং। পক্ষীর সৌন্দর্য্য। শকুন্ত—পক্ষী।

জননীর নামাক্ষর—অর্থাৎ শকুন্ত-লাবণ্য শব্দে শকুন্তলা নামের অক্ষর।

মৃগ-তৃষ্ণিকা—মরীচিকা, সূর্য্য-কিরণে জলভ্রম।

মরুভূমিতে সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া, দূর হইতে জলাশয় বলিয়া ভ্রম হয়। তৃষ্ণাতুর হরিণেরা উহাকে জলাশয় মনে করিয়া, সেই দিকে ধাবিত হয়। এজন্য ঐরূপ ভ্রমকে মৃগতৃষ্ণিকাও বলে।

মতিচ্ছন্ন—মতিভ্রম। ছন্ন—ছদ্‌+ক্ত ভাবে।

প্রত্যাখ্যান—অস্বীকার, পরিত্যাগ।

উপেক্ষা—ঔদাস্য, অনাদর।

আদ্যোপান্ত—আদ্য হইতে উপান্ত, ৫মী তৎপুং; উপান্ত অন্তের সমীপে অব্যয়ীভাব।

সাষ্টাঙ্গ—প্রণিপাত-বিশেষ, অষ্টাঙ্গের সহিত প্রণাম।

অপ্রতিহত প্রভাবে—অব্যাহত তেজে। জয়ন্ত—ইন্দ্রের পুত্র।

সৎকার ও সংবর্দ্ধনা—সেবা (অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য পরিচর্য্যা) ও সমাদর (সম্মান প্রকাশ)।

অভিজ্ঞান—স্মৃতিকারক চিহ্ন; যাহা দেখিয়া চিনিতে পারা যায় এরূপ নিদর্শন বস্তু।

প্রদক্ষিণ—দক্ষিণ বাহুকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া যে বেষ্টন।

অক্ষয় কুমার দত্ত।

বাঙ্গালাসাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম চিরস্মরণীয়। এই মহাত্মা ১২২৭ সালে নদিয়া জেলার চুপি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। অক্ষয় কুমার বাল্যে বাঙ্গালা ও পারসি ভাষা শিক্ষা করেন। যৌবনের প্রারম্ভে নিজ অধ্যবসায়ে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া উঠেন। ইঁহার বিদ্যানুরাগ, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকার বিবৃতি।

সুশীলতা দেখিয়া, কলিকাতা যোড়াসাঁকো-নিবাসী ধর্ম্মাত্মা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ইঁহাকে ভালবাসিতেন এবং পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ তত্ত্ববোধিনী-নামে যে সভার প্রতিষ্ঠা করেন, নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত অক্ষয় কুমার কিছুকাল উহার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ঐ সভা হইতে তত্ত্বধোধিনী নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত, অক্ষয় কুমার উহাতে গভীর চিন্তামূলক বহুবিধ প্রবন্ধ লিখিতেন। সুলেখকগণের লেখনী-প্রভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অল্পকালের মধ্যেই গৌরবান্বিত হইয়াছিল। অক্ষয় কুমারের অধিকাংশ প্রবন্ধই বিজ্ঞান ও সমাজনীতি-বিষয়ক। উহাতে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও লিখন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন প্রবন্ধে অসাধারণ কল্পনা শক্তিরও বিকাশ দেখা যায়। ক্রমশঃ তাঁহার নাম শিক্ষিত সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ঐ সকল প্রবন্ধ ও আর কয়েকটী অত্যাবশ্যক প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্য কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তক-গুলির নাম চারুপাঠ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, পদার্থবিদ্যা, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি প্রধান। ইহার পরে তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়-নামক সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত। আর্য্যগণের প্রথমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যাবতীয় বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য তাঁহাকে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের বহুবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও বহুবিধ ধর্ম্মাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে হইয়াছিল। অক্ষয় কুমার চিরজীবন গভীর গবেষণার সহিত নানা বিদ্যার আলোচনা করায় তাঁহার মস্তিষ্কের রোগ জন্মে। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি ঐ শিরঃপীড়ায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রকৃতি বিদ্যাচর্চ্চায় এরূপ আসক্ত হইয়াছিল যে, তিনি ঐ কঠিন পীড়াভোগের সময়েও নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। চিকিৎসক ও বন্ধুগণের নিষেধসত্ত্বেও তিনি ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। অবশেষে স্বাস্থ্যের জন্য তিনি বালি গ্রামে উদ্যান-শোভিত একটী সুন্দর বাটী প্রস্তুত করিয়া সেখানে বাস করিতেন। ঐ বাটীতে অবস্থিতির সময়েই তিনি উপাসক-সম্প্রদায়ের ২য় খণ্ড প্রকাশ করেন।

অক্ষয় কুমারের লেখার বিশেষ গুণ এই যে, উহা কোন পুস্তকের অনুবাদ নহে, অধিকন্তু ঐ সকল প্রবন্ধ প্রাকৃতিক ও নৈতিক বহুবিধ জ্ঞানপূর্ণ, সুসম্বদ্ধ ও যুক্তিমূলক। ঐ সময়ে যে সকল বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে অনেকগুলি সংস্কৃত ও ইংরাজি পুস্তক হইতে অনূদিত। মৌলিক চিন্তামূলক পুস্তক অক্ষয় কুমারের লেখনী হইতেই প্রথমে বাহির হয়। তাঁহার এই সকল পুস্তকের বিষয় ও লিখন-নৈপুণ্য শিক্ষার্থীগণের বিশেষ উপযোগী। যাহাতে শিক্ষার্থীর মনোবৃত্তির উৎকর্ষ ও মানব-সমাজের ক্রমোন্নতি হইতে পারে, এরূপ অনেক প্রবন্ধও অক্ষয় কুমারের লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে।

মহাত্মা অক্ষয় কুমার ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ অনেক বিষয়েই ইঁহাকে আপনার দক্ষিণ হস্ত বলিয়া মনে করিতেন। এই বিশাল

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকার বিবৃতি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল অংশেই যে অনন্ত-জ্ঞান-নিধি বিশ্বপতির মহনীয় মহিমা পরিস্ফুটভাবে দেদীপ্যমান, তাহা এই ধর্ম্মাত্মার লেখনী হইতে শতধারে প্রবাহিত হইয়াছে। কি নদ-নদী, পর্ব্বত-প্রস্রবণ, গিরি-গুহা, ভূমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, কি জীবদেহ, কি মনোময় জগৎ এ সকলের সর্ব্বাংশেই যে করুণাময় বিশ্ব-বিধাতার অপার করুণা, জ্ঞান ও মহিমা উজ্জ্বল অক্ষরে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা ইঁহার বাহ্যবস্তু, ধর্ম্মনীতি, চারুপাঠ ৩য় ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার লেখায় বিষয় ও পদবিন্যাস যেমন সুসম্বদ্ধ, তেমনি ব্যাকরণাদি দোষের সম্পকশূন্য। ফলতঃ, আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি যাঁহাদের সাহায্যে হইয়াছে, অক্ষয় কুমার তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্টভাবে গণনীয় ও চিরস্মরণীয়। ১২৯৩ সালে এই মহাত্মা দেহত্যাগ করেন।

বিহঙ্গম-দেহ। (১৮ পৃঃ হইতে)

বিহঙ্গম—বিহায়স্+গম্+খ কর্ত্তৃবাচ্যে নিপাতন। বিহঙ্গ ও বিহগ (৬) পদও হয়; যাহারা আকাশে গমন করে, পক্ষী।

তরণী স্বরূপ—নৌকা যেরূপ জলে ভাসমান হয়, ইহারাও তেমনি বায়ু সাগরে ভাসিয়া থাকে।

পক্ষি-দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের সহিত তরণীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই উপমাকে মালোপমা বলা যায়।

দণ্ড—দাঁড়। কর্ণ—হাইল।

মাংসাশী—মাংস+অশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবাচ্য; মাংসভোজী।

বড়িশবৎ—বড়িশ+বৎ তুল্যার্থে; কাঁটার মত।

চটক—চটা (চড়ুই) পাখী। চটতি ভিনত্তি ধান্যাদিকং ইতি।

অপরিচ্ছিন্ন—পরিচ্ছেদ শূন্য; ইয়ত্তা দ্বারা যাহার পরিমাণ করা যায় না।

স্বপ্নদর্শন—ন্যায় বিষয়ক। (২০ পৃঃ হইতে)

মানব-সমাজের যাবতীয় কার্য্য ন্যায়ানুসারেই চলা উচিত। রাজা ও রাজ-পুরুষেরা এবং সদাশয় মনস্বী ব্যক্তিরা ঐরূপ চেষ্টাই করিয়া থাকেন। তাহা হইলেও স্বার্থপর ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে ন্যায়-পথ অতিক্রম করিয়া, এমন অনেক কাজ করে, যাহাতে জন-সমাজে অন্যের উপর অত্যাচার ও অবিচার ঘটিয়া থাকে। এই স্বপ্নদর্শন প্রবন্ধে ঐরূপ বিষয়ের বর্ণনা রূপকচ্ছলে করা হইয়াছে।

নীহার-প্রভাবে—হিমকণাদ্বারা।

উদাসীন—উৎ+আস্+শান কর্ত্তৃবাচ্যে; নিঃসম্বন্ধ, সংসারে ঔদাস্যযুক্ত ব্যক্তি।

ক্ষোভ—ক্ষুভ্+অল্ ভাবে; চাঞ্চল্য, দুঃখিতভাব।

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকার বিবৃতি।

বিপর্য্যয়—বি—পরি+ই+অল্ ভাবে ; বিপরীত ভাব ; ব্যতিক্রম অর্থাৎ ন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায়।

সামঞ্জস্য—সমঞ্জস+ষ্ণ্য ভাবার্থে ; পূর্ব্বাপর সমন্বয়।

অনির্দ্দেশ্য—নঞ্ +নির্ +দিশ্ +য কর্ম্মবাচ্য ; যাহা নির্দ্দেশ (নিরূপণ) করা যায় না।

"যিনি সহিষ্ণুতা প্রভাবে........প্রকাশিত হইবেন"—যে ব্যক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে অসুবিধা বা দুঃখে পতিত হইলেও ন্যায়পথ হইতে বিচলিত না হন অর্থাৎ ধর্ম্মপথকেই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করেন, সেই দুঃখ-সহিষ্ণু ব্যক্তিই ধর্ম্মের পরম রমণীয় ভাব অনুভব করিতে পারেন। আর পাপাচারী ব্যক্তিরা ধর্ম্মের প্রখর জ্যোতিঃ দেখিয়া ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।

তৎপরিবেশ-স্বরূপ আলোকঘটা—ঐ জ্যোতির পরিধিস্বরূপ আলোকসমূহ অর্থাৎ ঐ জ্যোতির প্রতিবিম্বে যে উজ্জ্বল আলোক হইয়াছিল তাহা।

লেখ্য পত্র—লিখিত পত্রাদি অর্থাৎ দলিল।

অনুজ্ঞা-পত্র—আদেশ-পত্র অর্থাৎ আদালতের রায় ও ফয়সালা।

ইন্‌সালবেণ্ট কোর্ট—নিষ্কৃতি পাইবার আদালত অর্থাৎ যে আদালতের সাহায্যে দেনাদার (খাতক) মহাজনদিগকে দেনার টাকা না দিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে, সেই আদালত।

"ইন্‌সালবেণ্ট কোর্টের প্রায় সমস্ত নিষ্কৃতিপত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল"—অর্থাৎ মহাজনদিগকে দেনার টাকা দিবার সামর্থ্য নাই—বলিয়া যাহারা আদালতের সাহায্যে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যা প্রমাণের সাহায্যে দেখাইয়াছে যে, আপনারা নিঃসম্বল ও নিরুপায়। প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ ব্যক্তিরা মহাজনদিগকে ফাঁকি দিবার মতলবেই প্রায় আদালতের সাহায্য লইয়া থাকে।

উদারভাবে ব্যয়-ব্যসন করিয়া—উন্নতভাবে খরচ ও আমোদ প্রমোদ করিয়া।

ব্যসন—কাম ও কোপ-জনিত দোষ, নিষ্ফলোদ্যম ; মৃগয়া, দ্যূত, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, বেশ্যাসক্তি, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথাভ্রমণ ও মদ্যপান কামজনিত এই ১০ এবং দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরাচরণ ক্রোধজনিত এই ৮ প্রকার দোষ।

২৫ পৃঃ—"উহাতে লোকসমাজে কি বিষম————তাহার বিবরণ করিয়া শেষ করা যায় না।"————

যে সকল ব্যক্তি ছলে বলে অন্যের সম্পত্তি হস্তগত করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছিল, ধর্ম্মের প্রভাবে কিছুকাল পরে তাহাদের দুরবস্থা ও বিবিধ প্রকার ক্লেশ এবং যে সকল নিরীহ সদাশয় ব্যক্তি দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচারে দুঃখের দশায় পতিত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মবলে তাঁহাদের পুনরায় ঐশ্বর্য্যলাভ ও সম্মান লাভ—এইরূপে পূর্ব্বভাবের যে কত পরিবর্ত্তন হইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে সকল মহামনা ব্যক্তির লেখনী-প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যযুগে এই ভাষা মার্জ্জিত, পরিপুষ্ট ও নবজীবনপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই অগ্রগণ্য। ইঁহার পূর্ব্বে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাত্মগণ যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, উহার অধিকাংশই সংস্কৃত শব্দ-বহুল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষাকে সুগঠিত, প্রাঞ্জল ও অভিনব ভাবে বিভূষিত করিয়াছেন। যেখানে যে চলিত শব্দটী বসাইলে, মনের ভাব বিশদরূপে প্রকাশ হইতে পারে, তিনি এমন নিপুণতার সহিত মধ্যে মধ্যে ঐরূপ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া, তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। চরিত্রগঠনে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তাহার লেখার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, তিনি যেখানে যে বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, উহা পাঠ করিলেই মনে হয়, যেন উহা তৎকালে ঠিক ঘটিতেছে এবং কার্য্যকালে সচরাচর ঐরূপই হইয়া থাকে। আবার বাঙ্গালীর জীবনের যে যে বিষয়ে দোষ বা ন্যূনতা দেখা যায়, যাহাতে ঐ সকল দোষের পরিহার হয়, এরূপ ভাবেও অনেক স্থলে অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, বাঙ্গালাভাষা বঙ্কিমের মধুময়ী বর্ণনা-প্রভাবে সজীব, প্রাঞ্জল ও রসভাবে সমুন্নত হইয়াছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অথচ ইনি আবশ্যকমতে বঙ্গভাষাকে স্থলবিশেষে শব্দ-সম্পদেও সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই মহাত্মা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে সন ১২৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া হুগলী কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে দীর্ঘকাল ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করেন। কৈশোর বয়সেই ইনি বিবিধ সুরস কবিতা লিখিয়া শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হন। ইনি যৌবনে বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তাহাতেই দেশের সর্ব্বত্র খ্যাতনামা হইয়া উঠেন। এই সময়েই তিনি বঙ্গদর্শন-নামক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এদেশের খ্যাতনামা চিন্তাশীল অনেক ব্যক্তিই উহার লেখক হইয়াছিলেন। উহাতে ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, সমাজনীতি, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি নানাবিষয়ের সুচিন্তা-প্রসূত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল লিখিত হইত। উহা দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যে উপকার ও উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই সময় হইতেই বাঙ্গালাভাষা একটী গণনীয় ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এদেশের সুলেখকগণের মধ্যে অনেকেই বঙ্কিমের বন্ধু-স্থানীয় ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কবিবর হেমচন্দ্র, রসরাজ দীনবন্ধু, সাহিত্যবন্ধু অক্ষয় কুমার সরকার, চিন্তাশীল রামদাস সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, দেবীচৌধুরাণী, কৃষ্ণচরিত্র, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের রত্নস্বরূপ। বঙ্গীয় ১৩০০ সালে এই মহাত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

দেবমন্দির।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী-নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে এই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে যে কয়েকখানি উপন্যাস রচিত হইয়াছে, দুর্গেশনন্দিনী উহাদের মধ্যে প্রথম। ইহার নায়ক জগৎসিংহ—জয়পুরপতি প্রসিদ্ধ মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। নায়িকা দুর্গেশনন্দিনী—গড়মন্দারণের জায়গীরদারের একমাত্র কন্যা। এই প্রবন্ধে নায়ক-নায়িকার দেবমন্দিরে প্রথম সন্দর্শনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রদোষ কালে—রজনী মুখে, সন্ধ্যা সময়ে।

নিরাশ্রয়ে—আশ্রয় অভাবে অর্থাৎ থাকিবার স্থান (গৃহাদি) না পাওয়ায় এবং সঙ্গে কেহ না থাকায়।

নীল-নীরদ মালায়—নীলবর্ণ মেঘসমূহে।

দিগন্ত-সংস্থিত—চারিদিকে ব্যাপ্ত, চতুর্দ্দিকে প্রসারিত।

বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত—বিদ্যুতের আলোকদ্বারা প্রকাশিত অর্থাৎ নিমেষমাত্র সময়ে যাহা সামান্যভাবে দেখা গেল তাহা।

নৈদাঘ—নিদাঘ সম্বন্ধীয়, গ্রীষ্মকালীন।

শ্লথ—শিথিল, আল্‌গা।

দ্রব্য-সংঘাতে—দ্রব্যের আঘাতে।

চকিতমাত্র—অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে, আভাসমাত্র।

অবতরণ করিলেন—নামিলেন।

সোপানাবলীর—সিঁড়িগুলির।

সংঘর্ষে—সংঘর্ষে, আঘাতে।

হস্তমার্জ্জনে—হাত বুলাইয়া।

কৌতূহলাবিষ্ট—আগ্রহযুক্ত। কোন অভিনব বিষয় জানিবার জন্য যে মনের ঔৎসুক্য (আগ্রহ) তাহাকে কৌতূহল বলে।

বল-দর্পিত—বলোদ্ধত, সবলে প্রযুক্ত।

অর্গল-চ্যুত—অর্গল-ভ্রষ্ট অর্থাৎ খিল খোলা।

উদ্দেশে—অলক্ষ্যে অর্থাৎ মনে মনে।

অসিচর্ম্ম—তরবারি ও ঢাল।

"রাজপুত হস্তে.........কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না"—অর্থাৎ রাজপুত জাতি স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকেন।

পর্য্যবেক্ষণ—পরি—অব + ঈক্ষ্ + অনট্ ভাবে ; আলোচনার সহিত দর্শন, বিবেচনার সহিত ভাল করিয়া দেখা।

তৎস্বীকৃত স্বর্ণমুদ্রায় লোভ—'প্রদীপ জ্বালিয়া দিলে, স্বর্ণমুদ্রা দিব' ঐ যুবক মন্দির-রক্ষককে এইরূপ কথা বলায়, রক্ষকের যে অর্থলোভ হইয়াছিল, তাহা।

প্রকোষ্ঠ— কফোণি (কণুই) হইতে মণিবন্ধ (হাতের কব্জি) পর্য্যন্ত কর-ভাগ।
পারিপাট্য—(পরিপাটী + ষ্যঞ্ স্বার্থে) শৃঙ্খলা, সুন্দররূপে সন্নিবেশ।
হীনার্ঘতায়—বহুমূল্য না হওয়ায়। অর্ঘ—অর্ঘ + অল্ ভাবে ; মূল্য, পূজার দ্রব্য-বিশেষ ;
সম্পন্না—সম্পত্তিশালিনী।
অসৌষ্ঠব—অসামঞ্জস্য, সৌন্দর্য্যহীনতা।
বক্ষোবিশালতায়—বক্ষোদেশের বিস্তৃতি জন্য ; বুক চওড়া হওয়ায়।
সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে—সকল অঙ্গই বিশেষ প্রশস্ত ও বিস্তৃতভাবে গঠিত হওয়ায়।
"শরীর তাদৃশ দীর্ঘ যে,........ শ্রী সম্পাদক হইয়াছে"—অর্থাৎ অতিশয় দীর্ঘ হইলেও বক্ষঃস্থল বিলক্ষণ প্রশস্ত, হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গগুলিও তেমনি বৃহৎ, অথচ স্থূল। ফলতঃ, যুবকের দেহ অতিশয় দীর্ঘ হইলেও বক্ষঃস্থল, হস্ত, পদ, স্কন্ধদেশ প্রভৃতিও তাহার অনুরূপ দীর্ঘ ও স্থূল। এই জন্যই উহার বিলক্ষণ সামঞ্জস্য (মানান) হইয়াছে। তাহা না হইলে, ঐরূপ লম্বা শরীর অসমঞ্জস (বেমানান) বলিয়া মনে হইত। ইহাতেই ঐ যুবকের সুদীর্ঘ দেহ অসামান্য শোভাজনক বলিয়াই মনে হইয়াছিল।
প্রাবৃট্—প্র + বৃষ্ + ক্বিপ্, বর্ষা। প্রাবৃট্-সম্ভূত—বর্ষাকালে জাত।
বসন্ত-প্রসূত রক্তপত্রাবলীতুল্য—বসন্তকালে জাত নূতন পত্র সকলের মত (আরক্তবর্ণ)।
কবচাদি—সাঁজোয়া প্রভৃতি, বর্ম্মাদি।
কোষ-সংবদ্ধ অসি—খাপের মধ্যে স্থিত তরবারি।

চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাসের উপদেশ।

এই প্রবন্ধ তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের কাদম্বরী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক ; ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পুস্তকাধ্যক্ষ ছিলেন। যে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সীতার বনবাস প্রকাশ করেন, তাহার অল্পকাল পরেই তর্করত্ন মহাশয় মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইঁহার লেখায় পদযোজনা যেমন সুন্দর, তেমনি উহা সদুপদেশপূর্ণ ও অর্থবহুল। বর্ত্তমান প্রবন্ধেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন ; উহা পাঠ করিলেই পাঠকের মন মুগ্ধ হইয়া যায়। ইঁহার অনূদিত বাঙ্গালা কাদম্বরী বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। বিদ্বৎ সমাজে এই পুস্তকের চিরকাল আদর থাকিবে। এরূপ উৎকৃষ্ট জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি অল্পই দেখা যায়।

কাদম্বরী নাটকের নায়ক চন্দ্রাপীড় এবং নায়িকা কাদম্বরী।

যৌবরাজ্য—যুবরাজ + ষ্যঞ্ ; পিতা বর্ত্তমানে তাঁহার সাহায্যের জন্য পুত্রের রাজপদ।
অভিষিক্ত—তীর্থ-জলাদিদ্বারা স্নাত, বৃত।
যুবরাজ—রাজকার্য্যে পিতার সহকারী রাজপুত্র।

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকার বিবৃতি।

সামগ্রী-সম্ভার—সামগ্রী সমূহ।

জ্ঞাতব্য—জ্ঞা+তব্য কর্ম্মবাচ্যে; যাহা জানা উচিত।

উপদেষ্টব্য—উপ+দিশ+তব্য কর্ম্মবাচ্যে; উপদেশের যোগ্য।

যৌবনরূপ বনে প্রবেশ করিলে, বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়—অর্থাৎ বন্য জন্তুরা যেমন যথেচ্ছাচার, উদ্ধত ও হিংসক হয়, যৌবন অবস্থায়ও মানুষের প্রকৃতি তেমনি হইয়া থাকে।

যৌবনের আরম্ভে ....কলুষিত হয়—অর্থাৎ বর্ষাকালে চারিদিকের কর্দ্দম ও মলাদি নদীতে পড়িয়া উহার জলকে যেমন মলিন করিয়া ফেলে, যৌবনের প্রারম্ভেও তেমনি কামক্রোধাদি রিপুসকল প্রবল হইয়া মানুষের মনকে দূষিত ও কুপ্রবৃত্তিময় করিয়া থাকে।

অহঙ্কার ধনের অনুগামী—অর্থাৎ ধন হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে অহঙ্কারের উদয় হয়।

প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই—অর্থাৎ প্রভুত্ব শক্তি হাতে আসিলে, মানুষ অহঙ্কার-বিষে এমন উদ্ধত হয় যে, কিছুতেই তাহার নিবারণ করা যায় না।

অনর্থ-পারাবার—বিপদের সমুদ্র অর্থাৎ ঐগুলি হইতে এত বিপদ্ ঘটে যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

"অসামান্য ধীশক্তি......হইতে পারেন"—যাঁহাদের বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ও বিবেকযুক্ত, তাঁহারাই ঐ বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারেন।

'সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্র-সম্ভূত রত্ন'—অর্থাৎ প্রবাল মণি মুক্তাদি বহুমূল্য রত্নসকল দুর্গম সমুদ্রের গর্ভে পাওয়া যায়। কিন্তু সদুপদেশ উহাদের অপেক্ষাও মূল্যবান্ অর্থাৎ উহাদ্বারা যে কত উপকার হয়, তাহার পরিমাণ করা যায় না এবং উহা অতি দুষ্প্রাপ্য; সমুদ্রগর্ভে অনুসন্ধান করিলেও উহা পাওয়া যায় না।

বৈরূপ্য—বিরূপ ভাব অর্থাৎ মাংসের লোলতা, অঙ্গসকলের শিথিলতা প্রভৃতি।

পারিষদেরা—সভাস্থ ব্যক্তিরা অর্থাৎ সহচরেরা।

অর্থ অনর্থের মূল—অর্থাৎ ধন হইতেই নানা বিপদ্ ঘটিয়া থাকে।

বৈদগ্ধ্য—বিদগ্ধ+ষ্ণ্য ভাবার্থে; পাণ্ডিত্য

স্বার্থ-নিষ্পাদনপর—আপনার ইষ্টসাধনেই যত্নবান্।

দ্যূত ক্রীড়া—পাশ ক্রীড়া।

বিনোদ—আমোদ, আনন্দ।

দুরবগাহ—দুর্ব্বোধ, অতি জটিল।

রাজ্যতন্ত্রের—রাজনীতির।

অরাতিমণ্ডলের—বিপক্ষগণের।

ধন ও ব্যয়।

এই প্রবন্ধটী পণ্ডিতবর রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'বেকন' নামক ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

রামকমল ভট্টাচায্য মহাশয় অসামান্য প্রতিভাশালী ও নানাবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইঁহার অনুজ। উভয় সহোদরই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, প্রশংসার সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইঁহাদের বিদ্যাবত্তার কথা শিক্ষিত সমাজের সকলেই অবগত আছেন। রামকমল বাবু কিছু কাল কলিকাতা নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। ঐ সময়েই ইনি ইংরাজি 'বেকন' নামক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। সমুদায় নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে ঐ অনুবাদের দীর্ঘকাল পাঠনা হইয়াছিল। ইঁহার লেখা যেমন সরল, তেমনি গভীর ভাবপূর্ণ। দুঃখের বিষয়, এই মহাশয় যৌবন অবস্থাতেই দেহত্যাগ করেন।

বিত্ত-শাঠ্য—বিত্ত বিষয়ে (ধন-ব্যয়ে) শাঠ্য (কৃপণতা)।

আপনার ওজন বুঝিয়া অর্থাৎ নিজের অবস্থা কিরূপ, তাহা বুঝিয়া; আপনি কিরূপ দরের লোক অর্থাৎ নিজের আয়, ব্যয় ও সঙ্গতি কিরূপ, তাহা বিবেচনা করিয়া।

উপজীবিগণ—কর্ম্মচারিগণ।

বিকারস্থান—বিকৃতস্থান অর্থাৎ যে যে বিষয়ে অর্থের অপব্যয় হইতেছে, সেই সেই বিষয়।

প্রভুর রাশি বুঝিয়া—মনিবের চাল-চলন বুঝিয়া অর্থাৎ কিরূপ বিষয়ে ও কোন সময়ে প্রভু অসতর্ক থাকেন, তাহা বুঝিয়া।

হস্ত-সঙ্কোচ করিতে—ব্যয় সংক্ষেপ করিতে অর্থাৎ হাত গুড়াইতে।

পারিপাট্য—পরিপাটী+ষ্ণ্য স্বার্থে; উৎকর্ষ, সু-সমাবেশ।

আনৃণ্য—অনৃণীর ভাব, ঋণ-শূন্যতা।

স্থূললক্ষ্য—উচ্চ দৃষ্টি, বড় নজর।

আপদর্থে—আপদের জন্য অর্থাৎ কঠিন রোগ, সাংসারিক অশান্তি, বৈষয়িক কোন গোল-যোগ প্রভৃতি হইলে, তাহার জন্য।

অলম্বুদ্ধি—অলম্ অর্থাৎ ব্যর্থ (নিষ্প্রয়োজন—বৃথা) এইরূপ মনে করা। (অলম্ ব্যর্থ সমর্থয়োঃ—অমর।)

সম্ভূয়-সমুত্থান—(সম্+ভূ+যপ্, সমুত্থান—সমুন্নতি) অনেকে মিলিত হইয়া বাণিজ্য করা, সম্মিলিত বণিক্-সমিতি। সমুত্থায়ীরা—সমবেত বণিকেরা।

কুসীদ—কু—সদ্+শ করণবাচ্যে; কুৎসিত উপজীবিকা, সুদ লওয়া। কুৎসিতং সদনং অনেনেতি—অন্যের শ্রমার্জিত অর্থকে কুৎসিত জীবিকা বলা হয়।

কুসীদ-ব্যবহারে—সুদ লওয়ায়।

স্তব—গুণকীর্ত্তন। চাটুবচন—তোষামোদী কথা; যাহার যে গুণ নাই, তাহার সেই গুণ আছে—এইরূপ কথা।

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকার বিবৃতি।

নির্ব্বিন্ন—নির্ব্বেদ-যুক্ত, খেদ-প্রাপ্ত।
বিত্ত-শাঠ্য—ধন বিষয়ে শঠতা (কাতরতা)।
দায়াদ—পুত্র, জ্ঞাতি, উত্তরাধিকারী, সপিণ্ড।
দায়—দা + ঘঞ্ কর্ম্মবাচ্যে ; পৈতৃক ধন, বিভাজ্য বস্তু।

পৌরুষের পরিণাম

রমেশচন্দ্র দত্ত।

এই প্রবন্ধ এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী প্রবন্ধ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুলেখক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

মনস্বী রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় ১২৫৫ সালে কলিকাতার অন্তর্গত রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দেশ-বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিয়া ঐ পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন। এদেশে আসিয়া, প্রথমে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন। অল্প কালের মধ্যেই ঐ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ হওয়ায় ক্রমে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে আরোহণ করেন। রাজকীয় কার্য্যে ইঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল। তাহা দেখিয়া, রাজপুরুষেরা ইঁহাকে বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত করেন। এই কার্য্যেও ইঁহার অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইনি বিবিধ দায়িত্ব-পূর্ণ শাসন ও বিচার বিভাগের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও বিদ্যালোচনায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনে রমেশচন্দ্রের বিশেষ যত্ন ছিল। ইঁহার প্রণীত শতবর্ষ-নামক উপন্যাস চারিখানি সাহিত্যসংসারে বহুমূল্য রত্ন। ঐ পুস্তকগুলির প্রণয়নে ইঁহাকে ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানাবিধ গ্রন্থের আলোচনা এবং ঐ সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। উঁহার লেখা যেমন প্রাঞ্জল, বর্ণনীয় বিষয়ের সন্নিবেশ-নৈপুণ্যও তেমনি অসাধারণ। উহাতে ধূর্ত্ত, তপস্বী, যোদ্ধা, শান্তিপরায়ণ, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকচরিত্রও তেমনি উৎকৃষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইঁহার বর্ণনার নৈপুণ্য এমন সুগঠিত যে, কিয়দংশ পাঠ করিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পাঠ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি যে কেবল ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনা ও বর্ণনায় যশস্বী হইয়াছিলেন, এমন নহে। ভারতের লুপ্তপ্রায় পুরাতত্ত্বেরও অনেক বিষয়ের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এমন কি, স্থানে স্থানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ঐ সম্বন্ধে ভ্রমও দেখাইয়াছেন। ভারতের বেদ প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র। বেদের অনুবাদ রমেশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি। উহাতে ইঁহার গভীর গবেষণা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুমহৎ কার্য্যের জন্য রমেশচন্দ্রকে বহুবৎসর যাবৎ নানাস্থান হইতে বহুবিধ প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থের সংগ্রহ, অনুশীলন ও ঐ সকলের সমন্বয়ের নিমিত্ত

বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যে ইঁহার নাম য়ুরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত বিখ্যাত হয়। কালের অন্যূন পাঁচ সহস্র বৎসরের আবরণে ও বিবিধ উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট-প্রায় অনেক বিষয় ইঁহাদ্বারা মীমাংসিত হওয়ায় আমাদের দেশের মহোপকার সাধন হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উন্নতিসাধনেও রমেশচন্দ্র যত্নবান্ ছিলেন। ইঁহার প্রণীত সমাজ, সংসার প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলেই উহার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ইনি কিছু কাল বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করেন। এই কার্য্যেও ইঁহার বিশেষ সুখ্যাতির কথা শুনা যায়। এই মহাত্মা বঙ্গীয় ১৩১৬ সালে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র-প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। উহাতে বর্ণনীয় বিষয়গুলির সন্নিবেশ-নৈপুণ্যও অসাধারণ। শিক্ষিত সম্প্রদায় আগ্রহের সহিত ইঁহার পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া থাকেন।

পৌরুষের পরিণাম

এই পুস্তকে মহাত্মা রমেশচন্দ্রের যে তিনটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে অজ্ঞাত-কুলশীল রঘুনাথজীর অতুলনীয় প্রভুভক্তি, বীরত্বে অনুরাগ, দুঃসাহসিক কার্য্য-পরম্পরা ও অন্যান্য মহনীয় গুণের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এখানে সংক্ষেপে রঘুনাথজীর বিষয় লিখিত হইল :—

রঘুনাথজী শিবজীর সহকারী হইলেও মহারাষ্ট্রের অধিবাসী নহেন। ইঁহার পিতা ও পিতামহ রাজপুতনার অন্তর্গত যোধপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি নিজে যেমন অসাধারণ গুণগ্রামে ভূষিত, ইঁহার পিতা পিতামহও তেমনি গুণবান্ ও বীর্য্যশালী ছিলেন। রঘুনাথের পিতার নাম গজপতি সিংহ। ইনি যোধপুরের অধিপতি যশোবন্তের প্রিয়তম সেনাপতি ছিলেন। যশোবন্ত দিল্লীর সাজেহান বাদসাহের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। একবার একটী যুদ্ধে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ গজপতির বীরত্বেই প্রাণ রক্ষা করেন। মহারাজ এই ঘটনার স্মরণার্থ তাঁহাকে একটী বহুমূল্য হার উপহার প্রদান করেন। গজপতির পিতাও বীরত্ব ও মহত্বে যোধপুর রাজ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বাদসাহ সাজেহানের বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র আওরঙ্গজেব যখন বিদ্রোহী হন, তখন যুবরাজ দারা যশোবন্ত সিংহ ও কাসেম খাঁকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। উজ্জয়িনীর নিকটে শিপ্রা-তটে এই ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কাসেম যুদ্ধকালে আওরঙ্গজেবের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, স্বসৈন্যে যুদ্ধস্থান হইতে পলায়ন করেন। যশোবন্তের সহিত ৮০০০ সহস্র মাত্র সৈনিক ছিল। তিনি অসম সাহসে আওরঙ্গজেবের প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈনিকের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। অবশেষে পাঁচশত মাত্র সৈন্য জীবিত থাকিতে রণে ভঙ্গ দেন। এই যুদ্ধেই গজপতির প্রাণ নাশ হয়। তিনি মৃত্যুকালে একজন বঙ্গীয় বীরের হস্তে সেই বহুমূল্য হার দিয়া বলিয়া যান, আমার

একমাত্র শিশুপুত্র ও কন্যাটী মাতৃহীন। তাহাদের প্রতি যেন মহারাজের কৃপাদৃষ্টি থাকে। রঘুনাথ শৈশবে যশোবন্তের ও তাঁহার মহিষীর স্নেহদৃষ্টিতেই পালিত হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই রঘুনাথ শিবজীর মহত্বের কথা শুনিয়া মহারাষ্ট্রে গমন করেন এবং তাহার অধীনে সামান্য সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। উচ্চবংশীয় হইয়াও এই সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হওয়ায় তিনি কাহারও নিকট আত্মপরিচয় দিতেন না। চন্দ্ররাও তাঁহার ভগিনী লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। তিনি শিবজীর অধীনে হাবিলদারের সেনাপতির কার্য্য করিতেন। চন্দ্ররাও যুদ্ধ বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। বালক-রঘুনাথও অল্পকালমধ্যেই হাবিলদারের পদে আরোহণ করেন। রঘুনাথের আগমন কাল হইতে অনেকেই চন্দ্ররাওএর বীরত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। রঘুনাথ যে একজন অসাধারণ বীর্যশালী, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন। ইহাতেই তাঁহার প্রতি চন্দ্ররাওএর বিষম অসূয়া ভাব জন্মে। আপনার সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির স্পৃহা মানুষের এরূপ বলবতী যে, বিশেষ আত্মীয়তা থাকিলেও ঐ বিষয়ে যিনি প্রতিযোগী, তাঁহার প্রাণ সংহারের সুযোগ পাইলে, মানুষ তাহাতেও পশ্চাৎপদ হয় না। কিন্তু প্রতিপক্ষ বীর রঘুনাথের মন এমন নির্ম্মল ও সত্যনিষ্ঠ ছিল যে, আপনার প্রাণহানির সম্ভাবনা দেখিয়াও তিনি চন্দ্ররাওএর বিপক্ষে বা সত্যের প্রতিকূলে একটীমাত্র কথাও বলিলেন না। তবে ধর্ম্মের মহিমায় জয়পুরপতি মহারাজ জয়সিংহের দৃঢ় বিশ্বাস ও একান্ত অনুরোধেই সে যাত্রা রঘুনাথের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

আবার যে শিবজী বিনাদোষে তাঁহার প্রাণসংহারে আদেশ করেন, ইনি সেই শিবজীর বহুবিধগুণে ও অসাধারণ বীরত্বে তাঁহার প্রতি এমনই অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, ইঁহারই অতুলনীয় সাধনায় মহা সঙ্কটজাল হইতে মহারাষ্ট্র-কেশরীর বহুবিধ উপকার ও প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেই উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। রমেশবাবুর মাধবীকঙ্কণ ও জীবনপ্রভাত এই দুইখানি পুস্তকে এই বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শিবজীকে দমন করিবার জন্য বাদসাহ আওরঙ্গজেব প্রথমে সায়েস্তা খাঁকে, পরে যশোবন্তসিংহকে মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রেরণ করেন। তাঁহারা উভয়েই শিবজীর বীরত্বে পরাস্ত হন। তখন বাদসাহ নিজ পুত্র মোয়াজিমকে তথায় পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য যশোবন্তসিংহকে পুনরায় মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রেরণ করেন। সম্রাটের সে চেষ্টাও বিফল হইলে, বাদসাহ অম্বরের অধিপতি মহাবীর বিচক্ষণ জয়সিংহ ও দিলওয়ার খাঁকে ঐ প্রদেশে পাঠাইয়া দেন।

হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে শিবজী স্বভাবতঃ অনিচ্ছুক ছিলেন। বিশেষতঃ জয়পুরপতি জয়সিংহ যেমন বীর্য্যশালী, তেমনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি—ইহাও শিবজী বিলক্ষণ জানিতেন। এইজন্য তিনি একদিন একাকী জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হন এবং কয়েকটী স্থান বাদসাহকে ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। মহামতি জয়সিংহ তাহা সন্তোষের সহিত অনুমোদন করেন। তদনুসারে শিবজী বিজয়পুরপতির অধিকারভুক্ত 'রুদ্রমণ্ডল' গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া

বাদসাহকে উহা প্রদান করেন। ইহার পর জয়সিংহ তাঁহাকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। সেখানে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব শিবজীর প্রতি সমুচিত সম্মান প্রকাশ করিবেন এবং তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন, এইরূপ কথা বলিয়া পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু ক্রূর-প্রকৃতি বিশ্বাসঘাতক আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সম্মান প্রকাশ করেন নাই, বরং অবমানিত করেন ও তাঁহাকে ৫ম শ্রেণীর সামান্য কর্ম্মচারীদিগের আসনে বসাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে শিবজী আপনাকে নিতান্ত অবমানিত বোধ করিয়া, অল্পক্ষণ পরেই বাদসাহের বিনা অনুমতিতে রাজসভা হইতে চলিয়া আসেন। ইহার পরে তাঁহাকে দিল্লীতে এক প্রকার অবরুদ্ধ ভাবেই থাকিতে হইয়াছিল। ফলতঃ শিবজী জয়সিংহের কথায় বিশ্বাস করিয়া, ঘোর বিপদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে একজন সন্ন্যাসী নিশীথ রাত্রিতে শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছে।

৪৮ পৃঃ হইতে—

রক্তিমচ্ছটা রক্তবর্ণ মেঘের সৌন্দর্য্য।
দিগন্তবাহিনী—বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিতা।
আজান—উপাসনা সময়ের স্তুতিবাক্য।
চিন্তা-সূত্র—চিন্তারূপ সূত্র অর্থাৎ সুদীর্ঘ চিন্তা।
গরীয়সী—গুরু-ঈয়স্ স্ত্রী-ঈপ্, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতরা, পরম পূজনীয়া।
আহবে—যুদ্ধে।
উন্নত কার্য্যপরম্পরা—উৎকৃষ্ট কার্য্যসমূহ।
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ -বাহুদণ্ডের পরাক্রম, বাহুবল।
দুর্দ্দমনীয়—দুর্জ্জেয়, যাঁহাকে দমন করা দুঃসাধ্য।
রাজচক্রবর্ত্তী—রাজা সকলের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সার্ব্বভৌম।
প্রতিকৃতি—প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিবিম্ব।
নৈশ-শিশির—রাত্রিকালীন শিশির।
বিভূতি—ভস্ম।
কোষ—তরবারির খাপ।
ঔৎসুক্য উৎসুক+ষ্ণ্য ভাবার্থে; আগ্রহ।
ন্যস্ত—নি+অস্+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে; অর্পিত, স্থাপিত।
গগনসঞ্চারি-বায়ু—৭মীতৎ ও কর্ম্মধা; আকাশে প্রবাহিত বাতাস।

৫২ পৃঃ হইতে—

ছদ্মবেশে—গুপ্তবেশে, কপট পরিচ্ছদে।
নিদর্শন—চিহ্ন, চিনিবার বস্তু।
বর্ম্মাচ্ছাদিত—সাঁজোয়া দ্বারা ঢাকা।
তূণ—শরাধার।

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকার বিবৃতি।

৫৫ পৃঃ—

অবধারণা—নির্ণয়, নিশ্চয়।

অবিচলিত—দৃঢ়, স্থির।

বীর-পরামর্শ—বীরোচিত উপদেশ।

নির্ব্বন্ধে—অদৃষ্টের লিখনে, ভাগ্যলিপিতে।

মর্ম্মভেদী—হৃদয়-বিদারক, মর্ম্মান্তিক মনস্তাপজনক।

উদার—উন্নত ভাবের প্রকাশক।

দুর্দ্দমনীয়—দুষ্পরাজেয়, যাহার দমন দুঃসাধ্য।

আরোগ্য।

ঐ ঘটনার পরে আওরঙ্গজেব আদেশ করিলেন, শিবজী যেস্থানে আছেন, উঁহার চারিদিকে সম্রাটের সৈন্যসকল এমন ভাবে থাকিবে, যাহাতে শিবজী দিল্লী হইতে কোনরূপে পলায়ন করিতে না পারেন। শিবজী তখন ঘোর বিপদে পতিত হইলেন। ইহার কয়েকদিন পরে চতুর-চূড়ামণি শিবজী পীড়ার ভাণ করিয়া, চিকিৎসকদিগকে দেখাইতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গেই পলায়নের উপায়ও দেখিতে লাগিলেন।

তন্নজী—ইনি শিবজীর সহচর। কূট বুদ্ধিতে ইনি শিবজীর উপযুক্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। ইঁহারই সহিত পরামর্শ করিয়া সুচতুর শিবজী মিষ্টান্নের ঝুড়ির মধ্যে চাপিয়া অবরুদ্ধ স্থান হইতে বহির্গত হন। শিবজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজীও আর একটী ঝুড়িতে ছিলেন।

৬২ পৃঃ হইতে—

ইতি-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া - উপস্থিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি রহিত হইয়া।

আজীবন-কাল—জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া এই অর্থে আজীবন, অব্যয়ীভাব, ঐরূপ যে কাল, সুপ্ সুপ্ সমাস; যতকাল জীবন থাকিবে ততকাল।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—অনাথের নাথ। যাহার আশ্রয় নাই আপনি তাহার অবলম্বন।

'এই মহৎ আচরণে আমাকে যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছ'—অর্থাৎ আমি যে নিজের বুদ্ধিদোষে নির্দ্দোষ প্রভুভক্ত বীরপুরুষের উপর প্রাণদণ্ডের ও দূরীকরণের আদেশ দিয়া অতীব গর্হিত কার্য্য করিয়াছি এবং তাহা করাতেও তুমি এই ঘোর বিপদ্ হইতে আমায় পরিত্রাণ করিলে, ইহাতেই আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করা হইল। তোমার এই কার্য্যেই আমাকে প্রকারান্তরে দণ্ড দেওয়া হইল অর্থাৎ তোমার এই অসাধারণ উপকারে আমি চিরজীবন আত্মগ্লানি ভোগ করিব,—ইহাই প্রকৃত দণ্ডদান।

অজস্র—নঞ্-জস্+র কর্ত্তৃবাচ্যে; অবিরল, সতত।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় ১২৩২ সালের চৈত্রমাসে মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী জেলায় খানাকুলের সন্নিহিত নাপ্তিপাড়া-নামক গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। আট বৎসর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হন। এখানে তিন বৎসর যোগ্যতার সহিত পাঠ করিয়া, উত্তমরূপে ইংরাজি ভাষা শিখিবার জন্য হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে এখানকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

ইহার পরে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরব্ধ হয়। ভূদেবচন্দ্রের কর্ম্মজীবন অতীব প্রশংসনীয়। ইনি প্রথমে কিছুকাল হাওড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা নানাবিদ্যায় ভূদেবচন্দ্রের পারদর্শিতা দেখিয়া, ইঁহাকে হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও আরও কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ পদের প্রার্থী ছিলেন। এজন্য কর্ম্মপ্রার্থিগণের একটী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ঐ পরীক্ষাতেও ভূদেবচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন।

নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি নানা প্রকারে উহার উন্নতি করেন। এদেশীয় ছাত্রগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি ঐসময়ে কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐসকল পুস্তকের অধিকাংশই মৌলিক—কোন পুস্তকের অনুবাদ নহে। ঐগুলির মধ্যে ক্ষেত্রতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-প্রণয়নে তাঁহাকে ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী প্রভৃতি দুরূহ বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্যে অনেক পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। স্থানে স্থানে স্বয়ংও ঐরূপ বহুসংখ্যক শব্দ গঠন করিয়া পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠব করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা ঐসকল শব্দের সাহায্যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। উহা ভিন্ন তিনি পুরাবৃত্তসার, শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি গভীর চিন্তামূলক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও ঐসময় প্রণয়ন করেন। বৃদ্ধ বয়সে সামাজিক প্রবন্ধ, আচার-প্রবন্ধ ও পারিবারিক প্রবন্ধ এই তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ঐগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, মহাযশস্বী ভূদেবচন্দ্র কিরূপ গভীর চিন্তাশীল ও সমাজহিতৈষী ছিলেন। বাঙ্গালার পূর্ব্বতন গভর্ণর সার চার্লস্ ইলিয়ড্ সাহেব সামাজিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় আধুনিক কোন পুস্তকেই এরূপ গভীরভাব ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিশ্রণে যে অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন হইতে পারে, এই পুস্তকই তাহার প্রমাণ।"

নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতায় রাজপুরুষেরা তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ও কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন। ইঁহারই যত্নে শিক্ষাবিভাগের নানাপ্রকার উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বেতন ১৫০০৲ টাকা

হইয়াছিল। ইনি কয়েক বৎসর বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সদস্যরূপে মনোনীত হন এবং নানা-প্রকারে এদেশীয়গণের উপকার সাধন করেন। ভূদেবচন্দ্র নিজগুণে রাজদত্ত 'সি, আই, ই,' উপাধি প্রাপ্ত হন। পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কিরূপে শিক্ষা-বিস্তার হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য রাজপুরুষেরা ভূদেবচন্দ্রকে যোগ্যতর বলিয়া মনোনীত করেন। তিনি এমন বিচক্ষণতার সহিত ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, রাজপুরুষেরা উহা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হন এবং তদনুসারে ঐ উভয় প্রদেশের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। এই সময়ে বিহার প্রদেশের আদালতসকলে পারসি ভাষার প্রচলন ছিল। ইঁহারই পরামর্শে পারসির পরিবর্ত্তে নাগরী ভাষার প্রচলন হইয়াছে।

৫৮ বৎসর বয়সে এই মহাত্মা রাজকার্য্য হইতে অবসর লন। ইহার পরে তিনি কাশীবাসে গমন এবং দুই বৎসরের মধ্যে বেদান্ত-দর্শন উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া চুঁচুড়ায় প্রত্যাগমন করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ও দেশীয় আচার-ব্যবহারে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সংস্কৃত শিক্ষা না করিলে যে জ্ঞানের প্রগাঢ়তা ও প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জাতীয় ভাব-বিহীন হইলে যে, মানুষ অবলম্বনহীন হয়, ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আমাদের সংস্কৃত পুস্তকের অধিকাংশ গ্রন্থই গভীর জ্ঞানপূর্ণ। এদেশীয়েরা ইংরাজি শিক্ষা করিলেও ঐসকল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, ইহাও তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। এই সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য চুঁচুড়া নগরীতে তিনি একটী সুবিশাল বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মহামতি ভূদেবচন্দ্র সমগ্র জীবন রাজসেবা ও গ্রন্থাদি প্রণয়নে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সে সমস্তই সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। পুত্রাদির জন্য কিছুই রাখেন নাই, উহাতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ঐ চতুষ্পাঠীর সহিত একটী ঔষধালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে রোগাতুর ব্যক্তিদিগকে বিনামূল্যে কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই মহাত্মা পিতৃদেবের নামানুসারে ঐ বিদ্যামন্দিরের "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" নাম রাখিয়াছেন। এরূপ দান এ জগতে অতি বিরল।

১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই মহাত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যশঃ শরীরে অবিনশ্বর হইয়া এখনও বিরাজ করিতেছেন।

মধুস্মৃতি।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্বন্ধে সহাধ্যায়ী মহামতি ভূদেবচন্দ্রের যাহা যাহা স্মরণ হইয়াছিল, সেই বিষয়গুলি এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে।

৬৫ পৃঃ হইতে—

কৈশোর—কিশোর+ষ্ণ ভাবার্থে, নব-যৌবনের পূর্ব্বাবস্থা, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স।

অতিক্রান্ত-প্রায় গতপ্রায় অর্থাৎ তখন প্রায় ১৫০বৎসর বয়স অতীত হইয়াছে।

শ্লেষ—স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি, অর্থাৎ কূট অর্থ করিয়া দোষ দেখান।

"করতল কলিতামলকবদ্ বদন্তি যে গোলং"—করতলে প্রাপ্ত (গৃহীত) আমলকের ন্যায় গোল ও পরিষ্কৃত (দোষশূন্য) যাঁহারা বলেন।

অধ্যবসায়শীল—পুনঃ পুনঃ উৎসাহ-সম্পন্ন, কোন বিষয়ে দৃঢ় যত্ন করা যাঁহার স্বভাব।

সৌজন্য—সুজন+ষ্ণ্য ভাবার্থে; ভদ্রতা, অমায়িকতা।

আপ্যায়িত—আ—প্যায়+ক্ত কর্ত্তৃবাচ্যে; তৃপ্ত, বিশেষ প্রীতিপ্রাপ্ত।

অগত্যা—অ-গতিদ্বারা, অন্য গতি না পাওয়ায়, অর্থাৎ উপায়ান্তর না থাকায়।

৬৮ পৃঃ হইতে—

সৌহার্দ্দ্য—সুহৃদ্+ষ্ণ্য ভাবার্থে; সুহৃদের ভাব।

জিনিয়াস্ (genius) অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, মৌলিক ভাবের উদ্ভাবনকারী উচ্চমনাঃ ব্যক্তি।

তত্ত্বাবধানে—পর্য্যবেক্ষণে, কর্ত্তৃত্বের অধীনতায়।

প্রতিভা—প্রত্যুৎপন্ন মতি, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

সন্তানের শিক্ষা।

৭১ পৃঃ হইতে—

সাধ্যায়ত্ত—সাধ্য দ্বারা আয়ত্ত, সাধ্যের অধীন।

মনুষ্য-সাধারণ ধর্ম্ম—মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ যে সকল গুণ উক্ত শ্রেণীর সকল মানুষেরই থাকা উচিত—যেমন, সত্যপালন, ন্যায়পরতা, দয়া, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, শ্রমশীলতা প্রভৃতি।

"অতএব সকল দেশেরই......এবং তাহাই হওয়া উচিত"—অর্থাৎ যে জাতির যেরূপ ধর্ম্ম, যেরূপ সামাজিক রীতি-পদ্ধতি, যেরূপ আচারব্যবহারের প্রচলন আছে, ঐগুলি শিক্ষা করাই প্রকৃতশিক্ষা। ঐগুলি শিক্ষার সহিত আপনা হইতেই মানুষের সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান অর্থাৎ সত্যকথন, পরোপকার, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সাধারণ গুণের শিক্ষা হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত জাতীয় ভাবের শিক্ষা এবং কিসে জাতীয় অভাব ও ব্যক্তিগত দোষগুলির পরিহার হইতে পারে, ঐগুলি শিক্ষার প্রথম অবস্থা হইতেই বালককে শিখান আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে উহা হয় না। এই নিমিত্ত বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও বৈষয়িক বিষয়গুলিরও শিক্ষাদান করা পিতা-

মাতা ও অন্যান্য গুরুজনগণের কর্ত্তব্য—এই বিষয় অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছে।

প্রবাহিত—পরিচালিত।

সংস্কার—সংশুদ্ধি করণ, যাহা আপনা হইতেই জন্মে, এরূপ জ্ঞান ; দৃঢ়প্রত্যয়।

৭২ পৃঃ হইতে—

"এই জন্য জাতীয় ভাব পরিহার করা, মানব-মনের অসাধ্য"—অর্থাৎ যে জাতির যেরূপ ভাব ও আচার ব্যবহার, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া, মানুষের আপনা হইতেই মনে উহাই দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হয়, উহা কেহই সহজে ছাড়িতে পারে না।

বিজিত—বি+জি+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে ; যাহাকে পরাজিত করা হইয়াছে, পরাজিত।

বিজেতা—বি+জি+তৃন্ কর্ত্তৃবাচ্যে ; যিনি জয়লাভ করিয়াছেন, বিজয়ী।

অভ্যুদয়োন্মুখ—৭মী তৎ ; উন্নতির দিকে অগ্রসর।

পতন-প্রবণ—৭মী তৎ ; অধোগতির দিকে চলিত, অবনতিশীল।

প্রয়োজন-সাধনোপযোগী—যাহা করা আবশ্যক, তাহা করিবার উপযুক্ত, আবশ্যক বিষয় সম্পাদনের উপযোগী।

"সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়"—অর্থাৎ যে সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া কার্য্য করাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষণীয়।

ভিত্তি—বনিয়াদ, দেওয়াল।

সুপরিস্ফুট-রূপে—অতি উত্তমরূপে, সুব্যক্তভাবে।

"মনুষ্যত্ব সাধন মস্ত কথা" অর্থাৎ গণ্যমান্য মানুষ করিয়া তুলা (বড় দরের লোক হইতে চেষ্টা, যাহা করা উচিত, তাহা করিতে পারা) অল্প কালের সহজ চেষ্টায় হয় না অর্থাৎ উহা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ইন্দ্রিয়-গ্রাম—ইন্দ্রিয় সকল।

উপলব্ধি—অনুভব। অববোধ—উত্তমরূপে বোধ, প্রতীতি।

ধী-শক্তি—বুদ্ধিশক্তি।

উদ্ভাবনী-শক্তি—আবিষ্কারের ক্ষমতা ; (কোন নূতন বিষয় বাহির করিবার শক্তিকে উদ্ভাবনী শক্তি বলে)।

মনোবৃত্তি মাত্রেব কারণ-শক্তির নাম স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণশক্তি হইতেই অভিনিবেশ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, একাগ্রতা প্রভৃতি মনোবৃত্তির প্রকাশ হয়।

পর্য্যাপ্ত—প্রচুর, যথেষ্ট।

কৃতিসামর্থ্য—৬তৎ পু ; কার্য্যদক্ষতার শক্তি।

৭৪ পৃঃ হইতে—

দূরদর্শিতা—দূরদৃষ্টি অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা।

কল্পনা—রচনা, মনে মনে নূতন ভাব বা বিষয়ের গঠন।

দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন—দুর্ব্বলতাহেতু।

অনৃতবাদিতা—ন-ঋত-বাদিতা ; অসত্যকথনশীলতা, মিথ্যাবাদিতা।

"দূরদর্শিতা বৰ্দ্ধিত করিয়াই অনৃতবাদিতার শাসন করা বিধেয়"—পরে কি ঘটিবে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেই মিথ্যা বাক্যের দমন হইতে পারে অর্থাৎ এখন মিথ্যা বলিয়া কোন বিষয় গোপন করিলেও পরে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই—মিথ্যা কখনও টিকিবে না, এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেই মিথ্যা বলিবার প্রবৃত্তি ঘুচিয়া যাইবে।

বৈফল্যবশতঃ—নিষ্ফলতার জন্য, বিফল হইয়া যাওয়ায়।

উচ্চাশয়-সম্পন্ন—উচ্চহৃদয়যুক্ত, উন্নতমনাঃ।

উদ্রেক—উৎ + রিচ্ + ঘঞ্ ভাবে ; উন্মেষ, সূচনা।

ঈর্ষা—দ্বেষ, পরের ভাল দেখিয়া মনে কষ্ট বোধ করা, পরশ্রীকাতরতা।

"ঈর্ষ্যা যাহাতে প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, তাহাই চেষ্টা করা আবশ্যক"—পরের ভাল দেখিয়া, যদি মনে করা হয়, আমিও ঐরূপ ভাল হইব—উহার সমকক্ষ হইব, তাহা হইলে, বিদ্বেষভাব মনকে কলুষিত করিতে পারে না ; অধিকন্তু উহাতে আত্মোন্নতি হইয়া জীবনকে কল্যাণের পথে চালিত করে। (এইরূপ প্রতিযোগিতাতেই অনেকে উন্নতি লাভ করিয়া, শেষে বড়লোক হইয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায়।)

অনুচিকীর্ষা—অনু-কৃ + সন্ + অ, স্ত্র আ ; অনুকরণের ইচ্ছা ; একজন যাহা করেন তাহা দেখিয়া ঠিক সেইমত কাজ করিবার ইচ্ছাকে অনুচিকীর্ষা বলে।

অযথারূপে—ক্রি-বিণ, অন্যায় রকমে অর্থাৎ উহাতে হিত কি অহিত হইবে, তাহা না বুঝিয়া।

আত্মহত্যা—আপনার প্রাণহানি অর্থাৎ নিজের অনিষ্ট সাধন।

হত্যা—হন্ + ক্যপ্ স্ত্রী আপ্।

আত্মগৌরব—৬ষ্ঠী তৎ ; আপনার শ্রেষ্ঠতা, আত্ম-মর্য্যাদা।

উদ্দীপিত—প্রকাশিত, প্রজ্বলিত।

অনুরূপ—রূপের তুল্য এই অর্থে অব্যয়ীভাব ; সদৃশ।

সহানুভূতি—অন্যের সুখ বা দুঃখ দেখিয়া তাহা আপনার হৃদয়ে বোধ করা, সমভাব অনুভব করা।

সাংঘাতিক—সংঘাত + ষ্ণিক ; গুরুতর, বিশেষ হানিজনক।

বিলাসিতা—বিলাসিন্ + তা ভাবার্থে ; বাবুগিরি, সৌখীনতা।

সুখোপভোগ-চেষ্টা—সুখ ভোগ করিব এইরূপ চেষ্টা।

৭৬ পৃঃ—

"বশ্যতা ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না"—নিয়ম ও ন্যায়ের বশীভূত হইয়া চলিব এবং কর্তৃপক্ষের মতানুসারে কার্য্য করিব—এইরূপ বশ্যভাব না থাকিলে কোন জাতিরই একতা হয় না।

অনভিজ্ঞ—অভিজ্ঞতাশূন্য ; যে ভালরূপে জানে না।

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকার বিবৃতি।

অসামরিক জাতি—যে জাতি যুদ্ধকার্য্য করে না।
বশ্যতা ভক্তিমূলক—অর্থাৎ যাঁহার উপর শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, মানুষ তাঁহারই বশীভূত হইয়া চলে। ভক্তি না থাকিলে আন্তরিক বশ্যতা হয় না।

ব্রজনাথ বিশ্বাস।

ইনি বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান সময়ের একজন সুলেখক। ইঁহার লেখা গভীর চিন্তা-মূলক ও প্রাঞ্জল। মনুষ্য জীবনের সুগঠন যেরূপে হইতে পারে, তাহা ইঁহার কয়েকটী প্রবন্ধে সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইঁহার প্রণীত ছাত্রজীবন-নামক পুস্তক শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদৃত।

প্রকৃতিবিষয়ে অধ্যয়ন।

এই প্রবন্ধ-লেখক দেখাইয়াছেন, শুধু পুস্তক পাঠ করিলেই মনোবৃত্তির বিকাশ ও জীবনের উন্নতি হয় না। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যে বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি বিরাজমান রহিয়াছে, ইহার বিষয় উত্তমরূপে অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। মানুষ এখন বল-বিজ্ঞান, বাষ্প-বিজ্ঞান, তড়িদ্বিজ্ঞান, বায়ু-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলন করিয়া যে সকল যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, ঐগুলি প্রকৃতির অনুশীলনের ফল। এই নিমিত্ত বাহ্য প্রকৃতিতে যে যে ক্রিয়া ও ভাব আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, ঐগুলির অনুশীলন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃতি অনন্ত জ্ঞানের নিকেতন। মানুষ সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। এখনও উহার মধ্যে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় আছে। প্রকৃতিরূপ সজীব গ্রন্থের অনুশীলনে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণে যত্নবান্ হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন আমরা পুস্তকাদিতে যে সকল বিষয় পাঠ করি, ঐগুলির উদ্ভাবনও প্রকৃতির অনুশীলনের ফল। এই প্রবন্ধে ঐ বিষয়টী সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে।

৭৭ পৃঃ হইতে—
নিষ্ক্রিয়—নাই ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী; ক্রিয়া-হীন।
নেত্রাদি বহিরিন্দ্রিয় কাহারও নিষ্ক্রিয় নহে—অর্থাৎ সকলেরই চক্ষুকর্ণাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রবণাদি কার্য্য করিতেছে ও সেই সঙ্গে জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে।
অধ্যয়নের লিপ্সা—পড়িবার ইচ্ছা। লিপ্সা—লভ্-সন্+অ, স্ত্রী আপ।
মনীষিগণের—তীক্ষবুদ্ধি ব্যক্তিগণের। মনীষা—মন+ঈষা; তীক্ষবুদ্ধি। মনীষিন্—মনীষা+ইন্।
নিত্য বিরাজমানা—নিয়ত বর্ত্তমানা, যাহা সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে।

অধীত—অধি+ই+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে ; পঠিত।
খগোল—জ্যোতিষ শাস্ত্র। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির বিষয় যে শাস্ত্রের অনুশীলনে জানা যায়।
স্থপতি—রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর।
মস্তিষ্ক-নিঃসৃত—মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত।
পরিদর্শন—পরীক্ষা, বিশেষরূপে দর্শন।
অনুশীলন—চর্চ্চা, আলোচনা।
পর্য্যবেক্ষণ—পরি—অব+ঈক্ষ+অনট্ ভাববাচ্যে ; তত্ত্বাবধান।
৭৯ পৃঃ হইতে—
যুগান্তর—বিশেষ পরিবর্ত্তন, অত্যধিক ভাবান্তর।
দূরবীক্ষণ—যে যন্ত্রদ্বারা দূরস্থিত বস্তু উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, দূরবীণ।
অনুবীক্ষণ—যে যন্ত্র দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তু সকলও উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া যায় ; অনুবীণ।
দূর-শ্রবণ—যে যন্ত্রদ্বারা দূরস্থ ব্যক্তির সহিত কথা কহা যায়, টেলিফোন।
শব্দ-ধারক—স্বরধর যন্ত্র, ফণোগ্রাফ।
উন্মনা—অন্যমনস্ক, মনোযোগহীন।

গ্রন্থবদ্ধ-দৃষ্টি বাহ্যজগতে অন্ধ ছাত্র—অর্থাৎ যাহারা কেবল পুস্তক পাঠমাত্র করে, বাহ্য জগতে যে সকল ব্যাপার নিয়ত ঘটিতেছে সে সকল বিষয় যাহারা মনোযোগের সহিত দেখে না, তাহারাই বাহ্য জগতে (বিশ্ব প্রকৃতির বিষয়ে) অন্ধ অর্থাৎ অজ্ঞান।

পার্থক্য—পৃথক্+ষ্ণ্য ভাবার্থে ; প্রভেদ।
প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণে—প্রকৃতির শক্তিতে যে যে কর্ম্ম হয়, তাহা ভাল করিয়া দেখিতে।
অনাসক্ত—আস্থাহীন, যত্ন-বর্জ্জিত।
ছাত্রাধম—অপকৃষ্ট ছাত্র, জ্ঞাতব্য বিষয় সন্ধানে যত্নহীন ছাত্র।

মানব মন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যয়নের বিষয়—মানুষের মনের অবস্থা, কোন্ সময়ে কিরূপ হইতে পারে, কিরূপ কার্য্য দ্বারা ঐ মন সুগঠিত, স্বচ্ছন্দ ও বশীকৃত হইতে পারে, ইহা বুঝিয়া কাজ করিতে পারিলেই মানুষ অনেক কার্য্যে সুসিদ্ধ ও সুখী হইতে পারে। সুতরাং ঐরূপ বিষয়ের অনুশীলনই মানুষের প্রধান শিক্ষণীয়।

মানবমন জগতের অনুকৃতিমাত্র—মানুষ সচরাচর যাহা যাহা দেখে ও যেরূপ বিষয় সকলের অনুশীলন করে, তাহার মনের গঠনও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় সকলের অনুকরণেই মানুষের মনের গঠন হইয়া থাকে। ফলকথা, এই জগতে যাহা যাহা ঘটিতেছে, ঐগুলি দেখিয়া ও শুনিয়াই আমাদের যেরূপ চিন্তা-প্রবাহ জন্মে, উহা হইতেই মনের গঠন হয়। এই জন্যই আমাদের মনকেই 'জগতের অনুকরণ মাত্র বলা হইয়াছে।

মানবমনের ইতিহাস মনোবিজ্ঞান—অর্থাৎ মনের যে অবস্থার পরে যে অবস্থা ঘটিতে পারে, উহার জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান বলা হয়।

মানবমনের ভাবপ্রকাশ ভাষা-বিজ্ঞান—অর্থাৎ মানুষের মনে যখন যখন যে যে ভাবের

উদয় হয়, ঐগুলিকে প্রকাশ করিতেই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের মনের ভাবপ্রকাশক ঐ ভাষাসম্বন্ধে বিশিষ্ট-জ্ঞান যাহা দ্বারা হইতে পারে, তাহাকেই ভাষাবিজ্ঞান বলা যায়।

মানবমন অনন্ত রত্নের আকর—মানুষের মন হইতেই নানাবিধ সুচিন্তা-রূপ রত্নের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ মানুষ যে সকল উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুশীলন করিয়া জীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছে, ঐগুলির উৎপত্তি উন্নত মন হইতেই হইতেছে।

"তাহার প্রত্যেক ভাব..... জীবিত গ্রন্থ"—পুস্তক সকল নির্জীব। উহাতে যে যে বিষয় লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া কেহ আংশিকভাবে উহার শিক্ষণীয় বিষয়-গুলি অনুভব করিতে পারেন। কেহ কেহ তাহাও পারেন না। কিন্তু মন চৈতন্যময় বস্তু। মনে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হয়, ঐগুলির অনুভব প্রত্যেক ব্যক্তির হইয়া থাকে এবং তাহাতেই মানুষের মনোবৃত্তি উজ্জ্বল ও উন্নত হয়। ফলতঃ মনের কার্য্যই জীবিত গ্রন্থের স্বরূপ এবং উহা দ্বারাই মানুষ নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ফলতঃ মনই মানুষকে শ্রেষ্ঠ করিতেছে।

উপেক্ষা—উপ+ঈক্ষ্+অল্, ভাবে, স্ত্রী আপ্; অগ্রাহ্য, অনাদর।

নিহিত—স্থাপিত, অর্পিত।

"প্রকৃতি-গ্রন্থ এমনই অনন্ত..... করা যাইতে পারে না"—এই বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি বিশ্ববিধাতার যে অচিন্তনীয় জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং উহার কার্য্য সকল যেরূপ কৌশলে ও যথানিয়মে চলিতেছে, মানবজাতি এই পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এতাবৎকাল উহার আলোচনা করিয়া জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, তড়িৎ, বাষ্প, গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, জীব-দেহের গঠন, ক্রমোন্নতি ও ক্ষয় প্রভৃতি বিষয়ের যাহা কিছু জানিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। ঐ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ই জানিতে বাকি আছে, এবং তাহা যে মানব সম্পূর্ণরূপে কখন শিখিতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ আমাদের চারিদিকের বিবিধ বস্তুতে ও উহাদের ক্রিয়াতে এখনও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে; ঐ সকলের অনুশীলনেই প্রকৃত উন্নতি ও মনুষ্যত্ব লাভ হইবার সম্ভাবনা।

৮১পৃঃ হইতে—

অধিষ্ঠান ভূমিভাগেই—অবস্থান ভূভাগেই; আমরা যে স্থানে বাস করিয়া আছি, সেই স্থানেই।

অধিষ্ঠান—অধি+স্থা+অনট্ অধিকরণবাচ্যে; থাকা যায় যে স্থানে।

সেই বৈষম্যেও অভাবনীয় সাদৃশ্য—অর্থাৎ গঠন, বর্ণ ও মনের ভাব প্রত্যেকের বিভিন্ন হইলেও সমাজবদ্ধ হইয়া থাকা, আত্মীয়জনের প্রতি অনুরাগ, সদ্গুণে আদর, ভাষার সামঞ্জস্য, প্রত্যেকের অভাব মোচনের চেষ্টা, স্বদেশের মঙ্গলেচ্ছা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে মানুষমাত্রেরই মনের ভাব তুল্য দেখা যায়।

৮২পৃঃ হইতে—

শারীর ধর্ম্ম—শরীর সম্বন্ধীয় ভাব, দেহরক্ষার প্রকৃতি।

আপাত-দৃষ্টিতে—সহজ দর্শনে।

ইয়ত্তা—পরিমাণ, সীমা।

বিঘ্নঘ্ন—বিঘ্ন+হন্+টক্ কর্তৃবাচ্যে, বিঘ্ননাশক।

লোমহর্ষণ—অতি ভীষণ, যাহাতে দেহ কণ্টকিত হয় এমন ব্যাপার।

অধ্যাপকগণ—অর্থাৎ শিক্ষকের স্থানীয় (জ্যোতিষ্ক) সকল। উহাদের নিকট আমরা সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত মহিমা, পরস্পর মহাকর্ষণ, ব্রহ্মাণ্ডের অসীমতা ও সেই সঙ্গে বিশ্ব-বিধাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিভাবের উদয়—এই সকল বিষয়ের শিক্ষা পাইয়া থাকি, এজন্য উহাদিগকে অধ্যাপক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

গবেষণা—গো—এষ—অন, ভাবে স্ত্রী আপ্; একান্তচিত্তে চিন্তা করা, গভীর মনঃসংযোগের সহিত অন্বেষণ।

"যত প্রকার কল কৌশল ..পরিদর্শনের ফল"—অর্থাৎ প্রকৃতির বিষয় অনুশীলন করিয়াই মানুষ ঐ সকল কল ও কৌশলের আবিষ্কার করিয়াছে।

৮৪ পৃঃ—

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু—তাহার স্বরূপ জানিবার জন্য ইচ্ছু, যাথার্থ্য-জিজ্ঞাসু। তত্ত্ব—তদ্+ত্ব স্বরূপার্থে। জিজ্ঞাসু—জ্ঞা—সন্+উ কর্তৃবাচ্যে; জানিবার ইচ্ছা করে যে।

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ।

মানবজাতি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি, সুনিপুণ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পাইয়া, কিরূপ ক্রমোন্নতি করিয়াছে, তাহা ইহাতে দেখান হইয়াছে।

৮৫ পৃঃ—

সমাজ-ধর্ম্ম—৬৩৫ পৃঃ; মানব সমূহের মধ্যে যে সকল নিয়ম ও রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকেই সমাজ-ধর্ম্ম বলা যায়; সমাজের মধ্যে অবশ্য পালনীয় আচার ও সৎকর্ম্ম।

বিবর্ত্তিত—বি-বৃত-ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে; পরিবর্ত্তিত, প্রত্যাবর্ত্তিত, ভ্রমিত, ঘূর্ণিত।

অনুমেয়—অনুমানের যোগ্য।

মস্তিষ্ক—মগজ, মাথার ঘি, বুদ্ধির আধার যে যন্ত্র, তাহাকেই সচরাচর মস্তিষ্ক বলা হয়।

আপন প্রতিষ্ঠায়—আপনার গৌরব স্থাপনে, আপনার স্থিতি ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে।

অবসর কালপ্রাপ্তি—অবকাশের সময় পাওয়া।

৯০ পৃঃ—

পারমার্থিক—পরমার্থ-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক।

পরম পুরুষার্থ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৌরুষ, প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়।

ভাণমাত্র—ছল মাত্র।

সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুণ থাকিলে, মানুষের কিরূপ উন্নতি ও সুখ্যাতি হয়, সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের জীবনই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই মহাত্মা ১২৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বৎসর বয়সের সময় ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে ইঁহার জননী পুত্রটীকে লইয়া পিত্রালয়ে আশ্রয় লন। ইঁহার মাতা যেমন ধর্ম্মনিষ্ঠা, তেমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। গুরুদাস বাল্যকাল হইতেই মাতার একান্ত বশীভূত ও আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতেন। ইনি যে উত্তরকালে অসাধারণ বিদ্যা, বিনয়, সত্যনিষ্ঠা, অমায়িকতা, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি দেবোচিত গুণরাশিতে বিভূষিত হইয়া উঠেন, দেবী-রূপিণী জননীর অমৃতময় উপদেশই তাহার মূল। গুরুদাস যেমন বুদ্ধিমান্, লেখা-পড়ায় তেমনি যত্নবান্ ছিলেন। শিক্ষার সহিত তাঁহার সহজাত বিনয়াদি গুণগুলিও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতে ইনি কি শিক্ষক, কি সহাধ্যায়ী, কি প্রতিবেশী, সকলেরই স্নেহভাজন হইয়া উঠেন। ইনি যখন হিন্দুস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, তখন ইঁহার শরীর এমন রুগ্ণ ও দুর্ব্বল যে, পরীক্ষা-গৃহে চলিয়া যাইতেও অশক্ত। এইজন্য প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণ সরকার মহাশয় আপনার গাড়ি পাঠাইয়া গুরুদাসকে পরীক্ষাস্থলে লইয়া যাইতেন। সেইরূপ রুগ্ণ অবস্থাতেও পরীক্ষা দিয়া গুরুদাস সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাহার পরে কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলেজের পাঠ সমাপন করেন এবং রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া দশ হাজার টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

ইহার পরে কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর এই কার্য্য করিয়া, হাইকোর্টে ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই ওকালতিতে তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা প্রকাশিত হইয়া উঠিল। রাজপুরুষেরা আইন-বিষয়ে ইঁহার অসামান্য পারদর্শিতা ও অন্যান্য নানা গুণের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে হাইকোর্টের জজের পদে বরণ করিলেন। তিনি বিশেষ যোগ্যতা ও প্রশংসার সহিত দীর্ঘকাল এই কার্য্য করেন এবং সার উপাধিতে বিভূষিত হন।

হাইকোর্টে ওকালতি ও জজিয়তির সময় তিনি দেশহিতকর নানাবিধ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি দুইবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার পূর্ব্বে এ দেশের আর কোন ব্যক্তি এই গৌরবের পদ প্রাপ্ত হন নাই। মহামনা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দেহত্যাগের পরে রাজ-পুরুষেরা ইঁহাকেই পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন-সমিতির অধ্যক্ষ পদে বরণ করেন। এই কার্য্যও তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন।

মহামান্য গুরুদাস নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইংরাজিতে

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে গুরুদাসের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এদেশে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। আর্য্য-ধর্ম্ম ও দেশীয় আচার-ব্যবহারে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। তাঁহার ভবন হিন্দু আচার ও অনুষ্ঠানের আদর্শ স্থান। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ও মুখ প্রক্ষালনাদির পরেই যথানিয়মে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেন। তিনি নিজে যেমন ধর্ম্মনিষ্ঠ, পুত্র-পৌত্রেরা তেমনি নিষ্ঠাবান্। তাঁহাদের পরিচ্ছদও অতি সাধারণ. সকলেরই পদে কাষ্ঠ-পাদুকা। পরিচিত, অপরিচিত যে কোন ব্যক্তি উঁহাদের বাটীতে যাইত, তাহাদের সকলের প্রতিই সৌজন্য দেখিয়া বিস্ময় বোধ হইত। তাঁহার সংসারের ভাব দেখিয়া মনে হইত, যেন উহা মুনি-ঋষির আশ্রম। ফলতঃ তিনি বিদেশীয় বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত হইলেও সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানিতে চলিতেন। এই নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত।

অসাধারণ ন্যায়পরায়ণতায় রাজপুরুষদিগের নিকটেও মহামান্য গুরুদাসের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এমন কি, তাঁহারা সময়ে সময়ে সার্ গুরুদাসের সহিত রাজ্যশাসন-সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয়েরও পরামর্শ করিতেন। আবার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণও তাঁহাকে দেশহিতৈষী পরম বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। সমাজ ও সাধারণ হিতকর অধিকাংশ সভা সমিতিতেই তিনি আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেন। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইত, তিনি অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও বিশেষ যত্ন ও অমায়িকতার সহিত তাহাকে সদুপদেশ দিতেন। ফলতঃ ধন, মান, বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে উন্নত হইলেও তিনি নিরহঙ্কার, পরহিতৈষী ও একান্ত-ধীর-প্রকৃতি ছিলেন। এই সকল গুণেই তিনি সকলের নিকটে দেবোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ সকলেই সার্ গুরুদাসের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখাইতেন। রাজপুরুষেরা এই মহাত্মার নানাবিধ গুণ দেখিয়া 'সার্' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ-ভূষিত ব্যক্তি এ সংসারে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। বঙ্গীয় ১৩২৫ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ এই মহাত্মা দেশবাসিগণকে শোক-কাতর করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন।

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা।

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'—ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার প্রথম সাধন শরীর—ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় অর্থাৎ দেহের সাহায্যেই ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত দেহকে সুস্থ রাখিয়া সকল কার্য্যই করা উচিত।

ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়-সংযম।

সংযম—নিয়ম, অসৎ প্রবৃত্তির নিবারণ।

৯২ পৃঃ—

আয়ত্ত—আ+যত্+ক্ত; বশীভূত, দখল।

২৩ পৃঃ—

নৈতিক—নীতি+ষ্ণিক : নীতি-সম্বন্ধীয়।

কলুষিত—দূষিত, পাপযুক্ত।

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতেঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পো কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

দুর্জ্জনঃ দুর্বৃত্তো জনঃ বিদ্যয়া শাস্ত্রজ্ঞানেন অলঙ্কৃতঃ ভূষিতঃ সন্ ভবন্ অপি পরিহর্ত্তব্যঃ পরিত্যাগার্হঃ বর্জ্জনীয় ইতি যাবৎ। তথাহি মণিনা শিরোরত্নেন ভূষিতঃ অলঙ্কৃতঃ অসৌ সর্পঃ বিষধরঃ কিং ভয়ঙ্করঃ ভয়াবহঃ ন? অসৌ সর্পঃ অতি ভয়াবহ ইত্যর্থঃ।

যে ব্যক্তি দুঃশীল, সে যদি বিদ্বান্ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দেখ, কোন সর্পের মাথায় মাণিক থাকিলেও তাহার দশন-নিঃসৃত বিষে প্রাণহানির সম্ভাবনা। এজন্য ঐ সর্প মণিভূষিত হইলেও পরিত্যজ্য।

২৪ পৃঃ—

ঋজু—সরল। দম্ভবর্জিত—আত্মশ্লাঘা রহিত; গর্ব্বশূন্য।

জড়জগৎ-সম্বন্ধীয়—নির্জীব জগৎ সম্পর্কীয় অর্থাৎ বাহ্যবস্তু-বিষয়ক।

গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী—খাদ্য পরিধেয়ের উপযুক্ত।

আলস্য অপব্যয়াদি-সম্ভূত—অলসতা, অন্যায় ব্যয় প্রভৃতি হইতে জাত।

ইন্দ্রিয়পরতাদি-জনিত—অনুচিতরূপে ইন্দ্রিয়-সেবাদি হইতে উৎপন্ন।

রাষ্ট্রবিপ্লব—রাজ্যের মধ্যে উপদ্রব (অশান্তি)।

রামপ্রাণ গুপ্ত।

ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে এই মহাত্মা ১২৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠদশার পর হইতেই ইনি ইতিহাস ও সাহিত্য-বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া সুকথা, ভারতী, নবনূর, প্রবাসী, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন; তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই বিদ্বৎ-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সাহিত্য-সংসারের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় ইঁহাদ্বারাই পূর্ণাঙ্গ-প্রায় হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ইতিহাস মুদ্রিত হয়, ঐগুলির অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য; এজন্য উহাতে স্থানে স্থানে ইতিহাস-সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় উপেক্ষিত, প্রচ্ছাদিত ও সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। মহাত্মা রামপ্রাণ গুপ্ত বাঙ্গালা ইতিহাসের ঐ অসম্পূর্ণতার পূরণ করিয়াছেন। ইনি বহু পরিশ্রমে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক অধিকাংশ পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্তের সঙ্কলন করিয়া, কয়েকখানি ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত 'প্রাচীন ভারত' বঙ্গসাহিত্যের বহুমূল্য রত্ন। ইউরোপ ও আমেরিকার মত সুসভ্য আত্ম-মর্য্যাদা-সম্পন্ন দেশে ঐরূপ পুস্তক প্রকাশিত হইলে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি আগ্রহের সহিত উহা ক্রয় করিতেন, সন্দেহ নাই। উহাতে প্রাচীন ভারতের গৌরবসূচক অনেক উৎকৃষ্ট

বিষয় সযত্নে ও বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত হইয়াছে, দেখা যায়। আমাদের এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ-পুস্তকে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাচর্চ্চার একটী অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ইঁহার প্রণীত হজরতের জীবনী, মোগল বংশ, পাঠান-ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পুস্তক সাহিত্য-সংসারের বহুমূল্য রত্নস্বরূপ। ঐ সকল পুস্তকে ইতিহাস-সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় বিশদ ও সুন্দর-ভাবে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসক্ষেত্রে মহামতি রামপ্রাণ গুপ্ত মহোদয়ের নাম চিরস্মরণীয়। এখনও ইনি যত্নের সহিত পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত-সম্বন্ধীয় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা (৯৫ পৃঃ হইতে)।

পৃথিবীর সভ্য জনপদগুলির মধ্যে কোন্ দেশ আদিম সভ্য,—বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ আগ্রহের সহিত এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বলেন, মিশর দেশই আদিম সভ্যতার খনি। মিশরীয় সভ্যতাই ক্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া কালে কালে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায়, য়ুরোপীয় সভ্যতার বীজ মিশর হইতে বাবিলন, সিরিয়া, গ্রীস্, রোম প্রভৃতি দেশে পবিব্যাপ্ত হইয়া, ক্রমে সমগ্র য়ুরোপে প্রসারিত হইয়াছে, বটে; কিন্তু ভারতবাসী সভ্যতাবিষয়ে মিশরের বা অন্য কাহারও নিকট ঋণী নহে। ইঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান মৌলিক। আর্য্যগণের গভীর গবেষণা হইতেই এদেশের সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির উদ্ভব হইয়াছে। কালের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেও বুঝা যায়, যখন সমগ্র পৃথিবী ঘোর অজ্ঞান-রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখনও সমগ্র ভারত সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল ছিল। ঐ সময়েই গভীর জ্ঞান-মূলক ঋগ্‌বেদের অনেক অংশ প্রকাশিত হয়। চিন্তাশীল রামপ্রাণ বাবু তাহার 'প্রাচীন ভারত' নামক পুস্তকে ঐরূপ বিষয়গুলি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। ঐ পুস্তকের এক অংশ হইতে 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতা' এই প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনুকরণ—কাহারও কোন কার্য্য দেখিয়া সেইরূপ করা; সদৃশীকরণ।

দর্শন—অনুমান ও চিন্তামূলক শাস্ত্রবিশেষ; মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র; ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বৈশেষিক ও বেদান্ত আমাদের দেশের এই ছয় প্রকার শাস্ত্র।

রাজনৈতিক—রাজনীতি-সম্বন্ধীয়।

ভিত্তি—বনিয়াদ, দেওয়াল।

অভ্যুদয়ের উন্নতির, শ্রীবৃদ্ধির।

অধ্যুষিত—অধি+বস্+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে যে স্থানে বাস করিয়াছে।

অভ্যুদিত—বিকাশপ্রাপ্ত, উন্নত।

প্রবন্ধ-চন্দ্রিকার বিবৃতি।

৯৭ পৃঃ—

উদ্‌ঘাটিত—আবিষ্কৃত, উন্মুক্ত, প্রকাশিত।

চিন্তা-প্রসূত চিন্তা হইতে উদ্‌ভূত।

তত্ত্ব—স্বরূপ, যাথার্থ্য।

দীপ্তিপূর্ণ জ্যোতীরেখা—সমুজ্জ্বল আলোকরেখা, প্রভাময় কিরণ-চিহ্ন।

পাশ্চাত্য পশ্চিম দেশীয় অর্থাৎ ইউরোপীয়।

প্রতিভা—তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি।

প্রতিপত্তি—খ্যাতি, গৌরব।

হীনপ্রভ নিস্তেজ, জ্যোতিঃশূন্য।

পূর্ব্বার্জ্জিত—পূর্ব্বলব্ধ, পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা যাহা জানিতেন।

অনুক্রমে—প্রারম্ভে, আনুপূর্ব্বী রীতিতে।

প্রাচ্য-শাস্ত্রের পূর্ব্ব দেশীয় অর্থাৎ ভারতীয় শাস্ত্রের

উৎসস্থল উৎপত্তিস্থান, উদ্‌গম প্রদেশ।

৯৮ পৃঃ—

উপাদান—নির্ম্মাণ-সামগ্রী। যে যে উপকরণ দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়, ঐগুলিকেই উপাদান বলে।

বিজ্ঞান সভ্যতার অন্যতম উপাদান—অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবজাতির বর্ত্তমান সভ্যতার গঠন হইয়াছে।

রসায়ন—দুইটী বস্তুর মিলনে গুণান্তর হইলে, উহাদের ঐরূপ যোগকে রসায়ন বলে। Chemistry.

গান্ধকিক অম্ল—গন্ধক হইতে উৎপাদিত অম্ল (Sulphuric Acid.)

যাবক্ষারিক অম্ল—যবক্ষার হইতে উৎপাদিত অম্ল (Nitric Acid.)

লাবণিক অম্ল—লবণ হইতে উৎপাদিত অম্ল।

অম্লজানজ অম্লজান নামক বায়বীয় বস্তু হইতে জাত।

রাসায়নিক—রসায়ন+ষ্ণিক ; রসায়ন-সম্বন্ধীয়।

প্রক্রিয়া—প্র+কৃ+শ ভাবে, স্ত্রীং আপ্ ; প্রকরণ, অনুষ্ঠান।

মহাদ্রাবক -মহান্ দ্রাবক ; প্রবল (শ্রেষ্ঠ) দ্রাবক। (দ্রাবক—দ্রু+ণক কর্ত্তৃবাচ্যে ; যাহা অন্য পদার্থকে দ্রব করিতে পারে।) গন্ধক হইতে যে দ্রাবক (Acid) হয়, তাহা দ্বারা অধিকাংশ ধাতুকেই দ্রব করিতে পারা যায়, অর্থাৎ অন্য বস্তুকে দ্রব করিবার শক্তি উহার অধিক, এই নিমিত্ত এদেশের রসায়নবেত্তা পণ্ডিতেরা উহার মহাদ্রাবক নাম দিয়াছেন।

৯৯ পৃঃ -

যাবক্ষারিক—যবক্ষার+ষ্ণিক ; যবক্ষার জাত (Nitric)

লাবণিক—লবণজাত (Salted or Dealing in salt)
ধর্ম্মগত প্রাণ—ধর্ম্মকে গত হয়া তৎ; ধর্ম্মগত প্রাণ যাঁহাদের, বহুব্রী; ধর্ম্মময় জীবন, যাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া হয়।
তদ্গত-চিত্তে—হয়া তৎ, বহুব্রী; তন্ময়ভাবে, অনন্যমনে।
তদুপলক্ষে—কর্ম্মধা; সেই সূত্রে।
তৈত্তিরীয়—তিত্তিরি+ণীয়; তিত্তিরি সম্বন্ধীয়।
সংহিতা—সম্+ধা+ক্ত, স্ত্রী আপ্; বেদের শাখা; মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র
পার্থক্য—পৃথক্+ষ্ণ্য ভাবার্থে; প্রভেদ।
পরিণত—রূপান্তরিত।

কল্পসূত্র—বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ। ইহাতে যাগ যজ্ঞাদির বিধি (নিয়ম) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বেদের ৬ অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।
দশগুণোত্তরা বৃত্তি—১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত অঙ্ক সকলের স্থানীয়মান উত্তরোত্তর দশ দশ গুণে বর্দ্ধিত হয়, সংখ্যালিখনের এইরূপ পদ্ধতি, দশ দশ গুণে ক্রমবর্দ্ধিত রীতি।

১০১পৃঃ—
ধর্ম্মচর্য্যা—ধর্ম্ম+চর্+য কর্ম্মবাচ্যে, স্ত্রী আপ; ধর্ম্মাচরণ, ধর্ম্মমূলক ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান।
পর্য্যায়গত-গতি—হয়া তৎ পু ও কর্ম্মধারয়; পালাক্রমে যে গতি হয়, ক্রমানুযায়ী গমন (ভ্রমণ)।
একাগ্রচিত্তে—বহুব্রী ও বহুব্রী; অনন্যমনে।
১০২ পৃঃ—
"কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা......তদ্রূপ নহে—"
কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বরযন্ত্র হইতে উচ্চারিত বর্ণ সকলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, আমাদের বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চারণ-স্থান-ভেদে এইরূপ বর্ণমালার গঠন ও শৃঙ্খলা চীনীয় বা য়ুরোপীয় বর্ণমালায় নাই। এই নিমিত্ত ভারতীয় বর্ণমালার গঠন ও উচ্চারণনৈপুণ্য অন্য দুইটীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, চিন্তাশীল স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয় ইহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।
স্মরণাতীত কাল—অতি প্রাচীনকাল; যে কালের অধিকাংশ ঘটনার বিষয় স্মরণ করিয়া পাওয়া যায় না।

১০৩ পৃঃ—

পঞ্চনদ-বিধৌত—পঞ্চনদ দ্বারা প্রক্ষালিত অর্থাৎ শতদ্রু, বিপাসা, ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা, এই পঞ্চনদের (সিন্ধুনদের উপনদীর) বন্যাজলে পরিষ্কৃত, স্বাস্থ্যপ্রদ ও উর্ব্বর।
রাজগৌরব—রাজার শ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ অধিক পরাক্রমশালী বলিয়া সম্মান।

বীরকীর্ত্তি—বীর এই বলিয়া খ্যাতিঃ। কীর্ত্তি—কৃত্+ক্তি ভাবে বা করণবাচ্যে এস্থলে 'দানাদিপ্রভবা কীর্ত্তিঃ শৌর্য্যাদি প্রভবং যশঃ' শাব্দিক পণ্ডিতগণের এই বাক্যটী চিন্তনীয়।

প্রত্যাবর্ত্তন—প্রতিগমন, পুনরাগমন।

ঐতিহাসিক সত্য—(ইতিহাস+ষ্ণিক ঐতিহাসিক) ; ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা।

ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে—যাথার্থ্য বিষয়ে; প্রকৃতপক্ষে বিজয়সিংহ লঙ্কায় গমন করিয়া সেখানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, এই বিষয়ে।

মতদ্বৈধ—মতভেদ। দ্বৈধ—দ্বিধা+ষ্ণ।

গবেষণা—গবেষ+অন ভাবে স্ত্রী আপ্, অন্বেষণ ; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ইনি একজন প্রসিদ্ধ লেখক। নদিয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক সত্য বিষয় ইঁহাদ্বারা আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার অনেক অভাব ও সন্দেহের নিরাকরণ হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের অনেক বিষয়ও ইঁহাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালের অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা প্রস্তর ও ধাতুখণ্ডে লেখা আছে। ইনি গভীর গবেষণা দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ তথ্য বিবিধ প্রমাণের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষিত সমাজের বিশেষ উপকার হইয়াছে। এখন য়ুরোপের অধিবাসীরা বাণিজ্যসূত্রে সাগরপথে গমন করিয়া, নানা দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছেন। প্রাচীন ভারতীয়েরাও যে বাণিজ্য ও অন্যান্য কারণে সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেন এবং কোন কোন দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইঁহার অনেক প্রবন্ধে নিঃসংশয়ে জানা যায়।

ইনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যে যে বিষয় অবলম্বন করিয়া বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ঐ গুলি পাঠ করিতে মনে স্বভাবতঃ যেমন কৌতূহলের উদয় হয়, ভাষাও তেমনি সুগঠিত ও নির্দ্দোষ। ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শব্দ-পারিপাট্যযুক্ত এরূপ সুন্দর লেখা অল্পই দেখা যায়।

সাগরিকা

১০৪ পৃঃ—

দ্বীপ-সমাবেশ- দ্বীপ সকলের একত্র সংস্থিতি

লীলা-নিকেতন -ক্রীড়াভবন অর্থাৎ মনোরম লাবণ্যময় প্রদেশ।

সাগর-সমীরণ —সাগর-জলের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু অর্থাৎ সলিলকণবাহী শীতল বায়ু।

বৃষ্টিপাত নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ যথানিয়মে বৃষ্টিপাত করাইতেছে।
উগ্রমূর্ত্তি—প্রখরভাব, প্রচণ্ডভাব। মূর্ত্তি—মূর্চ্ছ্+ক্তি ভাববাচ্যে।
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যে—স্বাভাবিক আধিক্যে অর্থাৎ স্বভাবের নিয়মানুসারে অধিক হওয়ায়।
প্রাচুর্য্য—প্রচুর+ষ্ণ্য ভাবার্থে।
অল্পায়াস-লব্ধ—কর্ম্মধা ও বহুব্রী, অল্প পরিশ্রমে প্রাপ্ত।
আত্ম-তৃপ্ত—আপনারা তৃপ্তিযুক্ত অর্থাৎ পরিতুষ্ট।
বাণিজ্য-বিপণি—পণ্য বীথিকা, হট্ট ; বাণিজ্যের দোকানসকল।
পণ্য-সম্ভারে—৬তৎ পুং ; বিক্রেয় বস্তু সমূহে।
বেলা-ভূমি—কর্ম্মধা ; সাগরের তট ভূমি।
মুখরিত—শব্দিত, কোলাহলময়।
প্রাচ্য—প্রাচ+ষ্ণ্য সম্বন্ধীয় অর্থে, পূর্ব্বদেশীয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমীপস্থ।
পণ্য-বীথিকা—৬তৎ পুং ; ক্রয় বিক্রয়ের স্থান গুলি।
ভূ-প্রদক্ষিণে—৬তৎ পুং ; পৃথিবী পরিবেষ্টন কার্য্যে।
বণিক্-সমিতি—বণিকের দল, ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়।
প্রাচ্য সাগর-বক্ষে—পূর্ব্বদেশীয় সাগরের উপরে।
অপ্রতিহত—অবারিত, অন্যের বাধাশূন্য।
অক্ষুণ্ণ প্রতাপে—অবাধিত প্রভাবে অপরাজিত পরাক্রমে।
১০৫ পৃঃ—
দীক্ষা—উপদেশ, সংস্কার, দৃঢ় ভাবে ব্রতী হওয়া।
প্রভাব—শক্তি, তেজঃ, মহিমা।
অনুযাত্রী—(অনু—যাত্রা=ইন্) ; অনুগামী, অনুচর।
মরুগিরি—৬তৎ পুং ; মরুভূমিতে স্থিত পর্ব্বত।
আপৎ সঙ্কুল—৬তৎ পুং ; বিপদে পরিব্যাপ্ত।
উত্তাল তরঙ্গমালা—অত্যুচ্চ তরঙ্গসমূহ।
নিরবচ্ছিন্ন—অবচ্ছেদ শূন্য, কেবল, নিরন্তর।
উপনিবেশ—দেশান্তরে বাসস্থান। এক দেশের লোক দেশান্তরে গিয়া বাস করিলে, উহাদের ঐরূপ বাসস্থানকে উপনিবেশ বলে।
অনুকূল—সাহায্যকারী, হিতকর।
কারণ-পরম্পরা—কারণ সকল, একটীর পর আর একটী, এইরূপ কারণ-সমূহ।
নাতিশীতোষ্ণ—সমশীতাতপ, অনধিক শীতোত্তপ্ত।
প্রতিভাত—প্রতীত, অনুমিত প্রতিবোধিত।
সূত্রপাত—৬ তৎ ; আরম্ভ।
'তাহা মানব সমাজের ইতিহাসের প্রবর্ত্তন যুক্ত'—মানব জাতির ইতিহাস যে সময় হইতে

(সম্ভবতঃ গ্রীক জাতির সভ্যতার সময় অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে) লিখিত হইয়া আসিতেছে, তাহার বহুকাল পূর্ব্বে (সম্ভবতঃ বৈদিক কালে) এই ভারতীয় উপনিবেশ সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল।

১০৩ পৃঃ—

জাতিগত স্বাতন্ত্র্য—ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচার, ব্যবহার, ভাষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতির জন্য যে স্বতন্ত্র (স্বাধীন) ভাব তাহা।

নৈসর্গিক পার্থক্য—প্রাকৃতিক প্রভেদ, স্বভাব হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন ভাব। নৈসর্গিক—নিসর্গ+ষ্ণিক জাত অর্থে। পার্থক্য—পৃথক্+ষ্ণ্য ভাবার্থে।

প্রত্নতত্ত্ব—পুরাতত্ত্ব, অতি প্রাচীন কালের অবস্থা। (স্বরূপ)।

খোদিত লিপিতে—প্রস্তরাদিতে লৌহ বা অন্য প্রস্তর দ্বারা অঙ্কিত বর্ণমালায়।

ভারতলিপি—ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ণমালা।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ—পূর্ব্বতন গুরুগণ অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যসেবিগণ।

১০৭ পৃঃ—

তরঙ্গসঙ্কুল—৩ তৎ; তরঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত।

গৌরব দীপ—রূপক কর্ম্মধা; সম্মানরূপ প্রদীপ, মর্য্যাদালোক।

নিদর্শন—চিহ্ন; অভিজ্ঞান, যাহা দ্বারা জানিতে পারা যায়, এরূপ বস্তু বা বিষয়।

উপনিবেশ-নিচয়ের—৬ তৎ; উপনিবেশ সকলের।

তথ্যানুসন্ধানের—যাথার্থ্য অন্বেষণের। তথ্য—তথা+ষ্ণ্য ভাবার্থে।

বদ্ধপরিকর—বহুব্রীহি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বদ্ধ কোটিবন্ধ।

১০৮ পৃঃ—

পর্য্যবসিত—পরি-অব+সো+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে; পরিণামপ্রাপ্ত, সমাপ্ত।

প্রতিকৃতি—প্রতিরূপ, প্রতিমূর্ত্তি, অনুরূপ আকৃতি।

জনশ্রুতি—লোক পরম্পরায় প্রচলিত বাক্য, জনরব, কিংবদন্তী।

বিভিন্ন স্তর বিন্যাসের—কর্ম্মধা ও ৬ তৎ; ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটিবার।

স্থাপত্য—স্থপতি+ষ্ণ্য ভাবার্থে; স্থপতির কার্য্য, রাজমিস্ত্রির কাজ, অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ।

ভাস্কর্য্য—ভাস্কর+ষ্ণ্য ভাবার্থে; ভাস্কর বিদ্যা; সূত্রধর ও চিত্রকরের কার্য্য।

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশাল নিবাসী। ইঁহার প্রণীত ভক্তিযোগ নামক গ্রন্থ সুচিন্তাপূর্ণ হিতোপদেশমূলক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ হইতে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও ক্রোধ, এই দুইটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার যেমন ন্যায়বান্, সুপণ্ডিত ও দেশহিতৈষী, তেমনি সুলেখক ছিলেন।

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব। (১০৯ পৃষ্ঠা হইতে)

বিশ্বতশ্চক্ষু—বিশ্বতঃ (বিশ্বের সকল স্থানে চক্ষু, (দৃষ্টি) যাঁহার, বহুব্রীহি ; জগতের সকল স্থানেই যিনি দেখিতেছেন।

অন্তর্জগতে—জগতের অভ্যন্তর ভাগে। বাহ্যদৃষ্টিতে যে সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, প্রাকৃতিক শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে।

গভীরতম—সুগভীর, বহু নিম্নতলবর্ত্তী।

অন্তর্দর্শী—তলদর্শী ; ভিতরে যাহা আছে, যিনি তাহা দেখিতে পান, অর্থাৎ মনের ভাব ও গতি যিনি সর্ব্বদা জানিতেছেন।

প্রকোষ্ঠ—গৃহ, কুঠারী ; মহল।

অন্তস্থল—হৃদয়ের মধ্যভাগ।

হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত—হৃদয়ের ভিতরে বর্ত্তমান।

পাপপুণ্যদর্শী—সুকৃতি ও দুষ্কৃতি যিনি দেখিতে পান।

পুরাণ-পুরুষ—প্রাচীন পুরুষ, বিষ্ণু, জগদীশ্বর।

ক্রোধ। (১১১ পৃষ্ঠা হইতে)

'ক্রোধ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নাশ করে'—সত্য, সরলতা, দয়া, বিনয় প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকায় মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, ক্রোধের বশীভূত হইলে, সেই সকল গুণ নষ্ট করিয়া ফেলে।

লোমহর্ষণ—অতি ভয়াবহ ; রোমাঞ্চকর ; যাহা দেখিলে বা শুনিলে, দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহা।

পশুভাবাপন্ন—পশুর মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

প্রতীয়মান—প্রতি+ই+শান কর্ম্মবাচ্যে ; জ্ঞায়মান, বোধগম্য।

সুষমা—সু+সম+সন্ কর্তৃবাচ্যে, স্ত্রী আপ্ ; সৌসাদৃশ্য, উত্তমরূপে তুলনা।

বিকটরূপ—অতি ভয়ানক মূর্ত্তি।

ত্রস্ত—ত্রাসযুক্ত, ভীত।

আসুরিকভাবে—উগ্রভাবে। আসুরিক—অসুর+ষ্ণিক সম্বন্ধীয়ার্থে।

উত্তেজনা—উৎ+তিজ্+অনট্ আ ভাবে ; উদ্দীপনা, উগ্রভাবে প্রেরণ।

শিবনাথ শাস্ত্রী।

এই মহাত্মা বঙ্গীয় ১২৫৩ সালের মাঘ মাসে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী চাঙ্গড়িপোতা-নামক গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরানন্দ (হারাণচন্দ্র)

ভট্টাচার্য্য। ইনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও সোমপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের প্রকাশক ও খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ঐ সময়ে আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল না। কিন্তু শিবনাথের জননী সাধারণভাবে যে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যেই শিবনাথের বাল্যশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ১২ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার পিতা পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ঐ সময়ে ইনি মাতুলের বাসায় থাকিতেন। বিদ্যাশিক্ষায় ভাগিনেয়ের একান্ত মনঃসংযোগ দেখিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আনন্দের সীমা থাকিত না। শিবনাথ যে পরে সুপণ্ডিত ও খ্যাত-নামা ব্যক্তি হইবে, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই তেজস্বী হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তির বাসায় পুত্রকে রাখিয়া দেন। তাহাতে শিবনাথকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কলেজের পাঠ অভ্যাস করিতে হইত। ইহাতে লেখাপড়ার বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া, অল্পকাল পরেই তাঁহাকে ঐ বাসা ছাড়িয়া, ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ উকীল মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে থাকিতে হয়। এখানে তাহার লেখাপড়া শিখিবার বেশ সুবিধা হইয়াছিল। শিবনাথ খৃঃ ১৮৬৬ অব্দে প্রশংসার সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে বৃত্তি প্রাপ্ত হন, উহার সাহায্যেই তাঁহার কলেজে পড়িবার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। এফ্, এ, পরীক্ষাতেও ইনি উচ্চ শ্রেণীর মাসিক বৃত্তি ৩২, প্রাপ্ত হন। ইহা ভিন্ন সংস্কৃত কলেজের বৃত্তি ১২, ও প্রসিদ্ধ ডফ্ সাহেবের বৃত্তি ১৫ টাকাও পাইয়াছিলেন। এইরূপে উত্তরোত্তর প্রশংসার সহিত তিনি বি. এ. ও এম্. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উৎসাহের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হয় এবং তিনি আগ্রহের সহিত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হন। এই সময় হইতে তিনি চিরজীবন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ঐ ধর্ম্মের প্রচারই তাঁহার জীবনের মহদ্‌ব্রত ছিল। সুযোগ পাইলেই তিনি সমবেত ব্যক্তিগণের সভায় অন্যান্য ধর্ম্মমতের অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎকর্ষের বিষয় প্রচার করিতে যত্নবান্ হইতেন। এই সময়ে খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেনের ওজস্বিনী বক্তৃতায় ইংরাজি শিক্ষিত কোন কোন ব্যক্তির মন বিচলিত হইয়া উঠে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। মহামনাঃ শিবনাথ এই সময়েই একান্তমনে ব্রাহ্মমতের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে প্রাণের ন্যায় প্রিয় বলিয়া মনে করিতেন।

ইহার কিছুকাল পরে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পীড়িত হইয়া পড়েন এবং শিবনাথকে আহ্বান করেন। শিবনাথ তাঁহার নিকট গমন করিলে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার উপর সোমপ্রকাশ পত্রিকা ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের ভার দিয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় মাতুলের ঐ সমুদায় ভার সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার একান্ত যত্নে ঐ পত্রিকা ও বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তিনি এই সময়েই গ্রাম্য পথ ও জলাশয়ের উন্নতি এবং রুগ্ণ ব্যক্তিদিগের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজ-কুমারের শুভ বিবাহ হয়। ঐ বিবাহ উপলক্ষে মহামনাঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিচক্ষণ কর্ম্মবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্রাহ্মগণের সহিত কেশবচন্দ্রের প্রকাশ্যভাবে বিরোধ চলিতে থাকে এবং ইঁহাদের একান্ত যত্নেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিবনাথ এই সমাজের আচার্য্য পদ গ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সমাজগৃহ নির্ম্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। ধর্ম্মপ্রাণ শিবনাথ একান্তচিত্তে জীবনের অবশিষ্টভাগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন ও নানাপ্রকারে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

এই মহাত্মা যে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিতেই জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বাঙ্গালা ভাষা ইঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। ইনি গদ্য ও পদ্যে যে সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ গুলি যেমন নীতিমূলক, তেমনি প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। উহাতে তাঁহার গভীর জ্ঞান, সমাজ-হিতৈষিতা ও চিন্তাশীলতার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ গুলির মধ্যে পুষ্পমালা, পুষ্পাঞ্জলি, হিমাদ্রিকুসুম প্রভৃতি পদ্যগ্রন্থ, মেজ-বৌ, নয়ন-তারা, যুগান্তর প্রভৃতি উপন্যাস, গৃহধর্ম্ম, ধর্ম্ম-জীবন, প্রবন্ধমালা প্রভৃতি হিতোপদেশ গ্রন্থ প্রধান। ইহা ভিন্ন তাঁহার সুচিন্তা-প্রসূত বহুবিধ প্রবন্ধ তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব যখন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, সেই সময়ের ঘটনা অবলম্বন করিয়া, তিনি যে কবিতাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় গলিয়া যায়। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্যও এই মহামনাঃ সদাশয় যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয়। পুণ্যাত্মা দেশভূষণ শাস্ত্রী মহোদয় বঙ্গীয় ১৩২৫ সালের ১৩ই আশ্বিন দেশবাসিগণকে শোককাতর করিয়া, অবিনশ্বর আনন্দময় ধামে গমন করিয়াছেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপনকর্ত্তা। তিনি বহুবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা এদেশে খৃষ্টধর্ম্মের স্রোত এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার সম্বন্ধে লেখকের যে অভিপ্রায়, তাহা এই প্রবন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

১১২ পৃঃ হইতে—

তুঙ্গ শৃঙ্গ—তুঙ্গ শৃঙ্গ যাহার, বহুব্রী ; উন্নত-শিখর।

আভ্যন্তরীণ – অভ্যন্তর+ঈন জাতার্থে ; অভ্যন্তরস্থ।

সংঘাত—সম্+হন্+ঘঞ্ ভাবে ; নিবিড়-সংযোগ, জমাট।

ঘনসন্নিবিষ্ট—নিবিড়ভাবে সংস্থিত, জমাট হইয়া যাহা আছে।

অশনি-নিনাদে—বজ্রপাতের স্থায় ভীষণ শব্দে।

শ্রী-সৌন্দর্য্য—শোভা ও মনোহারিত্ব। শ্রী—শ্রি+ক্বিপ্ কর্ম্মবাচ্যে।

জ্বালামুখী—অগ্নিময় পদার্থের জ্বালা (শিখা) যাহার মুখে আছে, অগ্নিময়ী শিখার উদ্‌গীরণ।

বিশ্লিষ্ট—বি+শ্লিষ্ ক্ত কর্ম্মবাচ্য ; বিক্ষিপ্ত, ইতস্ততঃ চালিত।

'গিরির জীবন কি সংগ্রামের জীবন!'—অর্থাৎ শীতাতপ, জল, বায়ু ও আগ্নেয় কত উপদ্রব সহ্য করিয়া পর্ব্বত সকল অটলভাবে যুগ যুগান্তর কাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সংঘর্ষণ—পরস্পর স্পর্দ্ধা বা ঘাত প্রতিঘাত।

উপাদান—উপ-আ+দা+অনট্, করণবাচ্যে ; নির্ম্মাণ-সামগ্রী, যে যে সামগ্রী দ্বারা কোন বস্তুর গঠন হইয়া থাকে, ঐগুলিকেই উহার উপাদান বলে।

মাল-মসলা—উপাদান, নির্ম্মাণ-সামগ্রী।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—অয়নায় গমনায (উন্নতি মার্গে গমনের জন্য) অন্যঃ (অপর) পন্থাঃ (পথ) বিদ্যতে (নাই) অর্থাৎ উন্নতি লাভ করিতে হইলে, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

শতানামেমি প্রথমঃ—(অহং) শতানাং (শত জনের মধ্যে) প্রথমঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) এমি গচ্ছামি (অর্থাৎ হইব)। এখানে শত শব্দের অর্থ বহুসংখ্যক।

ত্রিসীমার মধ্যে—সংস্রবে অর্থাৎ সেই স্থানের নিকটে।

১১৪ পৃঃ—

শঙ্করের পরে—শঙ্করাচার্য্যের পরে ; ইনি বিচারে বৌদ্ধমতের অসারতা সপ্রমাণ করিয়া, ভারতবর্ষে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

ধূমকেতু—গগনমণ্ডলে কখন কখন যে ধূমময় বিশাল বাষ্পরাশি অতি দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হইতে দেখা যায়, উহাকে ধূমকেতু বলে। উহার ঊর্দ্ধভাগ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও নিম্নভাগ (পুচ্ছদেশ) সুবিস্তৃত। নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অগ্নিকণা দেখা যায়।

অন্তর্নিহিত—অভ্যন্তরে স্থাপিত, হৃদয়ে নিহিত।

'মানব-আত্মার মহত্বজ্ঞান'—মানুষের আত্মা যে মহান্ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও পবিত্র—এইরূপ জ্ঞান।

বিশ্বাত্মা—পরমাত্মা ; যিনি যাবতীয় আত্মার মধ্যে থাকিয়া, বিশ্বজীবের সুখদুঃখাদি অনুভব করেন।

বিধৃত—রক্ষিত, আকৃষ্ট।
নিয়তি—ভাগ্য, যাহা অবশ্যই ঘটিবে, নিয়ম।
শৃঙ্খলিত—শৃঙ্খলাবদ্ধ।
আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানে—আপনার শ্রেষ্ঠত্ববোধে অর্থাৎ মানবের আত্মা যে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ জ্ঞানে।
আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের—আমি (মানব) যে উৎকৃষ্ট জীব ও তদনুযায়ী সম্মান পাইবার অধিকারী, এইরূপ বোধের।
প্রভাব—শক্তি, মহিমা।
মহাপুরুষোচিত—যাহা মহাপুরুষে অভ্যস্ত অর্থাৎ মহাপুরুষেই যাহা ঘটা বা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।
মহাপুরুষ—বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহার অসাধারণ প্রভাব, তিনি ; অসামান্য মহত্ত্বশালী ব্যক্তি।
গাম্ভীর্য্য—গম্ভীর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। গম্ভীর ভাব ; যাহা সহজে বিচলিত হয় না, এমন ভাব, হর্ষ, শোক, ভয়াদিতে যাহার বিকার বা চাঞ্চল্য হয় না এবং যে ভাব সহজে উপলব্ধি করা যায় না, সেই ভাবকেই গাম্ভীর্য্য বলা যায়।
অবতারণা—অব+তৃ-ণিচ্+অনট্-আ ; প্রস্তাবনা, উত্থাপন।
১১৫ পৃঃ—
স্বাবলম্বন-শক্তি—৭মীতৎ, কর্ম্মধা ; আত্মনির্ভরশক্তি ; আপনার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা।
গূঢ—গুহ্+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে ; অপ্রকাশিত, গুহ্য, প্রচ্ছন্ন।
বিঘ্ন—বি+হন্+টক্ কর্ত্তৃবাচ্যে ; হানি, অনিষ্ট।
বাধা—বাধ্+ভ-আ ; প্রতিবন্ধ, প্রতিরোধ।
বজ্র-মুষ্টিতে—বজ্রের ন্যায় দৃঢ় বন্ধনে।
নিরস্ত—নির+অস্+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে ; নিবারিত, বিক্ষিপ্ত।
কাপুরুষতা—কু (নিন্দিত) পুরুষ কাপুরুষ, পরে তা ভাবার্থে ; পুরুষত্বহীনতা, অপৌরুষ।
সমস্যা—সম্+অস+য কর্ম্মবাচ্যে—স্ত্রী আপ, শ্লোক পূরণের জন্য বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যে সংক্ষিপ্ত বাক্যের সংযোগ করিতে হয়, তাহা ; চিন্তনীয় বিষয়।
১১৬ পৃঃ—
অপরাজিত—অব্যাহত, সর্ব্বজয়ী।
ভৌতিক জগৎ—জড় জগৎ, পঞ্চভূতাত্মক নির্জীব বিশ্ব।
দুর্লঙ্ঘ্য—দুরতিক্রম্য, যাহাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।
মহাশক্তি—বিশাল শক্তি ; যে শক্তি বিশ্বময় ব্যাপ্ত অর্থাৎ যে ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তিদ্বারা সমুদায় জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, সেই মহনীয় শক্তি।
বিধৃত—রক্ষিত, পরিচালিত।

স সেতু বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়—সঃ (বিশ্বনিয়ন্তা) সেতু ঃ—সেতুস্বরূপ (সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়) এষাং লোকানাং (এই লোক সকলের) অসম্ভেদায় (একতা রক্ষা করিবার জন্য) বিধৃতিঃ (অবলম্বন) অর্থাৎ লোক সকলের একতা করণের জন্য তিনিই নিখিল বিশ্বব্যাপী মহনীয় ধর্ম্মরূপে অবলম্বনস্বরূপ হইয়া আছেন। উহার প্রভাবেই মানবের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদয় ও আবহমানকাল ধর্ম্মের জয় হইতেছে।

ধর্ম্মাবহ—ধর্ম্মকে যিনি বহন (ধারণ) করিয়া আসিতেছেন।

ন্যস্ত—নি+অস্+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে, যাহা ন্যাস (অর্পণ) করা হইয়াছে ; গচ্ছিত।

১১৭ পৃঃ—

বাধ্যতা—বাধ্+য কর্ম্মবাচ্যে—বাধ্য। বাধ্য+তা ভাবার্থে; বশ্যতা, বারণীয়তা।

দায়িত্বজ্ঞান—অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা অর্থাৎ আমি এইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য, এইরূপ জ্ঞান করা।

(প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকেরা যে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন—এমন কি নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও পৃথিবীতে ধর্ম্মের প্রচার করিতে ক্ষান্ত হন নাই, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের মনের ধারণা এইরূপ ছিল যে, আমি এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার করিতেই আসিয়াছি ; অতএব ইহাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যতই বাধা উপস্থিত হউক না, আমি কিছুতেই এই ঈশ্বরেচ্ছারূপ মহাব্রত হইতে স্খলিত হইব না।

উদার—মহৎ, উন্নত।

১১৮ পৃঃ—

সার্ব্বভৌমিক—সর্ব্বভূমি+ষ্ণিক, সর্ব্বভূমি সম্বন্ধীয়, যাহা সকল দেশেরই হিতজনক।

সার্ব্বজনীন—সর্ব্বজন+ষ্ণীন হিতার্থে ; সর্ব্বজনের মঙ্গলকর।

নরসেবা-ব্রতে—৬তৎ, রূপক কর্ম্মধারয়, মানুষের দুঃখনিবারণ, বিবিধ প্রকার কল্যাণ-সাধন ও ধর্ম্মভাব-প্রবর্ত্তনরূপ জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্যে।

নবীন সন্ন্যাসী।

ভুবনপাবন বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের একমাত্র পুত্র। ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুজনিত দুঃখে জীবগণ নিয়তই ক্লেশ ভোগ করিতেছে,—ইহা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়া উঠে। এই দুঃখ নিবারণ জন্য তিনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। নবীন বয়সেই তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যময় সুখের সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া, ভিক্ষু-ব্রত অবলম্বন করেন। এই ঘটনা অবলম্বনে ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা কৃষ্ণকুমার মিত্র মহোদয় বুদ্ধচরিত-নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, উহার কিয়দংশ এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সিদ্ধার্থ—বুদ্ধদেবের পিতৃদত্ত নাম। দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, ইনি 'বুদ্ধ' এই নামে প্রসিদ্ধ হন।

হৃদয়-মধ্যে যে তুমুল ঝটিকা—এক দিকে পিতা, মাতা, পত্নী, আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি মায়ার আকর্ষণ এবং অন্য দিকে ব্যাধি, জরা, মৃত্যুজনিত জীবের দুঃখ নিবারণে ব্যাকুলতা ও এই দুঃখময় সংসারবন্ধন ত্যাগ করিতে একান্ত প্রয়াস—এই উভয়-বিধ চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতস্বরূপ ঝটিকা। মাতৃসমা গৌতমী—বুদ্ধদেব ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহার জননী দেহত্যাগ করেন। তাহাতে পিতা শুদ্ধোদন বুদ্ধের মাতৃষ্বসা গৌতমীর পাণি-গ্রহণ করেন। গৌতমীরও কোন পুত্র বা কন্যা হয় নাই। তিনি বুদ্ধকেই আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতেন ও প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন।

১১৯—১২০ পৃঃ।

পাপপ্রবণ—৭তৎ; পাপের দিকেই সহজে অগ্রসর।

কৃত-সঙ্কল্প—বহুব্রী; দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

রাহুল—রক্ষক। এই শিশুর প্রতি স্নেহই সিদ্ধার্থকে সংসার-ক্ষেত্রে রক্ষা করিবে, এইরূপ মনে করিয়াই পিতামহ এই পৌত্রের রাহুল নাম রাখিয়াছিলেন।

উৎসব-মূর্ত্তি—আনন্দ ভাব।

উদভ্রান্ত—আঘূর্ণিত, উচ্ছৃঙ্খল।

১২১—১২২পৃঃ।

অজস্রধারে—অনর্গল ধারায়, অবারিত স্রোতে।

অমিত—অপরিমিত, অসীম।

কল্পান্ত-তপস্যাকারী—প্রলয়ান্ত পর্য্যন্ত তপস্যায় নিরত। [ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে]।

তৃষ্ণাসম্ভূত—৫তৎ; বিষয়ভোগের পিপাসা হইতে উৎপন্ন।

শোক-বিদগ্ধ হৃদয়ে; ৩তৎ—বহুব্রী; শোকসন্তপ্তমনে।

দম্ভ-নাদ—দম্ভযুক্ত নাদ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; আস্ফালনের সহিত উচ্চ শব্দ।

মহাপ্রজাবতী—মহাপ্রজা+বতু 'আছে' অর্থে; অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন পুত্রের জননী।

চেটী—অন্তঃপুর-রক্ষিকা নারী, দাসী।

১২৩—১২৪পৃঃ—

নিগড়-বন্ধন—শৃঙ্খল-বন্ধন।

উপলব্ধি—উপ+লভ্+ক্তি, বোধ, অনুভব।

মৃণাল-কোমল—উপমান সমাস; পদ্মনালের ন্যায় কোমল।

কমলদল-শোভন—পদ্মদলের ন্যায় শোভাজনক।

নির্লিপ্ত—সংস্রবশূন্য, স্বতন্ত্র।

শ্লাঘ্য—শ্লাঘ্+য কর্ম্মবাচ্যে; গৌরবের বিষয়, প্রশংসনীয়।

তপশ্চর্য্যা—তপঃ+চর্+য ভাবে—স্ত্রী আপ্; তপস্যার অনুষ্ঠান, তপস্যা কার্য্য।

১২৫—১২৬পৃঃ—

পুষ্প-ফল-মণ্ডিত—ফুল ও ফলে শোভিত।

বিহগ-কূজিত—পক্ষিগণের কলরবে শব্দিত।

প্রমোদ-উদ্যান—আনন্দজনক উপবন।

রত্নকিঙ্কিণী-জাল-সমীরিত—রত্নময়ী ক্ষুদ্র ঘণ্টা (ঘুঙুর) সকলের দ্বারা শব্দিত। সমীরিত —সম্+ঈর্+ক্ত কর্ম্মবাচ্যে; উচ্চারিত বা শব্দিত।

হাস্য-লাস্য—হাস্য সহিত রমণী-নৃত্য। লাস্য—লস্—ণিচ্+য ভাববাচ্যে।

উপচার—উপ+চর+ঘঞ্ কর্ম্মবাচ্যে; সেবা-দ্রব্য, সজ্জা, পূজার সামগ্রী।

বেদনাত্মক—বহুব্রী; দুঃখমূলক, ব্যথাজনক।

মায়া-মরীচি-সদৃশ—মায়াময়ী মৃগতৃষ্ণিকার মত অর্থাৎ সুখের আকাঙ্ক্ষায় লোকে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু পরিণামে মহাদুঃখদায়ক—এমন কি প্রাণনাশকও হইয়া থাকে, তাহার সদৃশ।

পরিচর্য্যা—সেবা। অনর্গল—অবাধিত, অবারিত।

শোক-দগ্ধহৃদয়ে—শোক-সন্তপ্তচিত্তে। শোক—প্রিয় বস্তুর বা ব্যক্তির অদর্শনজনিত দুঃখ।

কৃত-নিশ্চয়—দৃঢ়চিত্ত, কৃতাবধারণ।

দিঙ্মণ্ডল—সকল দিক্, চারিদিক্। সন্ত্রস্ত—সম্যক্ ভীত, ভয়ব্যাকুল

সংক্ষোভিত—তরঙ্গাকুল, উদ্বেলিত।

বিসংবাদী—বিরোধী, পরস্পর বিরুদ্ধ।

উন্মনস্কভাবে—উন্মনার ন্যায়, উদভ্রান্ত-চিত্তের মত।

সিকতাময়—বালুকাময়।

১২৮—১২৯পৃঃ—

অনবদ্য-বপুঃ—অনিন্দিত দেহ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শরীর।

পদ উলঙ্গ করিলেন—মোজা ও জুতা খুলিয়া ফেলিলেন।

কাষায় বস্ত্র—রেশমী কাপড়। কাষায়—কষায়+ষ্ণ জাত অর্থে।

নদী-সৈকতে—নদীর বালুকাময় তটে।

১৩২ পৃঃ—

অঞ্জন-রাজ—অঞ্জন প্রদেশের অধিপতি, গোপার পিতা।

মুন্সী মোজাম্মেল হক্।

এই মহাত্মা নদীয়া জেলায় অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি উচ্চ-বংশজাত সদাশয় সাহিত্যসেবী। ইঁহার প্রণীত সাহিত্য পুস্তকগুলি দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য-

সংসারের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকের অধিকাংশই উৎকৃষ্ট পারসিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ইহা ভিন্ন এই মহাত্মা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত হজরতের জীবনী, মহর্ষি মনসুর প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সাহিত্য জগতের বহুমূল্য রত্নস্বরূপ। আমাদের এই প্রবন্ধটী 'মহর্ষি মনসুর' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ইঁহার লেখা যেমন প্রাণস্পর্শী, তেমনি প্রাঞ্জল।

সিংহল।

অমরাবতী—ইন্দ্রপুরী।
অধিকার-পদ—অধিকারভুক্ত স্থান, রাজ্য।
কল্পনা-প্রসূত—কল্পনাজাত।
কল্পনার প্রতিভায়—কল্পনার প্রভায়।
মহোদধি—মহাসমুদ্র। উদধি—উদ+ধা+কি অধিবাচ্যে।
১৩৮—১৩৯ পৃঃ—
রাজচক্রবর্ত্তী—রাজশ্রেষ্ঠ, সার্ব্বভৌম ভূপতি।
পুণ্যব্রত—বহুব্রী; পুণ্যশীল, পবিত্র নিয়মাবলম্বী।
অসারতা—সারহীনতা, ক্ষণ-ধ্বংসিতা।
সন্তর্পণে—সাবধানে, তৃপ্তিপ্রদ-ভাবে।
অহিংসা-পাদপের—অহিংসা-রূপ বৃক্ষের; সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশই পরম ধর্ম্ম, এই নীতির।
প্রতিষ্ঠা—স্থাপন, সংস্কার।
সাম্য—কাহাকেও হেয় জ্ঞান না করা, সমভাব।
মৈত্রী—মিত্রভাব, সকলেই মিত্রস্থানীয় এইরূপ মনে করা।
উদ্দীপক—উত্তেজক, বৃদ্ধিকারক, প্রজ্বালক।
ধর্ম্মোন্মাদে—ধর্ম্মময়ভাবের উত্তেজনায়।
মুক্তাসার—৬তৎ, উৎকৃষ্ট মুক্তা।
ঐশ্বর্য্য-নিকেতন—ঐশ্বর্য্যের আলয়, সমৃদ্ধির আধার।
মুক্তা-শুক্তি—মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; মুক্তাগর্ভ শুক্তি (ঝিনুক)।

মাতঙ্গের গ্রাস ও উদ্‌গীরণ—গণেশজননী বিশ্বমাতা যে সময়ে পুত্র গজাননকে ক্রোড়ে লইয়া, তরঙ্গাকুল সমুদ্রের উপরে ভক্তিমান্ বালক শ্রীমন্তকে দর্শন দান করেন, ঐ সময়ে তরঙ্গভরে গজাননের মস্তক এক একবার অদৃশ্য হইতে লাগিল; তখন নাবিকেরা মনে করিল, ঐ রমণী মাতঙ্গকে গ্রাস করিতেছেন; আবার সেই তরঙ্গ অপনীত হইলেই গজাননের মস্তক দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন তাহারা মনে করিল, ঐ রমণী গ্রস্ত মাতঙ্গকে আবার উদ্‌গীরণ করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ এইরূপ দৃশ্য। (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের এই অপূর্ব্ব কল্পনা প্রসিদ্ধ চণ্ডী কাব্যে দ্রষ্টব্য)।

উচ্ছ্রায—উৎ+শ্রি+ঘঞ্ ভাবে, উচ্চতা।

৪১- ১৪২ পৃঃ—

পাদোন চতুর্হস্ত—পাদ দ্বারা ঊন অতএব, চতুর্ হস্ত দ্বিগু, পরে কর্ম্মধা, এক পোয়া কম চারি হাত।

পদাঙ্ক—পদচিহ্ন।

পোতাশ্রয়—অতএব, বন্দর, যেখানে জাহাজসকল নিরাপদে থাকে।

কীর্ত্তিগৌরব—মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, খ্যাতি-জনিত মহত্ত্ব।

সূর্য্য বংশাবতংস—সূর্য্যকুলের শিরোভূষণ।

১৪৪—১৪৫ পৃঃ—

নৌ-সাধন-সম্পন্ন—নৌরূপ সাধন রূপক কর্ম্মধা; তাহাদ্বারা সম্পন্ন অতএব পু, ... সমৃদ্ধ অর্থাৎ জলযুদ্ধে নিপুণ।

সমবেত—সম্-অব+ই+ক্ত কর্ত্তৃবাচ্যে, সম্মিলিত।

অপ্রতিহত-প্রভাবে—অবাধিত প্রভাবে।

শস্য-শ্যামলা—অতএব, শস্যসমূহে শ্যামবর্ণা, শস্যবহুলা।

সুরাজ্য-সুখে—(সুরাজ্য = ...), সৌরাজ্যজনিত সুখ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা সুরাজ্য জনিত সুখে; শোভন রাজার সুপালন-জনিত সুখে।

কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই পুরুষরত্ন সন ১২৬৮ সালে কলিকাতার অন্তর্গত যোড়াসাঁকোর ... ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ... দান ও মহত্ত্বে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র... ঠাকুর ধর্ম্মচর্য্যায় অতি পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া সকলেরই প্রগাঢ় ... ভক্তির ভাজন ছিলেন। ইঁহা ভিন্ন তাঁহার অসামান্য ন্যায়পরতা, স্বার্থত্যাগ ও ... জ্ঞানও অতুলনীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভাশালী। ইনি গৃহশিক্ষ... নিকটে অধ্যয়ন করিয়াই নানা বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। ইঁহাকে কোন বিদ্যালয়ের পাঠের উপর নির্ভর করিতে হয় না। ইনি বাল্যবয়সে অতি ... মাত্র কলিকাতা নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ে পাঠ করেন এবং যৌবনের প্রারম্ভে ইংরাজি ... উত্তমরূপে শিখিবার জন্য বিলাতে গিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি অভিনব ভাবপূর্ণ কবিতা রচনায় এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। সাধারণ বিষয়ের মধ্যে ইনি অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ করিয়া এমন সুন্দর কল্পনাময়ী